আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের
সাহিত্যে জীবন ও সমকাল
করুণা রানী সাহা

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ষাটের দশকের বাংলা সাহিত্যের একজন প্রতিশ্রুতিশীল ও ব্যতিক্রমধর্মী কথাশিল্পী। কবি হিসেবে সাহিত্যে তাঁর পদচারণা হলেও মানুষের দ্বন্দ্ব সংঘাতময় জীবন এবং সমাজে নানাভাবে বিভাজিত মানুষের শক্তি দুর্বলতা ও রহস্য উপজীব্য করে গল্প সৃষ্টি করেছেন। কথাশিল্পী হিসেবে তিনি তাঁর জীবনকালেই সমকালীন বাংলা সাহিত্যে এক মর্যাদার আসন করে নিয়েছিলেন। তাঁর গল্প, উপন্যাস প্রবন্ধের সংখ্যা খুব বেশি নয়, কিন্তু এই স্বল্পসংখ্যক তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে রয়েছে গভীর জীবনবোধ। কোন বিষয়কে তিনি সমগ্রতায় দেখে শিল্পীর দায়বদ্ধতায় নিজের বিশ্বাসকে তুলে ধরেছেন। তাঁর গল্পের বিষয়-ভাবনা সমকাল। গল্প-উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রতে রয়েছে তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি, তীব্র পর্যবেক্ষণ শক্তি ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। তাঁর সাহিত্যে পাঠ করার পথ মসৃণ নয়। ভাবতে ভাবতে থেমে থেমে পড়তে হয়। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বস্তুনিষ্ঠ বাস্তববাদী কথাশিল্পী। তাঁর গল্পে ভাঙনের পরিবর্তনের সুর স্পষ্ট। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সামাজিকতার যে পরিবর্তন সেই সময় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল, তিনি সেই পরিবর্তনশীল বাস্তবতাকে উল্টে-পাল্টে পর্যবেক্ষণ করে গল্পে উপস্থাপন করেছেন।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সাহিত্যে

জীবন ও সমকাল

করুণা রানী সাহা

প্রচ্ছদ : অনিরুদ্ধ পলল

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৫

প্রকাশক

রামশংকর দেবনাথ

বিভাস

৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড (রুমী মার্কেট)

দোকান নং-১০, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

মুঠোফোন : ০১৭১৫-৩৬৩৪৬৭

মূল্য : ২৫০ টাকা

AKTARUZZAMAN ILIUS : JIBON O SAHITTYA

BY Karuna Rani Saha Published By Ramshankardebnath

a publication of Bivas 68-69 Pearidas Road

Banglabazar, Dhaka, Bangladesh.

e-mail : bivas_magazine@yahoo.com

Price : 250.00 US$ 15

First Print : February 2015

ISBN : 984-70343-0466-4

কানাডা প্রাপ্তিস্থান

A T N MEGA STORE

2976 Danforth Ave.

Toronto, Ontario M4C IIM6

Phone : 416.671.6382/416.686.3134

e-mail : atnmegastore@gmail.com

উৎসর্গ

অরুণ কুমার সাহা
যার কাছে সব কাজে সহযোগিতা পাই।

প্রসঙ্গ কথা

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বাংলা সাহিত্যের একজন প্রতিশ্রুতিশীল লেখক। বিশ শতকের ষাটের দশকের জাতীয়তাবাদী চেতনা ও স্বাধিকার আন্দোলনের পটভূমিকায় সাহিত্যের ক্ষেত্রে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের আবির্ভাব। জীবন ও সমাজ অনুসন্ধানের নিরীক্ষাধর্মী শৈল্পিক মনস্তত্ত্বে অবগাহন করে ঐ সময়ের ও স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন প্রাবাহকে ধারণ করে তিনি সাহিত্য রচনা করেন। কবি হিসেবে সাহিত্য অঙ্গনে তাঁর পদচারণা হলেও মানুষের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় জীবন এবং সমাজের বিভাজিত মানুষের শক্তি, সাহস ও দুর্বলতাকে উপজীব্য করে প্রচলিত সাহিত্যের মৌলধারায় পরিবর্তন এনে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস গল্প-উপন্যাস প্রবন্ধ রচনা করেন। গভীর জীবনবোধ তাঁর সাহিত্যের ভিত্তি। এই বাস্তববাদী কথাশিল্পীর গল্প-উপন্যাসের ভাবনা সমকাল। সমকালীন, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনশীল বাস্তবতাকে তিনি তাঁর গল্পে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর কথাসাহিত্যের কাহিনী ও চরিত্রে আছে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণ শক্তি। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চেতনা ও সৃষ্টিতে রয়েছে আধুনিক সমাজচিন্তা ও জীবনজিজ্ঞাসা। কোন বিষয়কে তিনি সমগ্রতায় দেখে নিজের বিশ্বাসকে সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধে তিনি মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনাচরণ অন্বেষণ করেছেন। সমাজ-সংস্কৃতিতে বাঙালির অবস্থান, ইতিহাসে বাঙালির স্থান, মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান, শ্রমজীবী মানুষের কর্মতৎপরতা ইত্যাদিকে তিনি নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে সাহিত্যে সংযোজন করেছেন। গুরু-গম্ভীর বিষয়কে তিনি সহজ করে কথকতার ভঙ্গিতে বলেছেন, যা পাঠকের চিন্তা-ভাবনাকে আলোড়িত করে। রাজনীতি-অর্থনীতি-সংস্কৃতি সব আলোচনাতেই ইলিয়াসের কাছে গুরুত্ব পেয়েছে ব্যক্তি। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন আধুনিকতার মূলমন্ত্রই হচ্ছে ব্যক্তির উত্থান, পতন ও ক্রমবিকাশ। তাঁর মনের ক্ষোভ ও দ্রোহ কখনো সোজা কথায়, কখনোবা বাঁকা কথায় সাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছে। আধুনিকতার সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, ব্যবহার ও তার প্রয়োজনীয়তাকে তিনি তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে উপস্থাপন করেছেন।

খুব কম সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেও শুধু মাত্র বিশিষ্টতার গুণে সাহিত্যে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মর্যাদাপূর্ণ আসন লাভ করেছেন। তাঁর রচিত সাহিত্য থেকে জানা যায় দেশের সমাজ, ঐতিহ্য ও ইতিহাস। প্রখর সমাজসচেতন এ লেখকের দুর্লভ কথাসাহিত্যের মূল্যায়ণের জন্য

'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সাহিত্যে জীবন ও সমকাল' গ্রন্থটি লেখা, যাতে করে বর্তমান ও আগামী প্রজন্ম এই ব্যতিক্রমী সাহিত্যিকের সাহিত্য, মানবসত্তার জটিল ও কুটিল স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারে।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সাহিত্যকর্ম নিয়ে দেশের অনেক বিশিষ্ট প্রথিতযশা সাহিত্যিক আলোচনা-সমালোচনামূলক প্রবন্ধ-গ্রন্থ লিখেছেন। এই সাহিত্যিকের এক গুণমুগ্ধ পাঠক হিসেবে তাঁর স্বতন্ত্র্য, ব্যতিক্রমধর্মী ও জীবনধর্মী সাহিত্যকে জানার আকাঙ্ক্ষায় অধ্যয়ন করি তাঁর গল্প-উপন্যাস ও প্রবন্ধ।

মধ্যবিত্তের আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মরূপান্তরের স্বরূপ অন্বেষণে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রবণতায় আকৃষ্ট হয়ে এই সমাজ-সচেতন বাস্তববাদী লেখকের জীবন ও সাহিত্য জানার আকাঙ্ক্ষায় এই গ্রন্থ রচনার প্রচেষ্টা। অনাহার, অভাব, দারিদ্র ও শোষণের শিকার হয়ে যারা সমাজে মানবেতর জীবন-যাপন করে তাদের প্রতি লেখকের সহানুভূতি তরুণ সমাজকে উদ্দীপ্ত করবে। নতুন প্রজন্ম জানবে– ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন ও সমাজে তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, পঞ্চাশের মন্বন্তর, পাকিস্তান আন্দোলন, দেশভাগ, দেশ-ত্যাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহতা।

বিশেষ সতর্কতা সত্ত্বেও এই বইয়ে যে ভুল ত্রুটি রয়ে গেল সে দায়ভার আমার। আমার এ উদ্যোগে যে সব গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি, সে সব গ্রন্থ ও প্রবন্ধের বিজ্ঞ, বিদগ্ধ সৃজনশীল লেখকদের আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। আমার পরিবারের সবাই আমার সব কাজের সহযোগী, তাদের অনুপ্রেরণায় আমি লিখতে উৎসাহিত হই। 'বিভাস' প্রকাশনার স্বত্ত্বাধিকারী রামশংকর দেবনাথকে ধন্যবাদ, আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে তিনি বইটি প্রকাশ করায়। পাঠকের ভালো ও শিক্ষার্থীদের সামান্য কাজে লাগলে কৃতার্থ হবো।

বিনীত
করুণা রানী সাহা
০৩.০১.২০১৫

সূচি

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের জীবন ও সমকাল

বাংলা কথাসাহিত্যে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের (১৯৪৩-১৯৯৭) আবির্ভাব ও বিকাশ যথাক্রমে স্বাধীনতাপূর্ব ও স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে। কোন সাহিত্যই দেশ-কাল-সমাজ নিরপেক্ষ নয়। সবদেশে সবকালেই যুগের প্রবাহমানধারাকে কেন্দ্র করেই শিল্প সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি। লেখক বা শিল্পীর মনন ও প্রবৃত্তি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশ কাল ও সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আবহকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। যে পারিপার্শ্বিকতায় লেখকের জন্ম ও বেড়ে ওঠা, তার সার্বিক পরিস্থিতি তাঁর মানসিকতাকে প্রভাবিত করে। লেখক বা শিল্পী সমাজের সচেতন মানুষ, তাই সমাজ অভিজ্ঞতার অন্তরঙ্গ পরিচয় তাঁর সাহিত্যে অনিবার্যভাবেই উপস্থিত থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংকটময় কালে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের জন্ম, আর লালিত পালিত বর্ধিত হন যুদ্ধপরবর্তী রাজনৈতিক-সামাজিক সংকট, দেশভাগের পর মানবিক বিপর্যয় আর বিজাতীয় অবাঙালি শাসকের বৈষম্যমূলক প্রতিকূল শাসনামলে। বিশ শতকের প্রথমার্ধ এদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সংকটের কাল। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের সমাজ জীবন ছিল বিপদগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্কট কাটতে না কাটতেই পৃথিবী ব্যাপী প্রাদুর্ভাব ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের। বিশ্বব্যাপী এই সংকট ভারতবর্ষকেও আঘাত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে (১৯৩৯-৪৫) এদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ছিল চরম সংকট। ১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আনবিক বোমার বিস্ফোরণে বিশ্বব্যাপী যে বিপর্যয় ও ভয়াবহতা আত্মপ্রকাশ করে তা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি আলোড়িত করে। এর মধ্যে আর্বিভূত হয় ১৯৪৩ সালে শতাব্দীর বিভীষিকাময় দুর্ভিক্ষ যা পঞ্চাশের মনন্তর নামে খ্যাত। এই দুর্ভিক্ষে মৃত্যুবরণ করে এদেশের হাজার হাজার মানুষ। বিপন্ন হয় মানবতা। গোটা দেশজুড়ে ছিল বিপন্ন ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকার। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নামে বিরাটধ্বস। চলতে থাকে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন। আন্দোলনকে দমন করার নামে ঔপনিবেশিক শাসক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেশের সার্বিক পরিস্থিতিকে আলোড়িত করে– এরই মধ্যে ১৯৪৭ সালে হয় দেশভাগ। দেশভাগের প্রবল যন্ত্রণা বাঙালির চিত্তকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎসতা ও রাজনৈতিক সংকটে দেশান্তরের হিড়িক পড়ে যায়। দেশ প্রায় মেধাশূন্য হয়ে পড়ে। ওপার বাংলার মানুষের অনুপ্রবেশে সৃষ্টি হয় উদ্বাস্তু সমস্যা। এসব ঘটনার অভিঘাতে মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে। এই অবক্ষয় ও মানবিক বিপর্যয় শহুরে মধ্যবিত্তের জীবনকে যতটা আচ্ছন্ন করেছিল গ্রামীণ জীবনে তখনও তা ততটা প্রভাব ফেলতে পারেনি। দেশের এই বিবিধ সংকটের কালেই দেখা দেয় জাতীয় অস্তিত্বের প্রশ্ন। ১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার ঘোষণা দিলে শুরু হয় উত্তাল আন্দোলন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন, পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনের ইস্যুতে ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন, নির্বাচনে ২১ দফার নির্বাচনী ইশতেহারের ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্টের বিজয়, ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন, ...৬২-র ছাত্র আন্দোলন, ৬৬ সালে ৬ দফার ভিত্তিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম, ৬৯-এ আইয়ুব খানের স্বৈশাসনের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান–এই সব আন্দোলনের পথ ধরেই ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ।

এই রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মনন ও প্রবৃত্তিকে গঠন করেছিল। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে তাঁর রচিত সাহিত্যে দেশের এই পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রতিফলন ঘটে। এই রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি ও যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের পরিবেশ-সংকট-সমস্যা-অবক্ষয় জনিত সময়কালে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সাহিত্যের উদ্ভব ও বিস্তার।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ১৯৪৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি বৃহত্তর রংপুর জেলা, বর্তমান গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা থানার গোটিয়া গ্রামের মামার বাড়িতে জন্ম নেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস বগুড়া শহরের উপকণ্ঠে নারুলি গ্রামে। বদিউজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াস ও মরিয়ম ইলিয়াসের চার ছেলের মধ্যে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সবচেয়ে বড়। তাঁর পিতা ছিলেন বগুড়া জেলার অন্তর্গত সারিয়াকান্দি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। বদিউজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াস বগুড়া জেলা মুসলিমলীগের সেক্রেটারি ছিলেন। পিতার রাজনীতির কারণে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে অল্প বয়সেই গ্রাম ছেড়ে ঢাকা চলে যেতে হয়। তাঁর পিতা ১৯৪৬ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হলে তাঁরা সপরিবারে ঢাকায় স্থানান্তরিত হন। সত্যযুগ ও আজাদ পত্রিকার ছোটদের পাতায় লেখা দিয়ে ছাত্র জীবনেই সাহিত্য জগতে তাঁর

প্রবেশ ঘটে। দশম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালীন সময়ে সওগাত পত্রিকায় তার ছোটগল্প প্রকাশিত হয়।

কটিয়ার সাদত কলেজে বাংলা বিভাগের অধ্যাপনার কাজে যোগ দিয়ে আখতারুজ্জামানের কর্মজীবন শুরু হয়। এর অল্পদিন পরেই তিনি ঢাকার জগন্নাথ কলেজের প্রভাষক পদে যোগদান করেন, সরকারি কলেজের চাকরির সূত্রে দেশের অন্যান্য কলেজে তাঁকে স্থানান্তরিত হতে হলেও জীবনের অধিকাংশ সময়ই তাঁর কেটেছে জগন্নাথ কলেজে। তিনি সরাসরি কোন দলীয় রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন না কিন্তু রাজনীতি সচেতন ছিলেন, তাই প্রগতিশীল রাজনীতির গতি প্রকৃতির প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল।

ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ, সব আন্দোলনেই তাঁর সচেতন মানসিকতা দেশ ও জাতির সপক্ষে ছিল। তাই স্বাধীনতা পূর্ব জাতীয়তাবাদী সব আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধ তাঁর রচনায় বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। পুরোনো ঢাকা, বাংলাদেশের জনজীবন এবং স্থান বিশেষের আঞ্চলিক ভাষা ইলিয়াসের গল্প উপন্যাসের অন্যতম প্রধান উপকরণ। তাঁর রচনার ভাণ্ডার বিশাল নয়, কিন্তু বিষয় ও প্রকরণে সমৃদ্ধ। সাহিত্য রচনা ছাড়াও তিনি পত্রিকা সম্পার্দনার সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৩ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ৫৪ বছরের জীবনকালে তিনি গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ লিখে বাংলা সাহিত্যকে গতানুগতিক ভাবধারা থেকে একটি স্বতন্ত্র ধারায় উন্নীত করেছিলেন।

সাহিত্যকৃতীর পুরস্কার স্বরূপ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বিভিন্ন পুরষ্কার লাভ করেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে লেখক শিবির কর্তৃক ১৯৭৭ সালে 'হুমায়ূন কবির স্মৃতি পুরস্কার', আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৭), প্রফুল্ল কুমার সরকার স্মৃতি আনন্দ পুরস্কার (১৯৯৬), সাদত আলী আকন্দ পুরষ্কার (১৯৯৬), কাজী মাহবুব উল্ল্যাহ স্বর্ণপদক (১৯৯৬) ইত্যাদি।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের রচনার সংখ্যা বেশি নয়, গল্প গ্রন্থের বাইরেও তাঁর কয়েকটি গল্প আছে। তাঁর গ্রন্থগুলো হলো–

গল্পগ্রন্থ ঃ অন্য ঘরে অন্য স্বর (১৯৭৬), খোঁয়ারি (১৯৮২), দুধে ভাতে উৎপাত (১৯৮৫), দোজখের ওম (১৯৮৯), জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল (১৯৯৭)।

উপন্যাস ঃ চিলে কোঠার সেপাই (১৯৮৬), খোয়াবনামা (১৯৯৬)

প্রবন্ধ ঃ সংস্কৃতির ভাঙা সেতু (১৯৯৭)

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ষাটের দশকের বাংলা সাহিত্যের একজন প্রতিশ্রুতিশীল ও ব্যতিক্রমধর্মী কথাশিল্পী। কবি হিসেবে সাহিত্যে তাঁর

পদচারণা হলেও মানুষের দ্বন্দ্ব সংঘাতময় জীবন এবং সমাজে নানা ভাবে বিভাজিত মানুষের শক্তি, দুর্বলতা ও রহস্যকে উপজীব্য করে গল্প উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের সংখ্যা বেশি নয়, কিন্তু এই স্বল্প সংখ্যক সৃষ্ট সাহিত্যে রয়েছে তাঁর গভীর জীবনবোধ। শিল্পীর দায়বদ্ধতায় ইলিয়াস সমকালের ভাবনায় তাঁর বিশ্বাসকে তুলে ধরেছেন। তাঁর ছিল সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, তাই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে গল্প উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্র এবং প্রবন্ধের বিষয়বস্তু আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন। এই বাস্তববাদী কথাশিল্পী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও সামাজিক পরিবর্তনকে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে তা সাহিত্যে উপস্থাপন করেছেন। দেশ সমাজ-মাটি আর মানুষই ছিল তাঁর সাহিত্যের বিষয়। মানুষের অনুভূতি কষ্ট-যন্ত্রণা-সংগ্রাম-সংকল্পকে ঘটনার আলোকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। মানুষ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি ছিল মোহমুক্ত, মানবিক আবেগ সম্পর্কে তিনি ছিলেন নির্বিকার আর মানুষের প্রতি ছিল তাঁর নিগূঢ় ভালবাসা। এই বাস্তবধর্মী লেখক রোমান্টিসিজমকে পরিহার করে রূঢ় বাস্তবের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিকেই তাঁর গল্প উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। তিন দশকের সাহিত্যে জীবনে বিরুদ্ধ আর্থ-সামাজিক পরিবেশে থেকেও তিনি জীবনের জয়গান গেয়েছেন। সমকালীন জীবন ও সমাজে তিনি যা দেখেছেন তাই লিখেছেন, তাই তাঁর সাহিত্যে ভাবপ্রবণতা ছিল না। কোন বিশেষ ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল না। সাহিত্যে তিনি খণ্ডিত জীবন নয়, সামগ্রিক জীবনকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এখানেই তিনি স্বতন্ত্র ও নতুন পথের পথিক। মানুষ মানুষকে ভালবাসে–এই সত্যে তিনি বিশ্বাস করতেন। মানুষের প্রতি ভালবাসার জন্য তিনি মানবতার বিরোধীদের কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছেন।

ব্যক্তি আখতারুজ্জামানের চিন্তা- চেতনা, বুদ্ধিক ভাবনা, বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও অন্তর্দৃষ্টি তাঁর গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধে বিস্তার লাভ করেছে।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পের জীবনধর্ম ও শিল্পরূপ

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বাংলা সাহিত্যের একজন প্রতিশ্রুতিশীল ও ব্যতিক্রমধর্মী কথাশিল্পী। ষাটের দশকের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাঙালি মধ্যবিত্তের জাতীয়তাবাদী চেতনা ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার পটভূমিকায় সমকালীন গল্প লেখকেরা গল্প রচনা করেছেন। জীবন ও সমাজ সচেতনতায় ষাটের দশকের কথাসাহিত্যে এসেছিল বিষয়বৈচিত্র্য, আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও চলেছিল নতুন সন্ধান। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সেই নিরীক্ষাধর্মী শৈল্পিক মনস্তত্ত্বে অবগাহন করে ঐ সময়ের রাজনৈতিক সময়প্রবাহকে তাঁর কথা সাহিত্যে ধারণ করেছেন। কবি হিসেবে সাহিত্যে তাঁর পদচারণা হলেও মানুষের দ্বন্দ্ব সংঘাতময় জীবন এবং সমাজের বিভাজিত মানুষের শক্তি, দুর্বলতা ও রহস্যকে উপজীব্য করে ষাটের দশকের গল্পের ধারায় মৌল পরিবর্তন এনে নতুন গল্প সৃষ্টি করেছেন। তাঁর জীবনকালেই তিনি সমকালীন বাংলা সাহিত্যে এক মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধের সংখ্যা খুব বেশি নয় কিন্তু এই স্বল্প সংখ্যক সাহিত্যেই রয়েছে তাঁর গভীর জীবনবোধ। সকল বিষয়কে তিনি সমগ্রতায় দেখে শিল্পীর দায়বদ্ধতায় নিজের বিশ্বাসকে তুলে ধরেছেন। তাঁর গল্পের বিষয় ভাবনা সমকাল। গল্প উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রতে রয়েছে তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি, তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বস্তুনিষ্ঠ বাস্তববাদী কথাশিল্পী। তাঁর গল্পে ভাঙ্গনের ও পরিবর্তনের সুর স্পষ্ট। সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সামাজিকতার যে পরিবর্তন সেই সময় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল তিনি সেই পরিবর্তনশীল বাস্তবতাকে পর্যবেক্ষণ করে তাঁর গল্পে উপস্থাপন করেছিলেন। তার ফলশ্রুতিতে তাঁর হাতে রচিত হয়েছে স্বগত মৃত্যুর পটভূমি, যোগাযোগের মত গল্প। সেই সময় নব্য সাহিত্য ধারার পত্রিকা স্বাক্ষর, কণ্ঠস্বর ইত্যাদির সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৯৬০ সালে সমকাল পত্রিকায় তাঁর স্বগত মৃত্যুর পটভূমি' গল্পটি বের হয়। দেশ, সমাজ ও মাটির প্রভাবে তাঁর ভেতরকার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল। হাজার রকমের বিরোধ-দ্বন্দ্ব আত্মসাৎ করে তিনি হয়েছিলেন বাংলাদেশের একজন স্বতন্ত্র্য লেখক। পরিণত জীবন মনস্কতায় তাঁর গল্প উপন্যাসে মানুষ, মানুষের জীবন ও সমাজের বিস্তার ঘটেছে। মানুষের অনুভূতি, কষ্ট-যন্ত্রণা,

সংগ্রাম, সংকল্পকে শাখা প্রশাখায় ছড়িয়ে দিয়ে তিনি ঘটনার সমীক্ষণ ও চরিত্রের বিশ্লেষণ করেছেন, কাহিনী বিন্যাসে তিনি পাঠকের অনুভব ও চিন্তার সীমানা বাড়িয়েছেন। তাঁর তিন দশকের সাহিত্য জীবন, এই স্বল্পকালীন সাহিত্য জীবনে তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন প্রথম সারির লেখক হয়েই আছেন।

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'হৃদয়ের একূল-ওকূল : দুই বঙ্গের গদ্য সাহিত্য' গ্রন্থে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পের মূল্যায়ন করেছেন–'মানুষ সম্পর্কে মোহমুক্ত দৃষ্টি, মানবিক আবেগ সম্পর্কে নির্বিকার দৃষ্টি আর মানুষের প্রতি দমিত ভালাবাসার অতিসংযত প্রকাশভঙ্গি নিয়ে ছোটগল্পে দেখা দিয়েছেন আখতারুজ্জামান।' বাস্তব বিষয়ের নিরাসক্ত বর্ণনার গুণেই তিনি বাংলা কথা সাহিত্যে একজন স্বতন্ত্র্য লেখক। তাই সরদার আবদুস সাত্তার তাঁর 'কথা সাহিত্যে সমীক্ষণ' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন– 'বিবর্ণ বাস্তবতার ধূসর ছায়া তাই তাঁর গল্পের পাত্রপাত্রীকে বেষ্টন করে থাকে অনুক্ষণ। রোমান্টিকতার স্বপ্নিল আবেশকে তিনি শুধু পরিহারই করেননি, বাস্তবের বিরুদ্ধাচারী বলে তাকে অবজ্ঞা ও করুণাও করেছেন পদে পদে। ফলে নিরেট বাস্তবের নিরাভরণ মাটিতেই গড়ে উঠেছে তাঁর গল্পের সংসার।' রূঢ় নিখাদ বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে লেখক জীবনের চাওয়া পাওয়া প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির আনন্দ বেদনাকে গল্পে উপস্থাপন করেছেন।

সত্তরের দশকে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের অস্থির সময়, দ্বন্দ্বময় সমাজের নৈরাজ্য, অপ্রাপ্তির নৈরাশ্য, হতাশাগ্রস্থ যুব সমাজের সন্ত্রাস, নগরজীবন, মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজের মনোজগৎ, কৃত্রিমতা, স্বার্থপরতা, অতৃপ্তি, মনস্তাত্ত্বিক সংকট ইত্যাদি বিচিত্র বিষয় নিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি রচনা করেন 'অন্য ঘরে অন্য স্বর (১৯৭৬) গ্রন্থ। সত্তর দশকের গ্রামজীবনের প্রতিকূল প্রতিবেশের মধ্যেও মানুষ যে আশাবাদী হতে চেয়েছে তার পরিচয় রয়েছে এই গ্রন্থে। বিরুদ্ধ আর্থ-সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশেও জীবনের জয়গানে যে জীবন উচ্চকিত তার পরিচয় রয়েছে এই গল্পগ্রন্থের গল্পগুলোর আঙ্গিকে। লেখকের বহুস্তরের অভিজ্ঞতা তাঁর গল্পে স্বতন্ত্র অনুসঙ্গ সৃষ্টি করেছে, তাই বাংলাভাষার গল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' গল্পটি ১৯৬০ সালে সমকাল পত্রিকায় প্রকাশিত 'স্বগত মৃত্যুর পটভূমি' গল্পের উত্তরাধিকার। গল্পের চরিত্রের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ, পরবর্তী গল্পেও তা আছে। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রঞ্জু, তার মনোবিকলধর্মী জীবন বাস্তবতা পরাবাস্তব আবহে গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। বৃষ্টিস্নাত এক রাতের পটভূমিকায় অসুস্থ রঞ্জুর এক ঘেয়ে ক্লান্ত নিঃসঙ্গ জীবনের কাহিনী গল্পে উন্মোচিত হয়েছে। বৃষ্টিমুখর আলো-অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যরাত্রির প্রেক্ষাপটে রঞ্জুর চেতনাকে গল্পকার বাস্তব-পরাবাস্তবের মিশ্রণে প্রকাশ করেছেন। রাতের নির্জন পথে রেইনকোট পরিহিত পুলিশের সাথে সাক্ষাতে রঞ্জুর স্মৃতি কল্পনা বাস্তব-পরাবাস্তবের অনুসঙ্গে বিবৃত হয়েছে—'রঞ্জুর গা'টা শিরশির করে উঠলো। এই যে পুলিশ আমার রক্তের স্মৃতিকে রোদন করে গেলো। এ কি পুলিশ, না অন্য কেউ? এ কি কেউ, না কেউ নয়? এ-যদি কেউ-নয় হয়? না. আর ভাবা যায় না, মাথা নিচু করে কোনো দিকে না তাকিয়ে হন হন হাঁটতে শুরু করলো।' এই গল্পের আবরণ দুর্ভেদ্য ও কঠিন। ব্যক্তি রঞ্জুর আবেগ ইচ্ছা ভালবাসা গল্পের জটিল বিন্যাসে প্রকাশ পেতে পারেনি। এখানে লেখকের মনোভঙ্গির ইঙ্গিতমাত্র প্রকাশ পেয়েছে। ইলিয়াসের গদ্যের ভাষা যে তীব্র ও শাণিত, তার সূচনা নিরুদ্দেশ যাত্রা থেকে। গল্পের ভাষা স্বচ্ছ নয় বলে পাঠকের কাছে গল্পের ভাববস্তু দুর্বোধ্য। নায়ক রঞ্জুর অভিমান, যন্ত্রণা, করুণ অনুভূতি লেখকের অনুভূতির রূপান্তর। এ গল্পের গদ্য কাব্যিক। অবচেতনা আর অসম্ভবের বৃত্তাবদ্ধে জড়ানো গদ্য—'নীল আলোর ফ্যাকাসে গন্ধ; মাঠের গেরুয়া নিঃশ্বাস'— এ রকম শব্দ ব্যবহার করে উপমা-চিত্রকল্পে অসম্ভব অসম্ভব ভাব ফুটিয়ে তুলতে যেয়ে জড়জগৎ ও নিসর্গকে জীবন্ত করতে যেয়ে গল্পের ভাষাকে লেখক ভারি করে তুলেছেন। পাতা ব্যবহারের ছায়া লুফে পালিয়ে গেল ফোকসওয়াগণ', 'জামগাছটার হাজার হাজার ভিজে পাতা উদ্বন্ধন আত্মহত্যায় অতৃপ্ত ঝুলছে—' এ রকম ভাষা মানুষের চেতনাবোধে জটিলতা আনে বা বক্তব্যের ব্যঞ্জনা বাড়ায়, লেখায় তা ভিন্নমাত্রা আনে কিন্তু মাত্রাহীন ব্যবহারে গল্পের শিল্প সৌন্দর্য রক্ষিত হয় না। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' গল্পে যাত্রার কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই। গল্পের নায়ক রঞ্জু বৃষ্টির রাতে বাইরে যেতে চায়, কিন্তু তার চাওয়া পূর্ণতা পায় না। কারণ সে অসুস্থ গৃহবন্দী—ঘরের ভেতরেই সে কল্পনায় ঘুড়ে বেড়িয়েছে। গল্পের পটভূমি ঢাকা শহর, শহরকেন্দ্রিক জীবনে বৃষ্টির বর্ণনায় প্রকৃতির কোন স্বাতন্ত্র্য রূপ নেই। প্রকৃতিকে লেখক যন্ত্রের মধ্যে স্থাপন করেছেন। 'ল্যামপোস্টে ভিজে আলোয় ইলেকট্রিক তারের উপর সার বেঁধে জ্বলছে বৃষ্টির শিশির, জলের ফোটাগুলো এক পলক পর গানের টুকরার মতো নিচে ঝরে পড়ছে। কাজলা দিদি এই তারের মধ্য দিয়ে কোথায়, কার বাল্বে জ্বলে উঠছে।' এ রকম গদ্যে-বস্তু-অবস্তু ভাবময় উপমায় নাগরিক চেতনার প্রলেপ লাগিয়েছেন। আলমারিতে সারি সারি সাজানো বইকে তিনি কফিনে

শুয়ে থাকার সাথে তুলনা করেছেন। তার গদ্যে বক্তব্যের চেয়ে বর্ণনা বেশি। তাই হাসান আজিজুল হক লিখেছেন- 'ইলিয়াসের গল্পে দেখি, মানুষজন সম্বন্ধে লেখা হচ্ছে, নিখুঁত ছবি উঠে আসছে। জীবনযাপনের একেবারে আগাপাস্তালা বর্ণনা কিন্তু উপরতলের বর্ণনাকে উপচে উদ্ভাসিত হচ্ছে না জীবন, সমাজ বা মানুষ সম্পর্কে গভীরতর কোনো সত্য। এই অর্থে, ইলিয়াসের রচনা উদ্দেশ্যহীন। এলোমেলো হাত-পা ছোঁড়াকে যেমন সাঁতার বলা যায় না।'

লেখক 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' গ্রন্থের গল্পে সমাজ ও রাষ্ট্রের অনুসঙ্গে সৃষ্ট ঘটনাবলীর অনুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে।

'উৎসব' গল্পে লেখক নগর জীবনের প্রেক্ষাপটে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত নাগরিকের বিপরীতধর্মী জীবনাচরণের পরিচয় দিয়েছেন। কাইয়ূম ও আনোয়ার এই গল্পে দুই সমাজের দুই প্রতিনিধি। বন্ধু কাইয়ূমের ধানমণ্ডির অভিজাত বাড়িতে নিমন্ত্রিত বি এ পাশ কেরানি আনোয়ার আলির বৃত্তাবদ্ধ মানসিকতার কক্ষচ্যুতি নিয়ে এ গল্পের কাহিনী। বিত্তবানের উৎসব মুখর বাড়িতে ধনাঢ্য সুদর্শন নারীদের জৌলুস, তাদের জীবন ও রাজনীতিসম্পৃক্ত কথোপকথন, কলেজ অধ্যাপক হাফিজের গর্বিত সম্মোহীন আত্মপ্রচার প্রভৃতির মধ্যে তাদের সংস্কৃতি ও বিত্তবান কাইয়ূমের এলিট চেতনাকে গল্পকার অনুপুঙ্খ বর্ণনায় প্রকাশ করেছেন- এই বর্ণনারীতির কারণেই তিনি স্বতন্ত্র সাহিত্যিকের মর্যাদায় চিহ্নিত। এদিকে ধানমন্ডির অভিজাত বিত্তবানদের জীবন অন্যদিকে অলিগলি বস্তিবেষ্টিত নিম্নবিত্তের ছন্দহীন জীবন- নগর জীবনের এই বৈপরীত্য, কারণ ধনতান্ত্রিক সমাজের শোষণ ও সম্পদ বন্টনের বৈষম্য। উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের বিপরীতমুখী জীবন চিত্র রূপায়ণে লেখক স্যাটায়ার ও হিউমারের আশ্রয় নিয়েছেন আর তাতে তাঁর বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গি শাণিত হয়ে উঠেছে। ধানমণ্ডির বাড়িতে দেখা একটি কুকুরের বর্ণনায় মধ্যে বিত্তহীন আনোয়ারের মানসিকতার হীনমন্যতা ও বিত্তবানদের প্রতি একটা প্রভুভাব তার মনে জেগে ওঠে- 'ওদের গলির মুখে খিজির আলির বাকরখনির দোকানের গা ঘেঁষে, একটা ল্যাম্পপোস্টের নিচে একটি পুরুষ কুকুর ও একটি মহিলা কুকুর যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হয়েছে। জনতা কুকুররতি দেখার উৎসবে মুখর। তারা নানাভাবে কুকুরদের উৎসাহিত করে।' কুকুরদের এই অবস্থা নিয়ে বড় রাস্তার রোয়াকে বসা জুয়াড়িরা প্যারোডি গান বানায়। এরই মধ্যে আবার একজন উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে- 'হালায়, এক খামচা নিমক লইয়া আয় না বে। নিমক দিলেই তো ছুইটা যায় গিয়া; কিন্তু এই দৃশ্য দেখা ছেড়ে কেউ লবণ আনতে

লাগে না। এইভাবে লেখক গল্পে গল্পে তাঁর সূক্ষ্ম রুচির কথা লিখেছেন। মধ্যবিত্তের সংকীর্ণ মানুষ আর কৃমিকীটের অস্তিত্বের মধ্যে তিনি কোন পার্থক্য করতে চাননি। যেমন আনোয়ার আলি বড়লোক বন্ধুর বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ খেয়ে এসে সেখানকার জৌলুস, নারীদের বেশ ভূষা, চাকচিক্য দেখে এসে নিজের স্ত্রীকে তার আর ভাল লাগেনি। তার কাছে স্ত্রীকে খুব স্থূল মনে হয়েছে। তা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু অস্বাভাবিক, দাম্পত্যর মত পবিত্র সম্পর্কের উপর কদর্যতা এনে তাকে হেয় করা হয়েছে। তার স্ত্রীর বাথরুমে যাওয়াকে কদর্য ভাষায় লিখে যে কদর্য দৃশ্যের চিত্রায়ণ করেছেন, তা সভ্য সমাজ বহির্ভূত– তার স্ত্রী এখন দুটো ইটের উপর ধ্যাবড়া পা রেখে গ্যালন খানেক পেচ্ছাব করবে– এ দৃশ্যে লেখক ব্যক্তি মনের যে কুৎসিত দৃশ্য তুলে ধরেছেন, পাঠককে তা আহত করে। মেয়ে মানুষের বার বার বাথরুমে যাওয়া তার পছন্দ নয়। আনোয়ার আলি রাস্তায় কুকুরের মৈথুন দেখে কামপ্রবৃত্ত হয়ে পড়ে, ঘরে এসে স্ত্রীর সাথে দেহ মিলনে রত হয়– এই শ্রেণির মানুষকে তিনি ক্ষোভ নিয়ে এঁকেছেন। মানুষের কুৎসিত চেহারাকে তিনি খোলা চোখে দেখে খোলাখুলি চিত্রায়ণ করেছেন। এ যেন অসুস্থ পৃথিবীর প্রতি তাঁর ঘৃণা-ক্রোধ, আত্মহননের প্রতি ভয়ানক প্রতিশোধ। মানুষের স্বাভাবিক যৌন প্রবৃত্তির প্রতি বিদ্রুপ। এ প্রসঙ্গে হাসান আজিজুল হক লিখেছেন– 'এতো শুধু নারীদের ছিন্নভিন্ন করা নয়। আমাদের সমাজকে, দাম্পত্য বন্ধনকে, পারিবারিক পবিত্রতাকে– সঙ্গে সঙ্গে বাৎসল্য, স্নেহ– এক কথায় তেল গড়িয়ে পড়া মানবিকতার ধারণাকে মুগুর দিয়ে চূর্ণ করেছেন ইলিয়াস।'

পুরোনো ঢাকার গলি ও বস্তির সংকীর্ণ জীর্ণ পরিবেশে রেস্টুরেন্টে কোলাহল, মাইকে উচ্চ শব্দে চটুল হিন্দিগান, বেকার যুবকদের আড্ডায় অশ্লীল গালিগালাজ, খিস্তি-খেউর–নাগরিক জীবনের এই অসুস্থতা উৎসব গল্পের প্রাণ। গাদাগাদি ঠাসাঠাসি করে সংকীর্ণ ঘরে বসবাস, তাদের অমার্জিত জীবন যাপন, রুচির বিকৃতি, অপসংস্কৃতি চর্চার উদ্দামতা আঞ্চলিক ও ভদ্রতাবিবর্জিত ভাষায় ও নগ্ন অমার্জিত সংলাপে নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন প্রতিবেশ চিত্রিত হয়েছে এই গল্পে। রুটির দোকানের মালিক তোতা মিয়া তার কর্মচারিকে উদ্দেশ্য করে বলে–'আব্বে চুতমারানী, এহেনে খাড়াইয়া কিসের রং দ্যাহো? রাইতে বাজে একটা আর তুমি হালায় খানকির বাচ্চা এহেনে রঙবাজি করো? তোমার কোন বাপে গিয়া কাউলকা দোকান খুলবো?' এইরকম খিস্তি খেউরই ছিল নাগরিক নিম্নবিত্ত মানুষের দৈনিন্দন জীবন যাপনের চালচিত্র। হোটেল মালিক, রেস্টুরেন্টের কোলাহল, জুয়াড়িদের আড্ডা, হালিম বিক্রেতা,

ঠেলাগাড়ির চালকের যাপিত জীবনের মধ্যে উৎসব গল্পে উঠে এসেছে নাগরিক জীবনের মোটিফ।

জনৈক সমালোচক বলেছেন মধ্যবিত্ত সংকীর্ণ জীবনকে তিনি জুতা পেটা করেছেন। সমাজের নিন্দিত আবেগগুলোতে তিনি উপহাসে ব্যঙ্গ বিদ্রুপে প্রকাশ করেছেন। অনাস্থা, অবিশ্বাসের এই অমানবিকতাই শিল্পীর কাছে মানবিক মনে হয়েছে। 'প্রতিশোধ' গল্পে লেখক তাঁর সেই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় তুলে ধরেছেন। মনের হিংস্র আবেগে ওসমান নিজের ভগ্নিপতি বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী আবুল হাশেমকে খুন করতে চায়। দোষ তার অনেক, ওসমান সন্দেহ করে হাশেম তার বোনকে মোটর এক্সিডেন্টে মেরে ফেলেছে, এ্যাক্সিডেন্টটি নিয়তির ঘটনা নয়, ইচ্ছাকৃত। কারণ পর নারীতে আসক্ত হাশেম তার বোনকে ফেলে প্রেমিকাকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে বিয়ে করতে চায়। এ তার বোনের অসম্মানের প্রতিশোধ। যেমন বোন সুর্পসখার নাক কেটে দেয়ার জন্য লক্ষণের প্রতি প্রতিশোধ নিতে রাবণ সীতাকে হরণ করে বোনের অপমানের প্রতিশোধ . য়েছিলেন। কিন্তু হাশেমকে হত্যা করতে বারবার ব্যর্থ হয়ে ওসমান মনোবিকার ও জটিল মানসিক সঙ্কটে আক্রান্ত হয়। তার বাবাকে আবুল হাশেম অপমান করেছে, হাশেমের বামপন্থী রাজনীতির মধ্যে ওসমান ভণ্ডামি দেখেছে। ওসমানের দুই ভাই মুক্তিযুদ্ধ করেছে, মুক্তিযোদ্ধার গর্বিত অনুভব ধুলিসাৎ করে এরা সমাজের নষ্ট বাস্তবতায় দুষ্কৃতিকারী হয়ে গেছে। তার যুদ্ধ ফেরত লুটেরা ছোটভাই আনিসের সাথে আবুল হাশেমের সম্পর্ক ওসমানের মনে বিদ্বেষের দাবানল জ্বেলেছে। তার সেই হিংস্র আক্রোশ যেয়ে পড়েছে আবুল হাশেমের উপর। বিকারগ্রস্ত ওসমান বোন হত্যাকারী আবুল হাশেমকে ছাদে নিয়ে রড দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। এই পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত, সংশয়ী, স্বপ্ন পরিকল্পনায় অক্ষম ওসমানের মনোবিকার বিশ্লেষণে লেখকরে যে বর্ণনা তা পরাবাস্তবধর্মী–' রডটাকে ছোটই বলা চলে, হাত দেড়েকের বেশি হবে না, তবে ওজন খুব। সেই রড হাতে নিয়ে ওসমান একটু একটু ঘোরায়, কখনো খেলায় নিজের মাথার কাছে। কখনো এমনি এহাত ওহাত করে। ঠিকঠাক বসিয়ে দাও একবার। রক্ত উঠবে ফিনকি দিয়ে, হ্যাঁ, রক্ত উঠছে ৩/৪-টে ধারায়।' তার হিংস্রতা এতটাই হিংস্র হয়ে ওঠে যে আত্মহত্যা ছাড়া ওসমানের সামনে নিজেকে রক্ষা করার আর কোন পথ খোলা থাকে না। এভাবে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মানুষের নিন্দিত আবেগকে রূঢ় অমানবিকতা দিয়ে মোকাবেলা করে প্রতিশোধ নিয়েছেন। অনাস্থা ও অবিশ্বাসের ভ্রষ্টতা দেখে তিনি ক্রোধে ফেটে পড়ে তাঁর প্রতিক্রিয়াকে উপহাস, ব্যঙ্গ বিদ্রুপের তীব্রতায়

কটাক্ষ করে প্রকাশ করেছেন। কোন কোন গল্পে চরিত্রের ক্রিয়া প্রক্রিয়ার চেয়ে লেখকের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বেশি হয়েছে। তাই একটা টান টান উত্তেজনায় পাঠক রক্তচক্ষু বিশিষ্ট রাগান্বিত লেখককে দেখতে পান।

রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, মানিক, আবু ইসহাক, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ প্রমুখ লেখকেরা নিজের কাল ও সমাজকে উপস্থাপন করেছেন। সমাজের বাস্তবতা বিরোধী চেতনা এবং অসঙ্গতিকে তাঁরা ঘটনার ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। সমাজের অসঙ্গতি, সংস্কার, মানুষের ভণ্ডামি ও অমানবিকতাকে তাঁরা ঘটনা ও চরিত্রের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেছেন কিন্তু তাতে তাঁদের প্রতিক্রিয়াশীল মনে হয়নি। কিন্তু আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের লেখায় সমাজ ও মানুষের বাস্তবতা বিরোধী চেতনা ও অসঙ্গতি উপস্থাপনে নিরপেক্ষতা, ধৈর্য্য ও নিরাসক্তি নেই। তাঁর প্রতিক্রিয়া ছিল তীব্র। রূঢ় ও নিখাদ বাস্তবতাকে প্রকাশ করতে যেয়ে তাই তাঁর গল্পের ভাব ভাষাতেও তীব্রতা প্রকাশ পেয়েছে। ঘৃণা ক্রোধের আগুন তাঁর এতই তীব্র হয়ে উঠেছিল যে জনৈক সমালোচকের ভাষায়–'পাঠক তাঁর লেখার ভঙ্গিতে তাঁর মুখের টান টান পেশি, শক্ত চোয়াল ও কণ্ঠনালীর ফুলে ওঠো শিরা দেখতে পান।'

বিগত শতকের পাঁচের দশকে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী চেতনায় বিশ্বাসী লেখকদের হাতে বাংলাদেশে নাগরিক পটভূমিতে লেখা গল্পের ধারা শুরু হয়। সামরিক শাসনের সংঘাতময় সংকট মানুষের সচেতনতা বোধকে সেই সময় বিপর্যস্ত করে তুলেছিল, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের জন্যই বাংলাদেশের গল্পে নগর জীবনের উপাদান উপকরণ এসেছে বিচ্ছিন্নভাবে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস নগর জীবনের পঙ্কিলতা ও রূঢ়তার ভেতর দিয়ে সমাজতত্ত্ব ও শ্রেণি চেতনার দ্রোহকে তুলে ধরেছেন কিন্তু পরবর্তিকালে তাঁর রচনায় তা স্পষ্টরূপ পায়নি।

'যোগাযোগ' গল্পে লেখকের অনুভূতিজাত কবিত্ব মানবিক বাস্তবতায় সামঞ্জস্য হয়েছে। এ গল্পের কোন চিত্রই অতিরঞ্জিত নয়, ভিতরের সূত্রগুলো গল্পের ধারাবাহিকতায় এগিয়ে গেছে। একমাত্র সন্তান খোকনের কাছ থেকে দূরে এসে মা রোকেয়ার তীব্র মানসিক যন্ত্রণা যোগাযোগ গল্পের বিষয়বস্তু। কয়েকদিনের জন্য মামার বাড়ি যাওয়ার সময় চলন্ত ট্রেনে নিদ্রিত রোকেয়ার স্বপ্নদৃশ্যের মধ্য দিয়ে এ গল্পের ঘটনা বিবৃত হয়েছে। রোকেয়ার স্বপ্নদৃশ্যের অবতারণার মধ্য দিয়ে লেখক বাস্তবতাকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। 'খোকনের একটানা কান্নার সঙ্গে মায়ের ডাক শুনে রোকেয়ার স্বপ্ন ও ঘুম সব ছিড়ে বড়ো এলোমেলো হয়ে গেল : হায়রে কি কাল ঘুমেই না পাইছিলো আমারে, পোলায়

না জানি কখন থাইকা কান্দে।' স্বরূপখালিতে মামার বাড়িতে অবস্থানকালে ছেলের জন্য রোকেয়া প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। এই পুত্রস্নেহ পৃথিবীর সকল মায়ের চারিত্রিক একাগ্রতা পুত্র প্রাণগত রোকেয়ার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। বাবা সোলায়মান আলির উপলব্ধির মধ্যে রোকেয়া চরিত্রের মমতাস্পর্শী রূপ বাস্তব হয়ে উঠেছে। রোকেয়ার চরিত্রের নারীত্বের চেতনা তার পিতার উপলব্ধিতে প্রকাশ পেয়েছে– 'মেয়েটা ভীষণ জেদী। তবে বড় মায়া, বাপের জন্য, স্বামীর জন্য, ছেলের জন্য বড়ো মায়া তার মেয়েটার।' তাই এতটুকুতেই এত ভেঙ্গে পড়ে। তাঁর যোগাযোগ গল্পে কোন ছবিই অতিরিক্ত নয়, লক্ষ্য সম্পর্কে তাঁর কোন দ্বিধা নেই। ভেতরের গ্রন্থিগুলো পরস্পর যুক্ত।

'যোগাযোগ' গল্পটি বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য। এই গল্পে তিনি বলতে চেয়েছেন কুকুর বিড়াল গরু ছাগলের মত সন্তান বাৎসল্য মানুষ নামক পশুর একটি সহজাত প্রবৃত্তি মাত্র। গল্পে তিনি তুলে ধরেছেন কোথাও কিছু অমৃত এখনো মানুষের জীবনে আছে। কিন্তু আখতারুজ্জামান কোন কোন মানুষের চরিত্রের বৈপরীত্য দেখাতে যেয়ে রূপায়ণ করেছেন বুকভরা ভালবাসা নিয়ে মা সন্তানকে বুকে টেনে নিয়েও কোন যোগাযোগ অনুভব করতে পারে না, তবু প্রচণ্ড টান নিয়ে ছুটে আসেন মা, আর প্রবল নির্ভরতা নিয়ে সন্তান চেয়ে থাকে মায়ের পথের দিকে। বাঁচার জন্য এখনো তাই-ই মানুষের মূল অবলম্বন। সহজ-সরল বর্ণনায় কাহিনী বিন্যাসে ও চরিত্র রূপায়ণে লেখক গল্পের ট্রাজিক পরিণতিকে রূপদান করেছেন।

'ফেরারী' গল্পে নিখুঁত বাস্তব বর্ণনায় পুরোনো ঢাকার প্রেক্ষাপটে অঙ্কিত হয়েছে বৃদ্ধ ইব্রাহিম ওস্তাগারের ফেলে আসা জীবন, সেই অতীত জীবনের প্রতি তার তীব্র মোহ। তার পুত্র হানিফ। পিতার মানসিকতার বৈপরীত্যে তার অবস্থান। সে নোংরা ঘিঞ্জি পুরোনো ঢাকার অবরুদ্ধ জীবন থেকে পালিয়ে যায়। বৃদ্ধ ইব্রাহিমের বিগত জীবনের প্রতি মোহ এবং পুত্র হানিফের পলায়নের ইতিবৃত্ত এই গল্পে মুখ্য হয়ে উঠলেও ব্যক্তিচরিত্রই এই গল্পের কাহিনীতে গুরুত্ব পেয়েছে। মহল্লার ডামলালু মাস্তান, সালাউদ্দিন, আহসান উল্লাহ, হানিফ, কম্পাউন্ডার প্রতাপের ব্যক্তিক চরিত্র নিয়ে নির্মাণ হয়েছে ফেরারী গল্পের ঘটনা ও পরিবেশ। এখানেও বর্ণনারীতি তাঁর গল্পের ভাব প্রকাশের মুখ্য মাধ্যম। পিতার মৃত্যুমুখী অন্তিম মুহূর্তে হানিফ অস্থির হয়ে উঠেছে। পিতার বন্ধু আমির আলীর বাড়ি যেয়ে কোরআন শরীফ নিয়ে বাড়ির কাছাকাছি আসতেই 'মিলিত মনুষ্য কণ্ঠের চিৎকারে ওর জমাট বাধা করোটিতে একটি বিস্ফোরণ ঘটলো' আর তাতেই তার চেতনার প্রবাহে অসংলগ্ন চিন্তার আবহে সৃষ্টি হয়

পরাবাস্তবের ব্যঞ্জনা 'ঘোড়া দুটো ছটফট করে। ইব্রাহিম গাড়ির দরজা খুলে দিলো, শাহজাদী তশরিফ নিক কিন্তু সুন্দরী ইশারা করে, তুমি তোমার হাতের চাবুক ফেলে দাও, তোমার হাতে চাবুক, আমি কি করে তোমার গাড়িতে উঠি? ইব্রাহিম তখন বুঝতে পারেনি, কিন্তু 'বহুত দিন বাদে আমীর কইছে, চাবুকের লগে লোহা আছিলো তো, হেইগুলি আবার লোহাগুলো কি আগুনের চোট সহ্য করাবার পারে না। চাবুক রেখে দেবে বলে সে ফের গাড়ির ছাদে উঠেছে, ঘোড়াও অমনি ছুটতে শুরু করলো।'

মুমূর্ষ ইব্রাহিমের স্মৃতিময় বিগত জীবন থেকে পুত্র হানিফের ঘটনা বহুল আচার আচরণের প্রলম্বিত বর্ণনা এ গল্পে আছে, যা কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই অপ্রসাঙ্গিক। এ গল্প সম্পর্কে হাসান আজিজুল হক লিখেছেন–'এ সবই ছবি হিসেবে নিখুঁত কিন্তু গল্পের কেন্দ্রবিন্দুর সঙ্গে গল্পন্যায়ে আবদ্ধ নয়।' চঞ্চল কুমার বোস লিখেছেন– 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পে ডিটেলের ব্যবহার তার অন্যতম শক্তি ও সীমাবদ্ধতা। ব্যক্তির মনোজগৎ, প্রতিক্রিয়া ও আচরণ চিত্রণে, ঘটনার অভ্যন্তর স্বরূপ রূপায়ণে পরিবেশ ও অনুসঙ্গ সৃজনে ডিটেলের নিরন্তর ব্যবহার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাহিনীর মৌল গতিকে অস্বচ্ছ ও লক্ষহীন করে তুলেছে।'

মুমূর্ষ ইব্রাহিমের জন্যে ডাক্তারের খোঁজে হানিফ এসেছে– এরপর চিত্রের পর চিত্র। ডামডালু গুণ্ডার সাথে হানিফের এক সন্ধ্যার অভিজ্ঞতা, ইব্রাহিমের অশ্রাব্য প্রলাপ, তার কোচোয়ানের জীবন, সস্তা সিনেমা দেখা, পরী দেখার বিভ্রম, পুরোনো দিনের ঢাকার রাত, হবিবর আলী মৃধার আয়াত পাঠ, হানিফের কোরান শরীফ সংগ্রহ–এ রকম অনেক চিত্র আছে, বর্ণনা যতই সুন্দর হোক না কেন কেন্দ্রীয় ঘটনার সাথে সম্পর্কচ্যুত বলে বিভ্রান্তি ঘটে, মূল গল্পের সাথে সম্পৃক্ত নয় বলে গল্প জমাট বাঁধে না।

তিনি গল্প লেখার কিছুটা পথ পেরিয়ে গল্পে রূপান্তর এনেছেন। ফেরারী, উৎসব গল্পে দেখা যায়– পুরনো ঢাকার এক বাস্তব চিত্র, ঢাকার নিম্নস্তরের মানুষের জীবন, হোটেল রেস্টুরেন্টের বয় বাবুর্চি, তাদের মুখের কথা, মস্তান–মস্তানদের জীবন, রাস্তার রিক্সা, ঠেলাগাড়ি, পুরোনো ঢাকার নোনা ধরা বাড়ি, হলুদ ময়লাবাহী খোলা ড্রেন, সিনেমা হলের সামনে ভিড়, পরাটা ভাজার তেলের গন্ধ এগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র আছে এবং তা গভীর অর্থ বহন করে। আছে খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের নিখুঁত চিত্র। গল্প লেখার কিছুটা পথ পেরিয়ে শিল্পী জীবন ও সমাজ বাস্তবতাকে গল্পের উপকরণ করেছেন।

জীবন ও সমাজের নানা ঘটনার বাস্তব কথকতা তাঁর গল্প উপন্যাস। আঙ্গিকের বলিষ্ঠতা বাংলাদেশের গল্পে বিষয় চেতনার সাথে একাত্ম হয়েছিল চল্লিশের দশকেই– সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর গল্পে তার পরিচয় রয়েছে। ষাটের দশকেও বর্ণনার নির্মোহ, ঘটনার ভাববস্তু, আঙ্গিক রূপায়ণ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যে গল্পকারগণ নিজের কাল ও সমাজকে বিশ্বস্ততার সাথে সম্পৃক্ত করেছিলেন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের যুদ্ধোত্তর পর্যায়ের গল্পগুলোতে নগর জীবনের স্বরূপ উন্মোচন হয়েছে ব্যঙ্গবিদ্রূপ, উপমা-ইঙ্গিত ও বর্ণনা কৌশলের ভেতর দিয়ে। গল্পের ভাষার শরীরে তিনি ভাবালুতা বিনাশী প্রাত্যহিক ভাষার খিস্তি খেউর জাতীয় শব্দ ব্যবহার করে জীবনের রূঢ় বাস্তবতার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। ভাষার নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে জীবনের বাণী পাঠকের মনে পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টায় তিনি উদ্দীপ্ত ছিলেন। 'ফেরারী' গল্পের বর্ণনা ভঙ্গিতে তার পরিচয় রয়েছে।

'বড় রাস্তাটা পর হইলেই তো তোমার বাদামতলীর মাগিপট্টি, মতিকে হালায় দাওয়াই দিতো খানকি মাগী গো আর খানকি গো ভাউরা থাকে না?– হেইগুলিরে। মাগীপট্টি কেউগার ব্যারাম হইছে তো ডাকো হালায় লম্বুরে, জিন্দাবাহারের মধ্যে হ্যার নামই আছিলো খানকির ডাক্তার?' তাঁর গল্পে পুরনো ঢাকা, বিত্তের আধিক্য ও ব্রাত্যজনের জীবনকথা শিল্পসম্মত ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এ সব থেকে শিল্পীর মন ধীরে ধীরে জীবনের ও সমাজের নানা দিকের প্রতি অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠেছে। এই দুটি গল্পে বিবৃত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তীকালের বিভ্রান্ত যুব সমাজের অবক্ষয়ের কথা। ছাত্র হাইজ্যাকারের চিত্র এঁকেছেন ক্ষোভের সাথে। এক চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন– 'ছাত্ররা রেসকোর্সের অন্ধকার একটি কোনে বড় লোকদের গাড়ি আটকায় আর মাগী উগি পছন্দ হইল ময়দানের মধ্যে লইয়া হেইগুলিরে লাগায়।' –এরকম ঘটনার বর্ণনায় তিনি অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেছেন, এগুলো তাঁর ক্রোধের বহিপ্রকাশ।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' গল্পে তাঁর বহুস্তরের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, কৈশোর স্মৃতি, ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা এগুলো মিশেছে কিন্তু তা উদ্দেশ্যের স্তরে পৌঁছতে পারেনি। স্বাধীনতা পরবর্তী বহু আকাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশের সংখ্যালঘু মানুষের প্রত্যাশিত নিরাপদ নিশ্চিত জীবনযাপনে সামাজিক ও রাজনৈতিক নিগ্রহ এবং তাতে হতোদ্যম মানুষের অস্তিত্বরক্ষার ও মানসিক যন্ত্রণার মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা এ গল্পে বর্ণিত হয়েছে। পাকিস্তান আমলের ধর্মীয় নিপীড়নে আতঙ্কগ্রস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় স্বাধীন বাংলাদেশও তা থেকে রেহাই পায় না, সুবিধাবাদী এক শ্রেণির মানুষের বৈরী চাপকে সহ্য করেও ননী

নারায়ণগঞ্জে আড়তের ব্যবসা করে। রাজনীতি আশ্রিত ফায়দাবাদীদের ক্রমবর্ধমান চাঁদার চাহিদায় তিনি প্রায় নিঃস্ব। মাস্তানদের ভয়ে তার কন্যা কলেজে যেতে পারে না, ননীর আতঙ্ক এবং অস্তিত্ব রক্ষার সঙ্কটের চিত্রে দেশের বাস্তব চিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে। প্রদীপ ও তার পিসিমার কথোপকথনে গল্পের মূল বিষয়ের সাথে ননী ও অন্যান্য ঘটনাও বাস্তব পরাবাস্তবের ব্যঞ্জনায় এখানে প্রকাশ পেয়েছে। লেখক পুরোনো দিনের জীবন যাপন, ভালবাসা, স্নেহ আস্থা ও বিশ্বাসপূর্ণ জীবনযাত্রার বর্ণনা দিয়েছেন বিশ্বস্ততার সাথে। বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক লিখেছেন–'অন্য ঘরে অন্য স্বর' তীরের মত ঋজু, ধানীলঙ্কার মত বদমেজাজি এবং পরনারীর মত আকর্ষণীয়। এই বইয়ের গদ্য শুকনো খটখটে, প্রায় সবটাই ডাঙ্গা; ডাঙ্গার উপরে কচি নরম সবুজ গাছপালা জন্মেছে এমনও মনে হয় না। কোথাও একটু দয়া নেই, জল দাঁড়ায় না–বাস্তব ঠিক যেমনটি, তেমনি আঁকা, ক্যামেরাও এর চেয়ে নিখুঁত ছবি তুলতে পারে না।' অন্য ঘরে অন্য স্বর গল্পের প্রদীপ স্মৃতি কাতরায় ভোগে।

বাল্যস্মৃতি প্রদীপের মধ্যে জেগে উঠলে শৈশব স্মৃতি ভুলে থাকার জন্য সে হস্তমৈথুন করতে চায়, হানিফ বাবার মৃত্যুকে এড়িয়ে যায় এসব থেকে মনে হয় ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থেকে তাঁর উত্তর ঘটেনি। লেখকের মনস্থিরতার অভাবে গল্পটি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েছে। প্রদীপের স্বমেহনের সাথে গল্পের মিল নেই, শুধুমাত্র ক্ষোভের জন্য তা প্রকাশ করেছেন। হাসান আজিজুল হক বলেন–'শ্মশানে মড়া পুড়িয়ে পুড়িয়ে চণ্ডালের যে অবস্থা ইলিয়াসেরও তাই। সব কয়টি চশমা খুলে বসে আছেন। অথচ আমাদের সাহিত্যে চশমার তো অন্ত নেই। ছেঁদো আবেগের চশমা, ধর্ম, সম্প্রদায়ের রঙিন চশমা বাত আছে। ইলিয়াসের খোলা চোখের দৃষ্টি সমকালের মূলটুকু দেখে নেয়, তাঁর দাঁত নখ সবই বাজ পাখির মতো তড়িঘড়ি ও সোজাসুজি, আর সেটুকুই তিনি লিখতে বসে যান। এই জন্যই তাঁর লেখায় হাবাগঙ্গারামদের প্রেম নেই। দাম্পত্য, প্রেমপ্রীতি, প্রীতিভক্তি বাৎসল্য ইত্যাদির উপর যেন বাজ ফেলেছেন। জীবন এই রকম নাকি? এত কুৎসিত? দুপুরের ন্যাড়া মাঠে পোড়ামাটির মতো। আমি তা বিশ্বাস করতে চাই না। চোখের একেবারে ভিতরের দিকে একটু কোলমতা থাকা ভাল।' বাস্তবে যেমন আছে; দক্ষ ক্যামেরাম্যানের মত তিনি তা তুলে ধরেছেন, রং তুলির প্রলেপ দিয়ে তাকে তিনি পরিশীলিত করে তোলেননি। এতে তাঁর ক্রোধ, ক্ষোভ এমনকি জীবন সম্পর্কে তাঁর সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি মেলে না। 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' গ্রন্থে নগর জীবন, নাগরিক মধ্যবিত্তের মনোজগতের কৃত্রিমতা, আত্মসর্বস্বতা, অতৃপ্তি, মনস্তাত্ত্বিক সংকট, বিকারগ্রস্ত মান সিকতা,

স্বার্থপরতা প্রভৃতি বিষয় ভাষারূপ পেয়েছে। ১৯৭৬ সালে রচিত এই গ্রন্থে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের নৈরাজ্য, যুব সমাজের অবক্ষয়, লাইসেন্স-পারমিট-টেন্ডার কেন্দ্রিক হানাহানি, রাজনৈতিক সুবিধা আদায়, অস্থিরতা ইত্যাদি সমাজ অভিজ্ঞতাকে তাঁর গল্পের অনুসঙ্গ করে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরেছেন।

'অন্য ঘরে অন্য স্বর' গল্পে তিনি তাঁর মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতায় স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের সংখ্যালঘু মানুষের মানসিক ও সামাজিক নিগ্রহকে বর্ণনা করেন। পাকিস্তান আমলে ধর্মীয় নিপীড়ন সহ্য করে সংখ্যালঘুরা অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করে চলছিল, স্বাধীন বাংলাদেশেও নতুন শোষকদের শিকার হয়ে তাদের বাঁচতে হচ্ছে। তাদের সেই অস্তিত্ব যন্ত্রণার প্রতীকী চরিত্র নারায়ণগঞ্জের ননী, যে লেবাসবদলকারী শোষকের বৈরী চাপকে সহ্য করে নারায়ণগঞ্জের আড়তের ব্যবসাকে টিকিয়ে রেখেছে। রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজদের চাঁদা দিতে হয়, তার মেয়ে মাস্তানদের ভয়ে কলেজে যেতে পারে না। গল্পে ননীর অসহায়ত্বের মধ্যেই উন্মোচিত হয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গোপন ভীতি, সমস্যা সংকট ও অস্তিত্বরক্ষার প্রচেষ্টা। গল্পে কলকাতা থেকে আসা প্রদীপ ও তার পিসিমার কথোপকথন গল্পের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে, আর তাতে উঠে এসেছে পিসিমার বেদনাময় জীবন কাহিনী। ননীদার বাড়ির পুরোনো দালানে তথা অন্য ঘরে অন্য স্বর নিয়ে পিসিমার বেদনাময় বাণী প্রদীপের মনোজগতে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। পিসিমার পুরোনো মূল্য বোধের দৈবনির্ভর কল্যাণময় জীবনদৃষ্টিই হচ্ছে অন্য স্বর। অন্য ঘরে কালযাপন করে তার প্রাচীন মূল্যবোধের জীবন ভাবনাই গল্পের নামকরণের যৌক্তিকতা। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের নিরাবেগ দৃষ্টিকোণে বাস্তবতার চিত্র অঙ্কনে কখনো কখনো গল্পে অতিপ্রাকৃত বা পরাবাস্তবতার ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়েছে। পিসিমার দুঃখময় জীবনের বর্ণনায় প্রদীপের মনের প্রতিক্রিয়ায় গভীর রাতের নির্জনতায়– এক পরাবাস্তব ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়– 'গুণগুণ করতে উঠে দাঁড়িয়ে পিসীমা রাধাকৃষ্ণের মূর্তি পেছনে রেখে, পিসীমা এখন রাধাকৃষ্ণের ছবি দেখছে। রাধাকৃষ্ণ এদিক ওদিক তাকিয়ে ফাজিল যুবক যুবতীর মতো দরজা দিয়ে কোথায় পালাচ্ছে? শালগ্রাম কিনা উড়ে সিংহাসনে চড়ে, না কোথাও কোনো ভাবেই বাধাপ্রাপ্ত হয়নি, সুন্দর ফ্লাইট।'

রুক্ষ কঠিন বাস্তব যখন প্রদীপের জীবন থেকে সব রস শুষে নিয়েছে তখন তার কাছে পিসিমার নিভৃত জীবন যেন এক অতল শান্তির প্রতীক। নির্মম ও অতৃপ্ত জগতে বিচরণের ফলে তার স্বপ্নের জগৎ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে, তাই

পিসিমার স্নেহ ভালোবাসার মধ্যে যে শান্তির পরশ, স্বস্তির যে দুর্বলতাটুকু তৈরি হয়েছিল–তা থেকে সে মুক্ত হতে চায়। এ পর্যন্ত ঘটনা স্বাভাবিক, চরিত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিন্তু স্মৃতিকাতরতার দুর্বলতা থেকে স্বমেহন অতিরঞ্জিত অসঙ্গতিপূর্ণ, এই গল্পে প্রদীপ নস্টালজিয়ায় যা আক্রান্ত। হানিফের মতো অসাধারণ মানুষ ভাবে বাপের মৃত্যু থেকে দূরে যেতে চায়– তাতে শিল্পী ইলিয়াসের ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনের দূরাশা অন্য ঘরে অন্য স্বর– উল্লেখযোগ্য গল্প হতে পারতো। কিন্তু সামাজিক ও রাষ্ট্রিক গভীর সম্পর্কগুলোকে হালকাভাবে রচনা করেছেন বলে গল্পটিতে ইয়ার্কির ছোয়া লেগেছে যা অনভিপ্রেত। কেননা রাষ্ট্রিক ও সামাজিক সঙ্কটকে হালকাভাবে দেখলে সাহিত্যের ভারসাম্য ঠিক থাকে না।

জীবনকে তিনি সূক্ষ্মভাবে দেখেছেন। জীবন-সমাজের কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি– ছড়িয়ে গেছে সর্বত্র। বাল্য কৈশোরের গ্রাম, গ্রামের বিধবা পিসি, মাতৃস্নেহ, ঢাকা নগরীর রাতের রাস্তা, আকাঙ্ক্ষা, রাত বারোটার অলিগলি, জুয়ার আড্ডা, টেলিগ্রাফ পোস্ট যেমন তাঁর সাহিত্যে আছে 'তেমনি আছে গ্রাম প্রকৃতির সজনে গাছ, বাঁশবন, নদী, মাঠ। একেবারে প্রতিটি মানুষের চেনা বাংলাদেশকে নিয়ে তিনি লিখেছেন। ক্রমশ তাঁর লেখার জগৎ বিস্তার লাভ করেছে। 'স্বগত-মৃত্যুর পটভূমি' গল্পে ছোট চৌহদ্দি থেকে তাঁর লেখার জগৎ বড়ো হয়েছে। তাঁর গল্পে মানুষের নিঁখুত ছবি উঠে এসেছে; কিন্তু গভীর সত্যের অভাব, তাই তাঁর গল্পকে উদ্দেশ্যহীন মনে হয়। গল্প লেখার জগৎ বড় হলেও ব্যক্তি ইলিয়াসের মন ব্যক্তিকেন্দ্রিক। জীবনের প্রবাহ তিনি দেখেছেন কিন্তু সম্মিলিত জীবনকে দেখেননি। তাই আনোয়ার আলী, ওসমান আপন সত্তার মধ্যেই আবদ্ধ থেকেছে। তাঁর বেশির ভাগ গল্পেই চমৎকার চিত্র আছে কিন্তু চোরাবালিতে তা ডুবে খেই হারিয়ে ফেলে, গল্পটি জমাট বাঁধেনি।

সমাজের এক শ্রেণির মানুষ কর্তৃক মূল্যবোধ ভূলুণ্ঠিত হয়েছে বলেই শিল্পীর ক্ষোভ। পৃথিবীব্যাপী হতাশা, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণেই লেখক সাহিত্যের প্রবাহমান পথ থেকে সরে ভিন্ন খাত সৃষ্টি করে এই আর্থ-সামাজিক পরিবেশে আবেগকে তিনি পরিহার করেছেন। কোন বিশেষ ধর্ম বা সম্প্রদায়ের প্রতি তার কোন Fasination ছিল না। খোলা চোখে সমকালের জীবন ও সমাজে যা দেখেছেন তাই লিখেছেন। এতদিনের আমাদের সাহিত্যের উপজীব্য প্রেম, ভালোবাসা, মায়া মমতা আনন্দ-সৌন্দর্যের ভাবপ্রবণতা তাঁকে আকৃষ্ট করেনি, এই শিল্পী জীবনের প্রেম ভালবাসা, দয়া মায়া মমতা বিশ্বাস আস্থার পাশাপাশি নিষ্ঠুরতা ঘৃণা আক্রোশ

এগুলোকেও মূল্যবান করে প্রকাশ করেছেন। মূলত প্রেম-ভালোবাসা আর নিষ্ঠুরতা-ঘৃণা উভয়ই প্রবৃত্তির সমান অংশ। জীবনে সবই আছে। কারো না কারো জীবনে কোন না কোন সময়ে তা সংঘটিত হয়। সুতরাং সাহিত্যে এক অংশের বাদ দেওয়ার অর্থ খণ্ডিত জীবন তুলে ধরা। কিন্তু সাহিত্য তো খণ্ডিত জীবন নয়, সামগ্রিক জীবনের মূল্যায়ন। এই সামগ্রিক জীবনের মূল্যায়নকে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস গুরুত্ব দিয়েছেন। এখানে তিনি একশো ভাগ স্বতন্ত্র ও নতুন পথের পথিক। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এ গুলোর উপযোগিতা থাকে। ইলিয়াসের লেখায় মানবিকতার এই ব্যাখ্যা একটি তত্ত্বের রূপ নিয়েছে। তাঁর সাহিত্যে ভাবপ্রবণতা ছিল না। তাঁর মতে মানুষ ও মানবিকতা এক জিনিস নয়। আজকের সমাজের এই মূল্যাবোধের অবক্ষয়ের জন্যই তিনি মানবিক গুণাবলীর উপর মূল্যবোধ আরোপ করাকে একমাত্র উপযোগ মনে করেননি।

মানুষ মানুষকে ভালবাসে– এই সত্যে তিনি বিশ্বাস করেন। শিশুর কান্না মানুষের সহানুভূতিকে আকর্ষণ করে, ফুল গাছপালা নদী পাহাড় চাঁদ তারার সৌন্দর্যে মানুষ মোহিত হয়–সমসাময়িক কালের শোষণ-শাসনের রূঢ় বাস্তবতায় এই বিশ্বাসে যখন আঘাত এসেছে তখন তাঁর মানসিকতা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে। তাঁর এ মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে 'অন্য ঘরে অন্য স্বর', 'যোগাযোগ' গল্পে। মানবিকতার মুখোশ পরে যারা মানবিকতার কথা বলে তাদের তিনি কঠোর ভাষায় জবাব দিয়েছেন। অবশ্য কোথাও কোথাও তাঁর ক্রোধ ঘৃণা সীমা অতিক্রম করে সাহিত্যের শোভন মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

মানুষের প্রতি দমিত ভালবাসার জন্যই তিনি মানবতাবিলাসীদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। দয়া মায়া বাৎসল্য পরোপকারিতা মহত্ত্ব আত্মত্যাগ ইত্যাদির প্রতি আদিখ্যেতা তাঁকে মানুষের প্রতি প্রচণ্ড মোহহীন করে তুলেছিল। 'এসব নিয়ে যারা সাহিত্যে ন্যাকামি করতেন তিনি চোখ বন্ধ করে তাদের প্রতি ইট পাটকেল নিক্ষেপ করেছেন। এই জন্য তাঁর কাছে জীবন হয়ে উঠেছে চৈত্রের ঝাঁঝালো রোদে ফাটা ফসলের মাঠের মতো জলশূন্য খটখটে।' সমালোচকের এই মন্তব্য তাঁর জীবন ও সাহিত্যের প্রতিরূপ।

লেখকের আর একটি গল্প 'প্রেমের গল্প'। ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য মতে কোন নাটকীয়তা ছাড়াই গল্পটির আরম্ভ। স্বামী-স্ত্রীর হাস্য পরিহাসে গল্পের শুরু। স্বামীর প্রাক বিবাহ প্রেমের গল্প শুনতে শুনতে স্ত্রীর কৌতূহল গল্পটির আকর্ষণীয় বিষয়। স্বামীর অতিরঞ্জিত অতিকথন সে সরল বিশ্বাসে সত্যি বলে মনে করে। নাগরিক উচ্চবিত্ত আধুনিক জীবন, আধুনিক মেয়ের জীবনাচরণ, পুরুষ বন্ধু বেষ্টিত Life style. নায়কের খিস্তি খেউরের ভেতর দিয়ে এসব

উঠে এসেছে। ঢাকার অতি আধুনিক সমাজের একাংশের চিত্র লেখক ঢাকাইয়া ভাষায় তাঁর অভিজ্ঞতাজাত জ্ঞান দিয়ে প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি চাকরিজীবী মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন পদ্ধতির কথাও আছে। নায়কের কলেজ জীবনের প্রসঙ্গে ছাত্র জীবনের রাজনৈতিক সামাজিক জীবনের একটা চালচিত্রও তিনি লিখেছেন।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পে পুরোনো ঢাকা, বিত্তের আধিক্য ও ব্রাত্যজনের জীবনকথা শিল্পসম্মতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আশির দশক থেকে লেখক শহুরে জীবনের রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে আত্ম ও অস্তিত্বের সন্ধান করেছেন। কামনা বাসনা প্রাণশক্তি পঙ্কিলতা আত্মসঙ্কোচন অস্থিরতা-অবিশ্বাসের আবর্তের মধ্যে উন্মোচন করেছেন ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক এবং অবরুদ্ধ সমাজ জীবন। অবক্ষয় পচন আক্রান্ত মধ্যবিত্তের মনমানসিকতা, যৌনজীবন, ব্যক্তিত্বের শূন্যতা, অবসন্ন নিঃসঙ্গতা, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির অপূর্ণতা আখতারুজ্জমান ইলিয়াসের গল্প উপন্যাসের মূল উপকরণ হয়েছে।

সত্তর-আশির দশকে গ্রামীণ জীবনে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা মানুষের অস্তিত্বমূলে আঘাত করে আর নাগরিক জীবনে মনস্তাত্ত্বিক সংকট ব্যক্তিকে বিপর্যস্ত করে তোলে– এই উভয় চেতনাই আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পের বিষয়বস্তু হয়েছে। সমাজ বাস্তবতার নিরিখে আশির দশকের গল্পে এসেছে মধ্যবিত্তের প্রতিবাদহীন মৃত্যু, নৈরাশ্য ও বিচ্ছিন্নতায় বিপর্যস্ত নাগরিক জীবন। চাকরিজীবী, বেকার, রাজনৈতিক কর্মী, শিল্পী সকল স্তরের ব্যক্তিই গল্পের চরিত্র হয়েছে এবং ঘটনা প্রবাহে, ভাষায়, প্রকরণে এবং সর্বোপরি সূক্ষ্ম নির্মাণশৈলীতে তিনি তা প্রকাশ করেছিলেন।

আশির দশকে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের তিনটি গল্প গ্রন্থ প্রকাশিত হয়– খোয়ারি (১৯৮২) দুধভাতে উৎপাত (১৯৮৩), দোজখের ওম (১৯৮৯)। তিনটি গ্রন্থের গল্পের বিষয়বস্তু স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অবক্ষয়িত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ। বিপন্ন মানুষ, সংখ্যালঘুর উপর নির্যাতন, পেশীশক্তির দাপট, সন্ত্রাস, হানাহানি, চাঁদাবাজি, কালোবাজারি প্রভৃতি নিয়ে তিনি সেই সময়ের সমাজ-প্রতিবেশ রচনা করেছিলেন। জনচিত্ত জয় করার মত আখ্যান তিনি লিখতেন না। শাহরিক চিত্র চিত্রায়ণের পাশাপাশি এ গ্রন্থের গল্পগুলোতে রয়েছে গ্রামীণ জীবনে মনুষ্যসৃষ্ট দারিদ্র্য, মাস্তানদের স্বেচ্ছাচার, মহাজনী সুদ, ভূমিহীন কৃষক জীবনের আলেখ্য। গ্রাম্য কৃষকদের শোষণ করে গড়ে উঠেছিল নগর জীবনের বৈভব, সুবিধাভোগী রাজনীতিকদের আধিপত্য, রাজনীতির নামে স্বেচ্ছাচার, উঠতি যুব সমাজ এবং তাদের সন্ত্রাস-

গ্রামজীবনের এইসব বাস্তব সঙ্কটকে তিনি গল্পরূপ দিয়েছেন। এ বিষয়ে অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য– 'ডিটেলের প্রতি ঝোঁক, বক্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা, আবেগের মুক্তিতে অনীহা, নাটকীয় মুহূর্ত রচনায় অনিচ্ছা, নির্বিকার শিল্প দৃষ্টি গল্প লেখক ইলিয়াসের এইসব বৈশিষ্ট্য এখানে ধরা পড়ে।'

খোঁয়ারি গ্রন্থের খোঁয়ারি গল্পে তিনি সমাজ বাস্তবতাকে উপস্থাপন করেছেন। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক উৎপীড়ন, শোষণ, দখলের নির্মম চিত্র রয়েছে এ গল্পে। একাত্তরে স্বাধীন দেশে সমরজিৎরা ফিরে আসে নিজ বাড়িতে। কিন্তু ঐ বাড়ির এক অংশে ইউথ ফ্রন্টের অফিস খুঁলতে চায় তারই দীর্ঘদিনের বন্ধু ফারুক, জাফর, ইফতেখার। ক্ষমতাবান নেতা মানিকের সহযোগী হয় তারা। স্বাধীন দেশেও সংখ্যালঘুদের উৎকণ্ঠা নিয়ে বাস করতে হয়, তাদের বাড়িতে বসে নব্য ক্ষমতাধর বন্ধুদের মদ্যপানের আসর। সমরজিতের বন্ধু ফারুকের বক্তব্যে মানিকের চরিত্রের যে চিত্র– 'মানিক ভাইকে নিয়ে প্রবলেম হলো এই যে ইডিওলজির জন্য উনি যে কোনো অপ্রিয় কাজও করতে পারেন। তুমি আমাদের সঙ্গে কো-অপারেট করতে রিফিউজ করেছো শুনলে হি পুট ইনটু ট্রাবল।' মানিকের চরিত্রে সেই সময়কার নষ্ট যুব সমাজের একাংশের চরিত্র উন্মোচিত হয়েছে। বর্ণনার প্রাধান্যে লেখক দেশের সঙ্কটময় পরিস্থিতির সঠিক চিত্রায়ণ করেছেন।

এই গ্রন্থের 'তারাবিবির মরদ পোলা' গল্পে তারাবিবির অতৃপ্ত দাম্পত্য জীবনের অন্তর্জ্বালা ও ক্ষোভ ব্যক্ত হয়েছে। তারাবিবি সন্দেহ প্রবণ, সে সব সময় তার ছেলে গোলজারের বিরুদ্ধাচারণ করলে সে ছেলের পক্ষ অবলম্বন করে। এই গল্পেও কাহিনী ও চরিত্র রূপায়ণে বর্ণনাই প্রাধান্য পেয়েছে। মুখের কথায় আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারে গল্পের শিল্প সৃষ্টি সার্থক হয়েছে।

'দুধ ভাতে উৎপাত' গ্রন্থের নাম ভূমিকার গল্প ছাড়াও 'পায়ের নিচে জল', দখল প্রভৃতি গল্পে বাংলাদেশের নৈরাজ্য এবং সেই নৈরাজ্যময় পরিবেশে মানুষের দুর্দশা ও তা থেকে সংগ্রামের কথা বর্ণিত হয়েছে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সব সময়ই বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের সন্ধান করেছেন। সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে কখনও এসেছে পুরনো ঢাকার শ্বাসরুদ্ধ অন্তঃসারশূন্য রাজনৈতিক জীবন, কখনও বা গ্রামজীবনের ইতিকথা। আবেগ বিমুক্ত বাস্তবতার প্রতি বিশ্বস্ততায় তিস্তানদীর তীরবর্তী গ্রাম খোলমহাটির মৌলবী কসিম উদ্দিনের পারিবারিক সঙ্কটের চিত্র 'ডিটেলস বর্ণনারীতিতে অঙ্কিত হয়েছে। জয়নব ও তার পাঁচ সন্তানের খাবার কাড়াকাড়ির অমানবিক প্রতিযোগিতার মধ্যে ঘটেছে লেখকের বাস্তব উপলব্ধির প্রকাশ।

'পায়ের নিচে জল' গল্পের প্রেক্ষাপট গ্রাম ও শহর। গল্পের ঘটনা ও চরিত্র বর্ণনাত্মক। শ্লেষ ও ব্যঙ্গে গল্পের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। গল্পে আতিক সহোদরদের উচ্চশিক্ষার জন্য গ্রামের সমস্ত জমি বিক্রি করে দেয়, আর অন্যদিকে গ্রামের আলতাফ মৌলবি গ্রামের অধিকাংশ জমি ক্রয় করে নব্য জমিদার হয়ে উঠতে চায়। তার চরিত্রে সামন্তবাদী শ্রেণি চরিত্রের ছায়াপাত ঘটেছে। আতিকের বড় ভাইয়ের চরিত্রে রয়েছে শহরের সুবিধাবাদী-রাজনীতিকের ভণ্ডামি। দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না বলে বামপন্থী যুব নেতা আতিকের বড় ভাইয়ের আক্ষেপ হয় কিন্তু চিন্তা করেন গুলশানে একটা বাড়ি করবার, সে বাড়ি ভাড়া দেবে কোন সমাজতান্ত্রিক দেশের এ্যামব্যাসিকে, তাতে সমাজতন্ত্রের সাথেও সম্পর্ক থাকবে আবার মাসে মাসে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা ভাড়াও আসবে। নিজস্ব অভিজ্ঞতায় লেখক সমাজের এই সব স্বার্থান্বেষী সুবিধাবাদী রাজনীতিকের ভণ্ডামিকে এই গল্পে শিল্পরূপ দিয়েছেন।

'দুধভাতে উৎপাত' গ্রন্থের অন্যতম গল্প দখল, এর পটভূমি ১৯৭২ সালের আওয়ামীলীগ শাসিত বাংলাদেশ। এই গল্পে সামন্ত পরিবারের বিরুদ্ধে গ্রামের প্রান্তিক ভূমিহীন চাষীদের প্রতিবাদের ঘটনা চিত্রিত হয়েছে। তিনি বিট্রিশ শাসন, পাকিস্তানি বৈষম্য ও স্বাধীণতা উত্তর বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও সামাজিক দুর্দশার বাস্তব চিত্র চিত্রায়ণ করেছেন। দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা এই গল্পের প্লট। পিতা মোয়াজ্জেম কাজি মুসলীমলীগের সমর্থক, তার জ্যেষ্ঠ পুত্র মোবারক কমিউনিজমের আদর্শে বিশ্বাসী, সেই আদর্শ রক্ষার্থে কারাগারে তার প্রাণদান এবং তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোতাহের স্বাধীন বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দলের একনিষ্ঠ কর্মী, নব্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের প্রশ্রয়ী– এই ভাবে এক একজন ভিন্ন ভিন্ন আদর্শিক চেতনায় বিশ্বাসী। শহীদ বিপ্লবী মোবারক হোসেনের পুত্র ইকবাল পিতার চেতনার উত্তরসুরী। রক্ষীবাহিনী, সেনাবাহিনী সব মিলে গল্পটিতে বাংলাদেশের সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও স্বার্থের টানাপোড়েনে সমাজ ও ব্যক্তিক চরিত্রকে তুলে ধরেছেন। সামাজিক বৈষম্য শোষণ ও অন্যায়কে দূর করার জন্য সংঘশক্তির প্রয়োজন। লেখকের এই চেতনাকে ইকবালের উপলব্ধিতে প্রকাশ করিয়েছেন– 'ইকবাল এটুকু জানে যে, এই গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ বড়োজোড় সকাল পর্যন্ত টিকবে।'

'মিলির হাতে স্টেনগান' গল্প স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের দর্পণ। সমাজে সংঘটিত বাস্তব বিষয়কে সংবেদনশীল বুদ্ধিদীপ্ত লেখক তাঁর চেতনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন আব্বাস পাগলার জীবন জিজ্ঞাসার নিরীখে। মিলি ও

আব্বাসের দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখকের অভিজ্ঞতা যুক্ত হয়ে গল্পটিতে সৃষ্টি হয়েছে এক নতুনতর শিল্প কৌশল। স্বাধীন বাংলাদেশে অস্ত্র জমা দেয়ার ঘোষণা হয়, কিন্তু একদল সমাজ বিরোধী, সুযোগ সন্ধানী যুবক অস্ত্র জমা না দিয়ে সংঘাত, হানাহানি, অস্ত্রশক্তির দাপট দেখিয়ে ভয়ঙ্কর নৈরাজ্য সৃষ্টি করে রানা, সিডনি ফয়সল তাদেরই প্রতিনিধি চরিত্র।

স্বাধীনতা উত্তর মধ্যবিত্ত বাঙালি দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক বিপর্যস্ততার প্রেক্ষিতে নিজেদের অস্তিত্ব বিনাশী ভাবনায় আক্রান্ত। ' দোজখের ওম' গ্রন্থের কীটনাশকের কীর্তি, যুগলবন্দি প্রভৃতি গল্পে নাগরিক চেতনার সেই জীবনসঙ্কটের কথা চিত্রিত হয়েছে। আবার লেখকের মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা, মুক্তি সংগ্রামের নিবেদিত কর্মীদের জীবন, যুদ্ধকালীন বাস্তবতার কথাও আছে, অপঘাত গল্পে তিনি শাণিত চেতনায় তার ভাষারূপ নির্মাণ করেছেন।

কীটনাশকের কীর্তি গল্পে অর্থ এবং জীবনের মধ্যে যে সংযোগ আছে তা দেখাতে গিয়ে সমাজের এক শ্রেণির মানুষের কাছে অর্থের গুরুত্বই যে বেশি লেখক তা দেখিয়েছেন। রমিজের বাবার কাছে কন্যা শোকের চেয়ে অর্থনৈতিক সংকটই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। অভাব বা অর্থনৈতিক সংকটের কারণেই রমিজ ও তার বাবা বোনের বা কন্যার আত্মহত্যার বিষয়টি অনুভব করতে পারে না। ঋণগ্রস্ত বৃদ্ধ পিতা ঋণশোধের দুশ্চিন্তায় কন্যার নির্মম মৃত্যুর মধ্যের মহাজনের টাকার কথাই ভেবেছে। শোকগ্রস্ত পিতার চেয়ে ঋণগ্রস্ত মানুষটিই গল্পে মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে।

সমাজের উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের জীবন অভীপ্সায় লেখক তমিজ ও তার মনিব পরিবারের জীবনাচরণের যে চিত্র দিয়েছেন তাতে রমিজের বোনের মৃত্যু কোন গুরুত্ব পায় না। উচ্চবিত্তের সেই সমাজে মানুষের চেয়ে কুকুরদের মূল্য বেশি। তমিজ পেটে ভাতে কাজ করে, ক্ষুধা নিবারণই তাদের জীবনের উদ্দেশ্য, সেই মনিবেরা মানুষের খাওয়ার চেয়ে এ্যালেশিয়ানটির খাবারের জন্য বেশি অর্থ ব্যয় করে এবং তাতেই তারা আভিজাত্য মনে করে। রমিজদের রোগ শোক দুঃখ নেই, মনিবের কাছে মাথা নত করে থাকাই তাদের ধর্ম। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে রিলিফ বিতরণের অব্যস্থাপনাও গল্পের প্রসঙ্গান্তরে উঠে এসেছে।

বোনের স্মৃতি রমিজকে কাতর করে তোলে। তেল-নুন পিয়াজ দিয়ে মাখা পান্তা ভাত তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। গ্রামের মেয়ে রমিজের বোন শহুরে চাকচিক্যের প্রত্যাশী হয়ে গুলিস্তানে যেয়ে সিনেমা দেখার আকাঙ্ক্ষা করে। রাজ্জাক ববিতার নাম জানে। নাগরিক সভ্যতার নাম চাকচিক্য নাচ, গান,

গাড়ি, ফ্রিজ কোকোকোলার সাথে ধনিক শ্রেণির সংস্কৃতির পাশে রমিজের পরিবারের জীবনাচরণের কথায় গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রসঙ্গ এনেছেন। শহুরে সংস্কৃতির মাঝে অবস্থান করে রমিজ উপলব্ধি করে তার স্বামী পরিত্যক্ত মৃত বোনের স্মৃতি, অন্যের বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজে নিয়োজিত তার মা, মিরধা বাড়ির ম্যাট্রিকপাশ যুবকের সাথে উঠতি যৌবনা বোনের খুনসুঁটি। হাফিজুদ্দিনের সাথে ধর্ষিত অসিমুন্নেসার বিয়ে হলেও মৃধাবাড়ির ছেলেটির লিপ্সা তাকে রেহাই দেয় না। অর্থবিত্তের অহংবোধে নিঃস্ব পরিবারের নিরীহ মেয়েকে ধর্ষণ করতে মৃধাবাড়ির ছেলেটির কোন ভীতি বা অনুশোচনা থাকে না। অর্থবানদের লোভের কাছে নিজেকে সঁপে দেয়ার পর বিত্তহীন পরিবারের মেয়েটির আত্মহত্যা করা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকে না।

সমাজের উচু তলার নারীরা নারী-নির্যাতন বন্ধের আন্দোলন করে, বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে নির্যাতিত নারীদের খোঁজ নেয়। নারীর নির্যাতনের প্রতিরোধের জন্য এই নারীসেবীরা দেশ বিদেশ ভ্রমণ করে কিন্তু তাদের পরিবারের মধ্যে যে নির্যাতনের বীজ লুকিয়ে আছে তা দূর করার চেষ্টা করে না। তাই সমাজ এখনো সেই বৃত্তাবদ্ধেই ডুবে আছে। রমিজ তার স্বামী পরিত্যক্তা বোনের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবে। তার বোনের দুর্ভাগ্যের প্রতিশোধ নিতে চায়। কিন্তু অসহায় গরীবেরা শুধু নির্যাতনই সহ্য করে, প্রতিকারের ক্ষমতা তাদের নেই। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস শ্রেণিবিভক্ত সমাজের এই বাস্তবতাকে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তিতে দেখে গল্পে রূপদান করেছেন।

যুগলবন্দি গল্পেও রয়েছে আধুনিক নাগরিক জীবনের চালচিত্র। সুসজ্জিত ড্রয়িং রুম, হুইস্কি, অতিথি, এ্যালেসেশিয়ান বেষ্টিত তাদের সমাজ। সেই নাগরিক ধনাঢ্য পরিবারে বাড়ির কর্ত্রীর অগতানুগতিক Life Style, রাত বিরাতে পাঁচ মাইল দূর থেকে হুইস্কি আনিয়ে সেই সমাজের মানুষ জীবন উপভোগ করে। নারী পুরুষ মিলে হুইস্কি খাওয়াকে তারা আভিজাত্য বলে মনে করে। এদের সোসাইটিতে ওয়েট মেইটেন্সের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। তাই শীতের মধ্যরাতে বাড়ির অনুগত সুবিধাপ্রার্থী উমেদারকে কমলালেবু আনার জন্য ছুটতে হয় কয়েক মাইল দূরে।

আসগরের বাবার চরিত্র উল্লেখে নিম্নশ্রেণির সরকারি চাকুরীজীবি শ্রেণির জীবনযাত্রার কথা আছে। আসগর সেই স্বল্প বেতনের চাকুরীজীবীর সন্তান। ধনাঢ্য সরোয়ার কবিরের বাসায় সে যতটাই অনুগত, নিম্নবিত্তের মা-বাবার কাছে ততটাই দুবির্নীত। তার এই দুর্বিনীত মানসিকতার কারণ হতাশা। সে পোর্ট থেকে অবৈধভাবে জিনিসপত্র সরায়। ধনিক শ্রেণীর মানুষের সাথে নিজের পরিবারের তুলনা করে সে হতাশ হয়, রাগান্বিত হয়। লেখক এই গল্পে

উচ্চশ্রেণির ও কেরানিশ্রেণির চাকুরিজীবীর আচরণগত পার্থক্য দেখিয়েছেন। সরোয়ার উঁচু শ্রেণির কর্মকর্তা, তার কাছে থেকে সুযোগ সুবিধা আদায় করে নিতে তার বাড়িতে ঝুঁকি নিয়ে ফায় ফরমাস খাটতে একটুও গ্লানিবোধ করে না আসগর, কিন্তু অবসরভোগী নিম্নবিত্তের মা-বাবার কাছে তার ক্রোধের অন্ত থাকে না।

আণ্ডার ওয়ার্ল্ড বিজনেস করে ধনিক শ্রেণির উদ্ভব, স্মাগলড নি গুডস তাদের অনৈতিক উপার্জনের পথ। চাকরির প্রত্যাশায় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার বাড়িতে ফায়-ফরমাস খাটলেও আসগরের পরিবর্তে তাদের কল্যাণে চাকুরি পায় মন্ত্রীর শ্যালক বা ভাইপো। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের জীবনসত্যকে এভাবে লেখক আখতারুজ্জামান সাহিত্যিকে সত্যে রূপদান করেছেন।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'দোজখের ওম' গল্প গ্রন্থের চারটি গল্পের তৃতীয় গল্প অপঘাত। বাংলাদেশের মুক্তিযদ্ধের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া গল্পটির বিষয়বস্তু। একাত্তরের ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ এদেশের জনমানসে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল গল্পে তারই রূপায়ণ। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী এদেশের অধিবাসীদের স্বাধিকারের চেতনাকে বিনষ্ট করার অপতৎরতায় লিপ্ত হয়। ওরা যে ব্যাপক গণহত্যা, ধর্ষণ, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, নির্যাতন চালিয়ে ত্রাসের সৃষ্টি করে শিক্ষার্থী তরুণদের উপর তার প্রবল প্রভাব পড়ে। শহরে অধ্যয়নরত তরুণরা গ্রামে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়, বুলু তাদের প্রতিনিধি। ব্যক্তিক ও পারিবারিক প্রেক্ষাপট নিয়ে গল্পটি রচিত হলেও ব্যক্তিক ও পারিবারিক সংকট অতিক্রম করে যুদ্ধকালীন বাংলাদেশই গল্পটিতে মুখ্য হয়ে উঠেছে। লেখকের নিজস্ব Style-এ গল্পটি বর্ণিত হয়েছে। একাত্তরে মানুষ মৃত্যুপুরীতে বসবাস করার পাশাপাশি স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নেও বিভোর হয়েছে। তাই কেউ কেউ বর্ডার পার হয়ে ভারতে গিয়ে ট্রেনিং নেয় ও অস্ত্র নিয়ে দেশের ভেতর গেরিলা যুদ্ধ করে। গল্পটি বর্ণিত হয়েছে প্রধান চরিত্র মোবারক আলীর অনুভূতির আলোকে। গল্পে ইউনিয়ন পরিষদের কেরানি মোবারক আলির ছেলে বুলু ও চেয়ারম্যানের ছেলে শাহজাহান। গল্পে কারোই উপস্থিতি নেই। মোবারক আলীর দৃষ্টিকোণ থেকে তারা উপস্থাপিত হয়েছে। বুলু বৌ ডোলা খালের ব্রিজের কাছে মিলিটারির জীপ লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছোড়ে, সেখানেই সে হানাদারদের গুলিতে শহীদ হয়। মোবারক আলী প্রথম অবস্থায় তার ছেলের মৃত্যুকে অত্যন্ত দুঃখজনক দুর্ঘটনা বলে অপঘাত মৃত্যু বলে বিবেচনা করেছিল। চেয়ারম্যানের ছেলে শাজাহান বুলুর সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে চেয়েছিল কিন্তু পাকিস্তান পন্থী চেয়ারম্যানের প্রবল বাধার জন্য সে যোগ দিতে পারেনি। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে বুলু ও শাহজাহানের দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ,

উভয়েই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। তাই দুজনেই স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে গ্রামে ফিরে এসে যুবকদের সংঘটিত করে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে কিন্তু বুলু অভিভাবকের নির্দেশ উপেক্ষা করে যুদ্ধে যোগ দিতে পেরেছে। শাহজাহান তার বাবার নির্দেশ উপেক্ষা করতে পারেনি। এই শাহজাহানের মৃত্যু হয়েছে নিজের বাড়িতে টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে। এ মৃত্যু সাধারণ, এতে গর্বের বা অহংকারের কিছু নেই। উভয়েই অকালে মারা গিয়েছে, উভয়েই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। একজন শহীদ হয়েছেন রণাঙ্গনে, অন্যজনের ঘরে পাতা বিছানায় জ্বরে ভুগে।

বুলু ও শাহাজানের মধ্যে পার্থক্যটা মোবারকের কাছে স্পষ্ট হয়েছে উভয়ের মৃত্যুর পর। বুলুর দুর্ঘটনাজনিত অপঘাত মৃত্যুর তাৎপর্য মোবারক আলী গৌরবের বলে উপলব্ধি করে। একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পিতা হিসেবে গর্ববোধ করে। অর্থাৎ তাদের মৃত্যুর পর দ্বিধাগ্রস্ত মোবারক আলির চিত্তের মুক্তি ঘটেছে। প্রায় সমগ্র গল্প জুড়েই রয়েছে কেন্দ্রীয় চরিত্র মোবারক আলির দৃষ্টিভঙ্গি, তার উপলব্ধি তার প্রতিক্রিয়া। মোবারক আলির ভাবনার পথ ধরেই গল্পে আবির্ভাব ঘটেছে অন্যান্য চরিত্রের। লেখক বাস্তবধর্মী উপমা ও চিত্রকল্পে উপস্থাপন করেছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও গ্রামীণ জীবন। বগুড়ার আঞ্চলিক উপভাষার সার্থক ব্যবহার করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে মোবারক আলির ছেলে বুলুর মুক্তিযুদ্ধে যোগদান, বৌ ডোবা খালের ধারে পাটক্ষেতের ভেতর থেকে গ্রেনেড ছুড়ে পাকিস্তানি সৈন্য হত্যা, যুদ্ধের ময়দানে বুলুর আত্মবলিদান। সবকিছু লেখক ব্যতিক্রমী শিল্পকৌশলে বর্ণনা করেছেন। পাক হানাদার বাহিনীর দৃষ্টিকোণকে তীব্র বিদ্রূপে বিদ্ধ করে গল্পকার গল্পের নামকরণ করেছেন অপঘাত। এই গল্পে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস দ্বিধা-দ্বন্দ্বে বিচলিত একজন পিতার আত্মমুক্তিকে মোবারক আলির চরিত্রে রূপায়ণ করেছেন সার্থকভাবে। দেশমাতৃকার মুক্তিসংগ্রামে নিবেদিত প্রাণ বাঙালি তারুণ্যের প্রতিনিধি বুলু। গল্পের উল্লেখযোগ্য চরিত্র কাবেজ, তার বেপরোয়া চটুল সংলাপে প্রতিফলিত হয়েছে যুদ্ধকালীন অবস্থা। তার অপরিশীলিত সত্য ভাষণে এবং অসঙ্কোচ প্রকাশে যুদ্ধকালীন বাস্তবতা প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। 'বন্দুক কি কচ্চেন গো, মানুষের হাতে পান্টি দেখলে শালার বলে গোয়ার কাপড় তুল্যা কেট দৌড় মারবি তার দিশা পায় না'।– কাবেজের এই অসংস্কৃত ভাষার অসঙ্কোচ প্রকাশের মধ্য দিয়ে সমগ্র বাঙালির ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। এই অসংস্কৃত আঞ্চলিক ভাষার জন্যই কাবেজ চরিত্র সার্থক হয়েছে। বিপরীত ভাবনাধর্মী দ্বিধাদ্বন্দ্বে আন্দোলিত অনেক বাঙালির আর একটি প্রতীকী চরিত্র গল্পের চেয়ারম্যান। একদিকে ধর্মীয় ভাবনায় পাকিস্তানের

প্রতি আনুগত্য, অন্যদিকে তাদের নির্মমতা, স্বজনের মৃত্যুর আঘাতে পাকিস্তানিদের ধ্বংস কামনা করেছে।

স্বাধীনদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ অস্তিত্ববিনাশী ভাবনায় আক্রান্ত হয়, আশির দশকে লেখা 'দোজখের ওম' গল্পে তারই প্রকাশ। 'দোজখের ওম' গল্পের 'দোজখ ধর্মীয় নরক নয়, প্রতিদিনের রুক্ষ রূঢ় বাস্তব জীবনের মধ্যেই রয়েছে দোজখের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। এ গল্পের চরিত্র হচ্ছে বৃদ্ধ কামালউদ্দিন। তার পুত্র আকবর, আমজাদ, সোবহান, হানিফের মা। অসুস্থ শয্যাশায়ী কামালউদ্দিনের শয্যা পাশে প্রতিদিন তার মৃত স্ত্রীর উপস্থিতিতে গল্পে এক অলৌকিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে ও পুরোনো ঢাকার প্রায় পৌনে একশ বছরের একটি বাড়ির পরিবারের ইতিহাস কামালউদ্দিনের স্মৃতি, কল্পনা এ স্বপ্নে বর্ণিত হয়েছে, একটা নস্টালজিয়া তাকে সব সময় আচ্ছন্ন করে রাখে, তাতেই কামাল উদ্দিনের মনোবিশ্লেষণ, মনোবিকলন প্রধান হয়ে উঠেছে। পঞ্চাশের মন্বন্তর, মুক্তিযুদ্ধ, অলৌকিকের উপর আস্থা, তার সমকামীতার স্মৃতি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পারিবারিক ... সমস্যা প্রভৃতি ঘটনাপ্রবাহ মানসিক অসুস্থ কামালউদ্দিনের স্মৃতির আলোকে ধারাক্রমিক ব্যত্যয় না ঘটিয়েই এ গল্পে ভাষা পেয়েছে। হানিফের মা-র প্রতি এক সময় কামালউদ্দিনের গোপন প্রেম, পুত্র আকবরের স্বেচ্ছাচারী জীবনযাপন, আমজাদের বিপুল প্রভাব প্রতিপত্তি, সোবহানের মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ বিভিন্ন প্রসঙ্গ গল্পের বিস্তার ঘটিয়েছে।

আশি ও নব্বই দশকে আঙ্গিক নিরীক্ষার দুর্বিনীতকালে আত্মসন্ধানী আখতারুজ্জামান স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় রচনা করেন 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' (১৯৯৭) গল্পগ্রন্থ। গ্রন্থের গ্রন্থিত গল্পগুলো হলো ফোঁড়া, জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল, রেইন কোট, কান্না। সবগুলো গল্পই বর্ণনাধর্মী, তাই সঙ্গতকারণেই আয়তনে সুপরিসর। গল্পগুলোর বিষয়বস্তু শ্রমজীবী মানুষের অস্তিত্বের সংকট এবং তা থেকে উত্তরণের সাধনা লেখক মুক্তিযুদ্ধকালীন ভয়ঙ্কর ধ্বংসযজ্ঞ প্রাণঘাতী অভিজ্ঞতাকে বিস্তারিত বর্ণনায় প্রতীকের আশ্রয় নিয়ে বৃহত্তর জীবনাচেতনাকে শিল্পায়ন করেছেন।

'ফোঁড়া' গল্পে এক রিক্সাচালকের দেহে ফোঁড়া, তার মধ্যে জমাটবাধা পুঁজের যে তীব্র যন্ত্রণা তা শ্রমজীবী বিত্তহীন মানুষের অবরুদ্ধ জীবনযাত্রার প্রতীক। গল্পে রাজনৈতিক কর্মী ও শ্রমিক নেতা মামুন, নইমুদ্দিন এবং রিক্সাচালক এই তিনজনের পারস্পরিক কথোপকথনের গল্পের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

রিক্সাওয়ালার ছোট একটা উক্তির মধ্যে বিত্তহীন সমাজ জীবনের হাহাকার প্রতিবিম্বিত– 'ব্যাটা বিটি হামার বায়না ধরিছে', ভাত খামো। হামাগো বাঙালি

জাতের এই এক দোষ' –এই চুম্বকীয় বাক্যটির মধ্যে রিক্সাওয়ালার আত্মবিশ্লেষণ যেমন আছে তেমন সমাজ সম্পর্কে প্রকাশ পেয়েছে লেখকের নিজস্ব দর্শন।

জীবনের কঠোর নির্মম বাস্তবতাকে ইলিয়াস শ্লেষ ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন, তাতে জীবনের অন্তনির্হিত সত্য উঠে এসেছে। অসুস্থ হয়ে নইমুদ্দিন হাসপাতালে ভর্তি হয়, তাকে দেখতে যেয়ে পরিচয় হয় আহত এক মুয়াজ্জিনের সাথে। ডান পায়ে ফ্রাকচার হওয়া মুয়াজ্জিন পুরো রোজার মাসে তারাবি নামাজ ও সুরমা আতর বিক্রি করতে না পারার দুঃখে কাতর। 'পরকাল ও ইহকালের এই লোকসানে লোকটা ভেঙ্গে পড়েছে, রোজগারের মাস বলতে এই একটাই, তার পুরোটাই এবার পণ্ড হলো।' রোজগারটা পণ্ড হলো এটাই তার কাছে মুখ্য, তারাবি নামাজের প্রসঙ্গটি গৌণ। জীবিকার সমস্যা বড় বেশি প্রকট এ সমাজে। ধর্ম ব্যবহারের বাহ্যিক আবরণ বাইরের খোলস মাত্র। এই শ্রেণির মানুষকে বোঝানোর জন্য গল্পকার ব্যঙ্গ ও শ্লেষ ব্যবহার করেছেন।

দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনে পাকিস্তানি শাসকেরা আমাদের হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে উপরে ফেলে দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের আরব ভূমির সংস্কৃতির বীজ রোপণ করে দেশীয় সংস্কৃতির অগ্রযাত্রায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এই পরিস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা এদেশের গল্প সাহিত্যে যোগ করে এক নতুন মাত্রা। গল্প সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ দিয়েছে এক বিরাট পটভূমি। মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবেশ হয়েছে গল্পের বিষয়বস্তু। কিন্তু কিছুদিন যা যেতেই অপ্রতিরোধ্যতায় ব্যক্তিক ও সামষ্টিক জীবনযাত্রায় দেখা দেয় বিভিন্ন বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য, অবক্ষয়, ঘৃণা, অবিশ্বাস, বিচ্ছিন্নতা, নৈরাশ্য ও অস্তিত্ব বিনাশের বীজ-সমকালীন গল্পকারদের মত আখতারুজ্জামান ইলিয়াসও এই প্রেক্ষাপট ধারণ করে গল্প লিখেছেন। 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' গ্রন্থের নাম-ভূমিকার গল্পে লেখক মুক্তিযুদ্ধের বিচিত্র অভিজ্ঞতার অনুসঙ্গ যুদ্ধকালীন মানুষের স্বার্থোদ্ধার, একাত্তর পরবর্তী ধনিক শ্রেণির উত্থান, ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীল চক্র এসব বিষয়কে গল্পাকারে রূপ দিয়েছেন। লালমিয়ার দৃষ্টিতে গল্পকার ঘটনা প্রসঙ্গে এই বিষয়গুলো এনেছেন। বিশাল আয়তন এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র লালমিয়া, তার অবিরাম গল্প কথনে ছায়াছবির কাহিনী থেকে স্বপ্নে দেখা ধর্মীয় প্রাজ্ঞপুরুষ, একাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশে ভুঁইফোড় স্বাধীনতা বিরোধী ধনাঢ্য ব্যক্তি নাজির আলির চরিত্র ঘটনা-পরিক্রমায় উঠে এসেছে। লালমিয়ার সংলাপ তার অমার্জিত আচরণের

সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যা তার চরিত্রকে প্রাণবন্ত করেছে কিন্তু বারবার স্বপ্নদর্শনের ঘটনা উপস্থাপনে গল্পটির অঙ্গহানি হয়েছে। দুর্নীতি, স্বার্থপরতা ও ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলতায় দেশের পশ্চাৎমুখী অনগ্রসরতা লেখকের মনোভাব প্রতীকের অনুসঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গল্প রচনার ধারায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের রেইনকোট একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই গল্পে চোখে দেখা সবাই মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযোদ্ধা মিন্টুর রেখে যাওয়া রেইনকোটের প্রতীকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উজ্জীবন ঘটেছে গল্পটিতে। গল্পের চরিত্র রসায়নের অধ্যাপক নুরুল হুদা মুক্তিযোদ্ধা মিন্টুর দুলাভাই। তিনি পাকিস্তানি বর্বর মিলিটারির অত্যাচারের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত। শ্যালক মিন্টুর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ তার জন্য বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। বিপদসংকুলতার মধ্যেও মিন্টুর রেখে যাওয়া রেইনকোটটি তাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে, যার জন্য মিলিটারির অকথ্য নির্যাতন, প্রহার নিপীড়ন সত্ত্বেও তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের নাম ঠিকানা প্রকাশ করে নিজে মুক্তি পেয়ে জীবন বাঁচাতে চাননি। তাদের নিষ্ঠুর প্রহারকে মনে হয়েছে 'যেন বৃষ্টি পড়ছে মিন্টুর রেইনকোটের উপর।'

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সমাজের সকল স্তরের শ্রমজীবী মানুষকে তাঁর ছোটগল্পের চরিত্র করেছেন। তাঁর 'কান্না' গল্পের চরিত্র গোরস্থানের রক্ষক মৌলবি আফাজ আলি। গোরস্থানের রক্ষক হিসেবে মানুষের মৃত্যু তার কাছে সাধারণ ঘটনা, কিন্তু নিজ পুত্রের আকস্মিক মৃত্যু তাকে গভীর শূন্যতায় নিক্ষেপ করে। পুত্রশোক জনিত জীবনযন্ত্রণায় পায়রা নদীর ঢেউ ও জলস্রোত আফাজ আলির কাছে কবরের আজাব বলে মনে হয়। নিত্যনৈমিত্তিক মানুষের মৃত্যু, নদীর বহমান ঢেউ ও উজান ভাটির স্রোত এতদিন তার মনে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। পুত্রের মৃত্যু তার গতানুগতিক জীবনধারায় পরিবর্তন ঘটায়। পুত্র হবিবুল্লাহর কবর জিয়ারত করতে এসে আফাজ আলি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়, যা শোকার্ত মানুষের অন্তরবেদনা ও হৃদয় যন্ত্রণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ঘটনা ও চরিত্রের বর্ণনার বাহুল্য গল্পের কাহিনীর ধারাবাহিক দুর্বল ও চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশকে বাধাপ্রাপ্ত করেছে।

আখতারুজ্জমান ইলিয়াসের লেখায় আছে প্রচণ্ড শক্তি। যে শক্তি দিয়ে তিনি সমাজে প্রচলিত বাস্তবতার বিপরীত দিককে বাস্তব বলে মেনে পাঠককে তাতে বিশ্বস্ত করে তোলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু স্বকাল এবং বহু বিস্তৃত সমাজ দেখার নিরাশক্তি ও স্থৈর্য এই শিল্পীর রচনায় নেই।

ষাটের দশকের শক্তিমান, প্রতিশ্রুতিশীল কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের আঞ্চলিক ভাষার উপর দখল ছিল এবং অনেকগুলো ভাষা তাঁর আয়ত্তে ছিল। সংলাপের মধ্য দিয়ে তিনি কোন কোন চরিত্রকে এমনভাবে চিত্রিত করেছেন যারা সশরীরে সামনে এসে দাঁড়ায়। তাঁর রচনায় প্রবাদ প্রবচন, মুখের চলিত কথা, তীক্ষ্ম শ্লেষ গল্পের শরীরে সৌন্দর্য ও ভাবে সমৃদ্ধি এনেছে। সময়, প্রতিবেশ ও চরিত্রকে একীভূত করে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বাক্যে ও সংলাপে অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু ব্যবহারিক গুণে তা অবশ্যম্ভাবী বাকরীতি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে চরিত্র ও ঘটনাকে শিল্প গুণে মণ্ডিত করেছে। জনৈক সমালোচক লিখেছেন– 'মৃত্তিকার সংলগ্ন মানুষের কাছাকাছি পৌছবার প্রেরণায় তিনি নিম্নবিত্তের সংস্কৃতি তথা ভাষাকে প্রথম আত্মস্থ করার চেষ্টা করেন। অবিরাম খুঁজে চলেন তাদের সাথে যোগাযোগের এমন একটি সহজ প্রকাশের সন্ধানে, যা পাঠ মাত্র সচেতন পাঠক চিনে নেবেন তাঁর পাত্রপাত্রীকে। তাঁর গল্পে আঞ্চলিক ভাষা এক অনন্য শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। আঞ্চলিক শব্দ প্রয়োগে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো শিল্প সৌন্দর্যে উন্নীত হয়েছে। তাই হাসান আজিজুল হক লিখেছেন– 'একটি মাত্র সংলাপে চরিত্র নোনাগন্ধ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। অনেকগুলি আঞ্চলিক ভাষা তাঁর আয়ত্তে। কিন্তু তাঁর রচনার জগৎ (মানুষ বা প্রকৃতি) বর্ণনার জন্যে তিনি খুরের মতো অন্তর্ভেদী, মূলসন্ধানী উপমা বা চিত্রকল্প ব্যবহার করেন।' তিনি যখন বলেন–'মানুষের জিভ লোমহীন ছোট্ট ল্যাজ হয়ে মুখের ভেতর নড়াচড়া করে,–মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে ইব্রাহিমের এই অশ্রাব্য' প্রলাপ– তাঁর অসামান্য বর্ণনার চমক ক্ষুদ্র ও দীর্ঘ উভয় বাক্যেই ব্যবহার করেছেন। তাঁর বর্ণনা চিত্রধর্মী, উপমার বহুল ব্যবহারে তাতে চিত্রকল্প সৃষ্টি হয়েছে।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস গল্পে ব্যক্তির স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতা-সম্ভাবনা, অতীত-বর্তমান, জীবনের দুঃখ ক্লেদ প্রভৃতিকে সমাজ ও সময়ের ফ্রেমে বিন্যাস করেছেন। ইতিহাস, সমাজ, সমকাল ও রাষ্ট্রের সমগ্র রূপ পর্যবেক্ষণ করে বাস্তবতার নিরিখে তিনি গল্পের ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। জীবনের বাইরের সত্য ও অন্তরের বহুমাত্রিকতাকে লেখক আবেগবর্জিত হয়ে তাঁর জীবনদৃষ্টি ও শিল্পসৃষ্টির সমন্বয়ে গল্পের একটি স্বাতন্ত্র্যরূপ সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য প্রত্যেকটি গল্পের চরিত্রের মধ্যে রয়েছে। সমালোচকগণ মনে করেন এটা তার এক ধরনের ইগো। এ সম্পর্কে হাসান আজিজুল হকের মন্তব্য– 'এই কারণে মনে হয়। তাঁর প্রায় সব গল্পই গল্পের চৌহদ্দির মধ্যে শেষ হয়ে গেল। অসামান্য শক্তিতে চমকে যাই, ভাষার বিদ্যুৎ কিস্তিতে স্তম্ভিত হই। চমৎকার নাগরিকতা দেখি– অতি স্পষ্ট, অতি সত্য চিত্র

পাই একটির পর একটি, কিন্তু এ পর্যন্তই। গল্প যেখানে শেষ হয় সেখান থেকে বাড়ে না আর। আলো বা অন্ধকারের দিকে, বড় ক্ষোভ, বিদ্রোহ বা বড়ো বাসনার দিকে হাত বাড়ায় না। জীবনের, সমাজের, মানুষের ব্যাখ্যা নেই।'

ইলিয়াসের গল্পে মানুষের ও তার জীবন যাপনের ছবি আছে। সমাজের বর্ণনা আছে কিন্তু গভীরতর কোন সত্য তাতে উদ্ভাসিত হয়নি বলে কোন ঘটনা বা চরিত্র যথাযথ পরিণতি পায়নি।

সহায়ক গ্রন্থ

১. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়– হৃদয়ের একূল-ওকূলঃ দুই বঙ্গের গদ্য সাহিত্য।

২. হাসান আজিজুল হক– কথা সাহিত্যের কথকতা।

৩. সরদার আবদুস সাত্তার– কথা সাহিত্য সমীক্ষণ

৪. চঞ্চল কুমার বোস– বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পকরণ।

চিলেকোঠার সেপাই : উপন্যাসের বিষয়-ভাবনা, জীবন-জিজ্ঞাসা ও সমাজচিন্তা

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস গল্প, উপন্যাস প্রবন্ধ সব মাধ্যমেই একজন স্বল্পপ্রজ লেখক। এই স্বল্পতার মধ্যেই তিনি একজন নন্দিত ও জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে রয়েছে গভীর জীবনবোধ। সব বিষয়কেই তিনি বৃহত্তর জীবন অভিজ্ঞতার আলোকে সমগ্রতায় দেখেছেন আর শিল্পীর দায়বদ্ধতায় সেই অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসকে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তুলে ধরেছেন। তাঁর কথাসাহিত্যের কাহিনী ও চরিত্রে আছে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিও তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি। সেই পর্যবেক্ষণ শক্তি ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির আলোকেই আখতারুজ্জমান ইলিয়াস রচনা করেন 'চিলেকোঠার সেপাহি (১৯৮৬), খোয়াবনামা (১৯৯৫) উপন্যাস। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে করে তিনি উপন্যাসের কাহিনী রচনা করেছেন। তাতে ঘটেছে চরিত্রের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। উভয় উপন্যাসেই লেখক নিজের সমস্ত সত্তাকে তুলে ধরেছেন। এই দুই উপন্যাসেই তিনি রূপকথা, কল্পকথার মধ্যেও বর্তমানকেই তাৎপর্যময় করে তুলেছেন। মধ্যবিত্ত সমাজের ব্যক্তির গতানুগতিক দুঃখবেদনার কাহিনী থেকে তিনি উপন্যাসের বাক পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। সমাজ রূপান্তরের আকাঙ্ক্ষাতেই তিনি গল্প উপন্যাসের রূপান্তর ঘটাতে চেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন –'আমরা কৃষক মধ্যবিত্ত ব্যক্তির তরল ও পানসে দুঃখ বেদনার পাঁচালি গাই কিন্তু এতে উপন্যাসে কি ব্যক্তির যথাযথ সামাজিক অবস্থানটি কোনভাবেই প্রকাশিত হয়? এতে শেষে যে ব্যক্তিটিকে উদ্ধার করি সে কিন্তু রেনেসাঁসের সেই শক্ত সমর্থ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ নয়, বরং দায়িত্ব বোধহীন, ফাঁপা এক প্রাণীমাত্র।' (লেখকের দায় : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস)। ঔপনিবেশিক যুগে বাংলা উপন্যাসের সৃষ্টি কিন্তু ঔপনিবেশিক মানসিকতাকে লেখকেরা প্রশ্রয় দেননি। ব্যক্তির বিকাশই সেখানে মুখ্য।

ইলিয়াসের বিষয় ভাবনার মত তাঁর শিল্প সাহিত্যে গুরুত্ব পেয়েছে 'ব্যক্তি'র তত্ত্ব। কেননা আধুনিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ব্যক্তির উত্থান, পতন, ক্রমবিকাশ, ক্রমবিন্যাস ইত্যাদি। আধুনিক একজন ব্যক্তির মধ্যে পুঁজিবাদের শক্তি, শোষণ, বিজ্ঞানের আর্শীবাদ ও অপপ্রয়োগের কুফল সবই দেখা যায়। ইলিয়াসের উপন্যাসের ব্যক্তির চরিত্রায়ণে এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ই লিয়াসের

আদর্শ ব্যক্তি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নায়ক আবার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথিকৃৎ– কিন্তু তার সমস্যাও আছে। ইলিয়াসের মত শক্তিমান লেখকও পুঁজিবাদী সমাজের ভাবধারাকে এড়িয়ে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার উত্তরণ ঘটাতে পারেননি, দ্বৈতসত্তায় প্রায়ই আচ্ছন্ন হয়েছেন তিনি।

১৯৪৭ পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে একটি বড় সংযোজন ঘটিয়েছেন আমাদের এই ভূখণ্ডের লেখকেরা। রাজনৈতিক, সামাজিক বা আর্থ সামাজিক পটভূমিতে নানা চড়াই উৎরাই বিশেষত ভাষা আন্দোলন, সামরিক শাসন, ৬-দফা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণআন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁদের। খুব স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্য সংস্কৃতিতে এইসব আন্দোলনের ছাপ পড়েছে, তাই সাহিত্যিকেরাও এই পটভূমিকে তাঁদের সাহিত্যের বিষয় বস্তু করেছেন। সামগ্রিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এটি একটি বৃহত্তর সংযোজন– একে ধারণ করে বাংলাদেশের সাহিত্য বৈচিত্র্যময় একটি নতুন পথ সৃষ্টি করেছে। 'চিলে কোঠার সেপাই'– তার একটি অনন্য সংযোজন। একান্তই আমাদের নিজস্ব ঘরানার সাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস উপন্যাসটিতে নাগরিক ও গ্রামীণ জীবনের ব্যাপকতায় উপন্যাসের কাহিনী রচনা করেছেন।

মধ্যবিত্ত ব্যক্তির তরল ও পানসে দুঃখ বেদনার পাঁচালি রচনা করার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাই বিশেষ এক শ্রেণির পাঠকের জন্য তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন, যাদের– 'রোখ আছে, রোষ আছে, কায়েমি স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠানে বিরুদ্ধে যোঝবার জোর আছে।' যদিও তাদের সংখ্যা নগণ্য। প্রচলিত সংস্কার, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসকে তিনি তাঁর সাহিত্যে উপজীব্য করেননি। বিশেষ কাল পরিধির মধ্যে ঔপন্যাসিকের বক্তব্য সীমাবদ্ধ থাকেনি, বৃহত্তর সময় ও সমাজ জীবনকে তিনি আশ্রয় করেছেন।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলে কোঠার সেপাই' (১৯৮৬) উপনাসে পটভূমি ঊনসত্তরের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ। কিন্তু ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গির সর্বমুখী চেতনা নির্দিষ্ট পরিসীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তাঁর নিরাবেগ বস্তুজ্ঞান, মধ্যবিত্ত মন ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সমাজ জীবনকে রূপায়ণ করেছেন। আলোচক রফিকউল্লাহ খান– পঁচিশ বছরের বাংলাদেশের উপন্যাস' প্রবন্ধে বলেছেন–'বিচূর্ণিত, খণ্ডিত, তমসাচ্ছন্ন সময়ের বৃত্তাবদ্ধতা থেকে মুক্তি প্রত্যাশা ও জাতীয় অস্তিত্বের সম্পূর্ণতা সন্ধানের শিল্প অভিপ্রায়ে 'চিলেকোঠার সেপাই নিঃসন্দেহে স্বাধীনতা উত্তর কাল খণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।'

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় আখতারুজ্জামানের সাহিত্য প্রসঙ্গে বলেছেন, খোয়াব বিনা গত্যন্তর নেই। ইলিয়াসের জবানীতে তা 'স্বপ্নের বিশ্লেষণ ছাড়া স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার আয়োজন নেওয়া যায় না, জিজ্ঞাসাবঞ্চিত স্বপ্ন এক ধরনের ইচ্ছাপূরণমাত্র।' স্বপ্ন জিজ্ঞাসার তাগিদেই আখতারুজ্জামান ইলিয়াস গল্প উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধ রচনার পেছনে রয়েছে অভিন্ন রাজনৈতিক অভিনিবেশ। গল্প উপন্যাসে তিনি তন্ন তন্ন করে বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনের ঘটনাকে উদঘাটন করার চেষ্টা করেছেন, জানতে চেয়েছেন মধ্যবিত্তের সমাজ সংস্কৃতির উদ্ভাবনের ইতিহাস। মধ্যবিত্তের জীবন আলোচনায় তিনি প্রান্তজনকেও বাদ দেননি। শিল্প-সাহিত্য রাজনীতি অর্থনীতি-সংস্কৃতি সব কিছুতেই ইলিয়াসের বিচার ভাবনায় গুরুত্ব পেয়েছে ব্যক্তি। শোষক শাসিতের সম্পর্ক নিরূপণেই লেখকের শ্রেণিসংঘাতের অভিজ্ঞতা এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে একীভূত হয়েছে। সোনার বাংলার সম্পদে ফুলে ফেঁপে ওঠে পশ্চিম পাকিস্তান। বাংলাকে শোষণ করে গড়ে তোলা হয় করাচি লাহোর ইসলামাবাদ। বাংলার টাকায় পশ্চিম পাকিস্তানের মরুভূমিতে খাল কেটে ফলানো হয় ফসল। আমাদের বন্যা সমস্যার কোন সমাধান হয় না। আমাদের কৃষক পাটের ন্যায্যমূল্য পায় না। এখাঁনকার তৈরি কাগজ এখানকার ছাত্ররা বেশি দামে কিনতে বাধ্য হতো, বাঙালি বলে ভালো চাকরি থেকে এদেশের মানুষ বঞ্চিত ছিল। সোনার দাম এখানকার তুলনায় পাকিস্তানের কম। ওপরের দিকে বাঙালি অফিসারের সংখ্যা নেই বললেই চলে। আর্মিতে বাঙালি নেই। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক বিস্তর বৈষম্য। এই সব অধিকার আদায়ের কথা বললেই আমাদের নেতাকে কারাবন্দি করা হয়, মিথ্যা ষড়যন্ত্রের মামলায় নেতাকে নিঃশেষ করে দেওয়ার ফন্দি আটে আইয়ুব খান। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ আন্দোলনের রক্তপাতের ভেতর দিয়ে জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্দীপ্ত বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্রের নীল নক্সাকারীদের বিরুদ্ধে উত্তাল হয় এদেশে ছাত্র জনতা। এই ছাত্র জনতার ক্ষোভ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের পা চাটা দালাল আইয়ূব্ খান ও তার চেলা চামুণ্ডাদের দিয়ে এদেশের মানুষকে শোষণ করে চলেছে। এদেশের সাধারণ মানুষের পেটে ভাত নেই; পরনে কাপড় নেই। ঋণ ও সাহায্য নেয়ার নাম করে সাম্রাজ্যবাদের পোষা কুকুর আইয়ুব খান দেশকে, দেশের মানুষকে বন্ধক দিয়ে রেখেছেন বিদেশি প্রভুর কাছে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সাত কোটি বাঙালির রাজনৈতিক চিন্তা বাস্তবতার এই স্বরূপ ঔপন্যাসিকের চেতনায় ঝড় তুলেছিল। সাতকোটি বাঙালির প্রতিক্রিয়াকে লেখক এইভাবে উপন্যাসে

ভাষারূপ দিয়েছেন। এশিয়া আফ্রিকা ল্যাটিন আমেরিকার সর্বহারা মানুষের মত আমাদের দেশের কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষ আজ জেগে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদী দালালদের বিরুদ্ধে। নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত ছাত্রজনতা চায় ঘুণে-ধরা সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা থেকে মুক্ত হতে। তাই পিণ্ডির শাসকমুক্ত হতে এ দেশের মানুষ গর্জে উঠেছে। এই সবের বিরুদ্ধে ঊনসত্তরে আইয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে বাঙালির সংঘবদ্ধ আন্দোলন। মিটিং মিছিল শ্লোগান হরতালে উত্তাল হয় ঢাকা শহর। ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়ে দেশের সর্বত্র। পুলিশের গুলিতে নিহত হন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ অনেকে। ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধ শিল্পী এ ঘটনাকে কে'দ্র করে মহাকাব্যিক রূপ দিয়েছেন 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসটিতে। এই উপন্যাসের পটভূমি ঊনসত্তরের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ হলেও এখানে রয়েছে ঔপন্যাসিকের জীবনজিজ্ঞাসার বহুমুখী অভিজ্ঞতা। যা উপন্যাসের বিধৃত চেতনাকে নির্দিষ্ট কাল পরিসীমা থেকে মুক্তি দিয়েছে। লেখক নিপুণ দক্ষতায় এই উপন্যাসে বৃত্তাবদ্ধ মধ্যবিত্ত সমাজ মানসিকতার মধ্যে প্রাণ সঞ্চারের ভূমিকা নিয়েছেন, জীবনকে অন্ধকার থেকে আলোতে উত্তরণের প্রত্যাশায় তিনি ঘটনা ও চরিত্রকে প্রতিস্থাপন করেছেন।

এই উপন্যাসের ঘটনা গড়ে উঠেছে নগর জীবনের জটিল ও দ্বন্দ্বময় চেতনায়। যেখানে আছে মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ এবং স্বৈরশাসনের পক্ষপাত দুষ্ট দালাল মহাজন শ্রেণির মানুষ।

ঊনসত্তরের সংগ্রাম ও মিছিলে তরঙ্গিত ঢাকা শহর। মধ্যবিত্তের ব্যক্তি চরিত্র ওসমান, আত্মপ্রেম ও আত্মনিগ্রহপরায়ণ চেতনায় প্রবল গণআন্দোলনের টানে কীভাবে মানুষ চিলে কোঠার বিচ্ছিন্ন জগৎ থেকে বের হয়ে আসে, ওসমান গণি তার উদাহারণ। নির্লিপ্ত ওসমান ইউনিভার্সিটির ছাত্র শহীদ হওয়ার পর মিছিলে শরীক হয়। মিছিলে এত মানুষ যে নতুন পানির উজান স্রোতের মত যেন ঢাকার অতীত বর্তমান সব উথলে উঠেছে। সীমাহীন কাল ও স্থান অধিকারের জন্য ঢাকা শহর আজ একাগ্র চিত্ত। এই বিশাল প্রবাহের অবিচ্ছিন্ন স্রোতধারায় ক্ষুদ্রতম একটি অংশ হয়ে ওসমান হৃদয়ে উত্তাপ অনুভব করেছে। উত্তাপ ভরা বুকে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে সে হুংকার দেয়– 'বৃথা যেতে দেবো না।' এই জনস্রোত থেকে সে আজ বিচ্ছিন্ন হতে চায় না, তাই শওকতের ডাকে ওসমানের ভয় হয়– 'মূল স্রোতধারা থেকে ছিটকে পড়ে একটি নিঃসঙ্গ জলবিন্দুর মতো সে আবার হাওয়ায় শোষিত না হয়।' ৪৭-এর দেশ ভাগের পর বসাক বা সাহাদের কাছ থেকে রহমতউল্লার ক্রয়কৃত বাড়ির চিলে কোঠায়

ওসমান থাকে। ভারতবর্ষ ভাগ হলে ওসমানের বাবা পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসের জন্য আসলেও আবার তার জন্মভূমি ভারতে চলে গেছে। ওসমান একাই পাকিস্তানে থাকে। পুরোনো ঢাকার এক চিলেকোঠার ভাড়াটে বাসিন্দা কেরানি ওসমান উন্মুলিত আত্মমগ্ন, বিবরবাসী মধ্যবিত্তের প্রতিভূ। গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম পর্যায়ে অনেকটা নির্লিপ্ত দর্শকের মত ওসমানের গতিবিধি যে রাজনীতি সচেতন অথচ আত্মনিমগ্ন, তার মানসিকতায় এক ধরনের নিস্ক্রিয়তা রয়েছে কিন্তু মিছিলে গুলিতে নিহতের রক্তপাত তাকে আকর্ষণ করে। রাজনীতি হয়তো তার কাছে বিলাস, কিন্তু এই বেদনার্ত চেতনা থেকেই তার মধ্যে জন্ম নেয় সমষ্টি লগ্ন সংগ্রামী আকাঙ্ক্ষা। ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশে ইপিআরের জোয়ানদের তৎপরতা দেখে আত্মনিমগ্ন ওসমান উত্তেজিত হয়–' শালাদের প্রত্যেকের মুখে একটা করে লাথি মারার জন্য ওসমানের পা পিসপিস করে। তার পায়ের কদম সোজা হয় না।' ওসমান স্মৃতি নিমগ্ন হয়ে পড়ে। তার স্মৃতি ফিরে যায় ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময়কালে। বিদ্রোহী সিপাহীদের ফাঁসি দেওয়ার জন্য নবাব আবদুল গণিকে দেয়া পোঁতানো পামগাছের অস্তিত্ব গোড়া সিপাহীদেরকে বর্তমানের ওসমানের চেতনায় পাঞ্জাবি ইপিআরদের পজিশান নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা হেলমেটধারীদের অমানুষ-নিষ্ঠুর মনে হয়। ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি ও আলোকিত চেতনা গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ওসমানের সাথে সমসূত্রে গ্রথিত হয়ে 'চিলে কোঠার সেপাই' উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ নির্মিত হয়েছে। ওসমানের আত্মসন্ধান, আত্মার রক্তক্ষরণ ও আত্মার উজ্জীবনের চেতনা স্রোতে গড়ে উঠেছে এই উপন্যাসের মূল স্বরূপ। সংগ্রামের ভাব-আকাঙ্ক্ষার উদ্বুদ্ধ একটি ঘটনার প্রত্যাশায় ওসমান খাবারের কথা ভুলে তাড়াতাড়ি হাঁটে। কিন্তু পৌঁছতে না পৌঁছতেই শহীদদের জানাযা শেষ হয়ে যায়। গত কয়েকদিনে সারা পাকিস্তান জুড়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত শহীদদের জানাজা। জানাজার জমায়েত ভেঙে এদিক ওদিক লোকজনের ছোট ছোট জটলা। ছাত্রদের পরবর্তী কর্মসূচী জানবার জন্য ওসমান উদগ্রীব হয়ে জটলার কাছাকাছি হয়। কিন্তু মাইকের শব্দে কিছু বোঝা যায় না। মাইকের শব্দ ছাপিয়ে ওঠে ছাত্র জনতার শ্লোগান– শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না/ পুলিশী জুলুম বন্ধ কর/ আইয়ুব শাহী, মোনায়েম শাহী ধ্বংস হোক/ আইয়ুব মোনেম ভাই ভাই এক দড়িতে ফাঁসি চাই'– ইত্যাদি শ্লোগানে ওসমানের বুক দারুণভাবে ওঠানামা করে। তার নিঃশব্দ প্রতিক্রিয়ায় উচ্চারিত হয়– 'শুওরের বাচ্চা আইয়ূব খান মোনেম খানের চাকর-বাকরের দল, দ্যাখ। ভাল করে দেখে নে। তোদের সামনে খালি হাতে বুক সর্বস্ব করে তোদের বাপ আইয়ূব খানকে চ্যালেঞ্জ করতে এসেছে এরা।' মনের এই তীব্র প্রতিক্রিয়ায়

তার অন্তরাত্মা থেকে উচ্চারিত হয়- 'মুক্তি চাই মুক্তি চাই।' উপরিউক্ত উদ্ধৃতিতে রয়েছে ওসমানের আত্মস্বরূপের প্রকৃত পরিচয়।

গণ-আন্দোলনে হরতাল স্ট্রাইক-এ উত্তাল দেশ। জনরোষ সরকারের বিরুদ্ধে। নবাবপুর গুলিস্তান স্টেডিয়াম নীলক্ষেত সব জায়গাতেই মিটিং মিছিলে পুলিশের গুলি। ছাত্র জনতা হত্যায় বাঙালিদের মধ্যে এক পৃথক জাতিসত্তা বা জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছিল স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে। পুলিশের গুলিতে নিহত তালেবকে কেন্দ্র করে সেই আন্দোলন আরো তীব্র হয়ে ওঠে। এর মধ্যেও একদল মানুষ আছে যারা স্বৈরাচারী সরকারের সাথে আপোষ করে চলতে চায়, বাড়িওয়ালা রহমত উল্লাহ তাদের প্রতিনিধি চরিত্র। পাকিস্তানি শোষক শক্তির পদাঙ্ক অনুসারী রহমতউল্লাহ। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রতিক্রিয়ায় উত্তাল গণআন্দোলনের মামলার বিচারক ১নং জজসাহেবের বাড়িতে আগুন দেয়া, তাকে হন্য হয়ে খোঁজা, খিজিরের অংশগ্রহণ, জজসাহেবের প্রতি জনগণের আক্রোশ- এসবের ভেতর দিয়ে দেশের মানুষের স্বায়ত্ত শাসনের ও জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ, এর পাশাপাশি দেশের আন্দোলনের বিপক্ষচারী এক শ্রেণির ব্যক্তি আছে যারা পাকিস্তানি শাসকের পক্ষ নিয়ে মানুষের উপর নির্যাতন চালায়। খিজিররা এই শ্রেণির মানুষকে ধ্বংস করতে চায়। রিক্সাচালক, স্কুটার চালক খিজির, রাজমিস্ত্রি কামরুদ্দীন এরাও আন্দোলনে শরীক হয়ে ওঠে। সমষ্টি থেকে দূরবর্তী ওসমানের সজ্ঞচেতনার উদ্দীপক হতে অসংগঠিত স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী খিজিরের প্রয়োজন হয়। খিজিরের অভিজ্ঞতা ও আত্মদানে ওসমানের মত নির্লিপ্ত ব্যক্তিও ভূগোলের সীমা অতিক্রম করে আন্দোলনের সংগ্রামী জনসমুদ্রে নিজেকে প্রসারিত করে দেয়। তার চেতনাগত উপলব্ধি বর্তমানের ঘটনায় একীভূত হয়ে যায়। সে ছাদে যায়। রেলিঙে ভর দিয়ে দেখে মাত্র সাতজন লোকের সাথে শ্লোগান দিতে দিতে আসে খিজির আলি- 'সান্ধ্য আইন মানি না মানি না/ জেলের তালা ভাঙবো শেখ মুজিবকে আনবো/ জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো/ দিকে দিকে আগুন জ্বালো,- শ্লোগানগুলো একটা আওয়াজে মিলিত হয়ে ওসমানের করোটির দেয়াল তপ্ত করে তোলে। মুহূর্তেই নানা দিক থেকে এইসব শ্লোগানোর প্রতিধ্বনি বেজে ওঠে। চারদিকে গলি-উপগলি থেকে লোক এসে যোগ দিয়েছে খিজিরের সাথে। ওসমান চিন্তা করে এত লোকের বসবাস তো এই এলাকায় নেই। ওসমানের চেতন অবচেতন মনের কল্পনায় আসে- মহল্লার জ্যান্ত মানুষের সাথে যোগ দিচ্ছে ১০০ বছর আগে ও নবাবদের সাহেবদের হাতে নিহত মিরাট ও বেরিলির সেপাই, লক্ষ্মৌ ঘোড়াঘাট লালবাগের মানুষ। ভয়ে গা ছমছম করলেও ওসমান নিজেকে

সামলে নেয় কেননা সে আজ জনবিচ্ছিন্ন কোন মানুষ নয়। বিচ্ছিন্নতা মুক্ত হয়ে আজ জনকাতারে শামিল একজন মানুষ। খিজির নিহত হবার পরই প্রকৃত পক্ষে ওসমানের আত্ম রূপান্তর ঘটে। অভ্যাসগত শ্রেণিসত্তা থেকে তার মন উন্মুক্ত হয় জনতার জোয়ারে। একজন মৃত খিজিরকে কেন্দ্র করে সে আবিষ্কার করে অসংখ্য খিজিরের সম্মিলিত স্রোতধারা এই উপন্যাসের একদিকে রয়েছে সমাজের মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষ আর রয়েছে স্বৈর শাসকের অনুগ্রহপ্রাপ্ত দালাল, মহাজন শ্রেণি। উভয়ের সমন্বয়ে সৃষ্ট নগর জীবনের জটিল ও দ্বন্দ্বময় জীবন উপন্যাসের বিষয় হয়েছে– এই পর্যায়ে এসেছে গণ-আন্দোলনের সমর্থক ওসমান গনি, গণ-অভ্যুত্থানের স্বত:স্ফূর্ত সৈনিক খিজির আলি এবং পাকিস্তানি শোষক শক্তির অনুসারি রহমত উল্লাহ। অন্যদিকে আছে সামন্ত চেতনা ও বুর্জোয়া ভাবাদর্শের দ্বন্দ্বময় চেতনার গ্রামজীবনের ভূমিনির্ভর জোতদার, মুৎসুদ্দি, বর্গাচাষী ও বিত্তহীন ভূমিহীন মানুষ এই দুই শ্রেণির সংঘাতের দ্বন্দ্ব উপন্যাসের বিষয়বস্তু হয়েছে। তাতে মনোজগতে সে শামিল হয় সেই মিছিলে।

দেশের অসংখ্য শ্রমজীবী মানুষের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ এবং আবার স্বপ্নদেখার অসীম শক্তি তিনি দেখিয়েছেন কতিপয় চরিত্রে, খিজির আলি তাদের অন্যতম। শ্রমজীবী নিম্নবিত্ত মানুষকে তিনি মধ্যবিত্ত থেকে আলাদা করেই সৃষ্টি করেছেন। ফাঁক ও ফাঁকিকে উদঘাটন করতে ইলিয়াস সংঘাতে নামতেও পিছ পা হননি। অযথা সমীহ করা বা ভাবালু প্রশ্রয় জোগানো তাঁর স্বভাবে ছিল না। তাই তিনি তার এই উপন্যাসে সমাজ রূপান্তরের যুক্তি দিয়ে সাহিত্যে রূপান্তর ঘটানোর প্রয়াসী ছিলেন।

এই উপন্যাসের ঘটনা প্রবাহ দুটি সমান্তরাল রেখায় বিন্যস্ত হয়েছে। একদিকে ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান কালীন উত্তাল রাজনৈতিক শহর ঢাকা এবং অন্যদিকে শ্রেণি সংঘাতজনিত গ্রামীণ জনপদ; যাকে ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে উপন্যাসের বর্হিঘটনাবৃত্ত। এই দুইয়ের সমন্বয়, সংকট ও সংঘর্ষে এই উপন্যাসের অখণ্ড জীবনবৃত্ত নির্মিত হয়েছে।

সচেতন মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী শ্রেণির মধ্যে দেশের বৈষম্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছিল, তাই অফিস আদালতে আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা সমালোচনা হরতালের দিনগুলোতে মুখ্য হয়ে উঠেছিল। দেশ ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাদের উদ্বিগ্নতার শেষ নেই। এই চাকরিজীবী মধ্যবিত্তের সমস্যাটাই বেশি। অফিসের বড় সাহেবেরা অধস্তন কর্মচারীর অফিসের গরহাজির নিয়ে খুব কড়াকড়ি করেন না, তাতে দেশ ও আন্দোলন সম্পর্কে

তাদের Moral Support-ই প্রকাশ পায়। রাষ্ট্রের চিন্তায় এরা উদ্বিগ্ন– এই চাকরিজীবী মধ্যবিত্তরা বিশ্বাস করে আইয়ুব সরকার নত হতে বাধ্য, পলিটিক্যাল Situation তাদের আওতার বাইরে, তাই সেনাবাহিনী নামানোর আশঙ্কায় তারা (মধ্যবিত্ত) শঙ্কিত।

শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি সব কিছুই ইলিয়াসের বিচার ভাবনায় গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁর কাছে আধুনিকতার প্রধানতম বিষয় হলো মানুষ, মানুষের জীবনাচরণ অর্থাৎ ব্যক্তির উত্থান পতন ক্রমবিকাশ ক্রমবিনাশ সব। তাই তাঁর উপন্যাসে ব্যক্তির প্রাধান্য। তাঁর উপন্যাসে পুঁজিবাদের শক্তি ও শোষণের চেহারা, বিজ্ঞানের কল্যাণ ও ধ্বংসের মূর্তি-দুই-ই প্রধান হয়ে উঠেছে, ইলিয়াসের আদর্শ ব্যক্তি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নায়ক আবার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথিকৃৎ এই দুই সত্তায় বিভক্ত।

আনোয়ারের মধ্যে রয়েছে ইতিবাচক রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গি তার পলিটিক্যাল এ্যানালিসিস খুব ভালো। এ্যাকশনে নামা মানুষগুলোর রি-এ্যাক্টকে সে সমর্থন করে রাজনীতির সাথে জড়িত হলেও মাথা ঠান্ডা রেখে বিবেচেনা করে কথা বলে। বিপ্লবের অবস্থা জানতে পাবনা নোয়াখালি যাতায়াত করে। আনোয়ার বলে– 'ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলিতে মিনিস্টাররা পর্যন্ত ডিসপ্যারিটির ডাটা সাপ্লাই করে। কনস্টিটিউশনে ডিসপ্যারিটির কথা আছে।' আমাদের ভাষা, কালচার থেকে শুরু করে অর্থনীতি সব আজ পাঞ্জাবিদের এক্সপ্লয়টেশনের (শোষণ) শিকার কিন্তু শাসক কর্তৃপক্ষ প্রতিকারের ব্যবস্থা করে না। আনোয়ারের মানসিকতার মধ্যে যে চৈতন্যের বিকাশ ঘটেছে তা ঊনসত্তরের প্রগতিশীল রাজনীতি সচেতন মধ্যবিত্তের জন্য স্বাভাবিক ও সঙ্গত। আনোয়ার ও ওসমানের মধ্যে বাঙালি জাতিসত্তার যে উত্তরণ তা লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির চিত্রায়ণ। আনোয়ার মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্ব বিশ্বাস করে না। কিন্তু ফরিদের মত মানুষেরা জানে লেলিন, চৌ-এন-লাই এঁরা মধ্যবিত্ত সমাজ থেকেই এসেছিলেন, সবদেশেই মধ্যবিত্তরাই আন্দোলন নেতৃত্ব দেন।

পাকিস্তানিদের শোষণ পূর্ব পাকিস্তানিদের বিদ্রোহী করে তুলেছে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী দেশের দুই অংশকে এক মনে করলে এ রকম বৈষম্য হতো না। পাকিস্তানিরা ঢাকাকে সিটি ঘোষণা করে না, কারণ এখানে চাকরিরত মানুষকে সিটি এলাউন্স দিতে হবে। ঊনসত্তরের গণ আন্দোলন দেশের আগের আন্দোলন থেকে আলাদা। তেভাগা, হাজং বা সাঁওতাল বিদ্রোহ বিশেষ বিশেষ এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু এ আন্দোলন গোটা প্রদেশ জুড়ে, প্রভিন্স তো বটেই, লেখকের ভাষায় কান্ট্রিওয়াইড মুভমেন্ট, পশ্চিম

পাকিস্তানের মানুষেরাও এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো পিচ্চি, মাতারির ছেলেও হরতাল সফল করতে সহায়তা করে। এই আন্দোলন শুধু এ্যাডাল্ট ফ্রাঞ্চাইজ আর পার্লামেন্টারি ফর্ম আর অটোনমির জন্য ছিল না, তা ছিল ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। এ শুধু চরিত্রের ভাবনা নয়, সমস্ত পূর্বপাকিস্তানির মনের কথা। ভোটাধিকার প্রয়োগ আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্য, ক্ষমতায় না আসতে পারলে বাঙালি কিছুই করতে পারবে না। গণতন্ত্র ও ভোটের অধিকার আদায় এদেশের মানুষের তখন প্রধান দাবি ছিল। সেই দাবিতে দেশজুড়ে আন্দোলন– এই প্রেক্ষাপটেই উপন্যাসের কাহিনী রচিত হয়েছে।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বাস্তবজ্ঞান সম্পন্ন মধ্যবিত্ত মন মানসিকতা এবং সমকালীন জীবন ও সমাজের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ অভিজ্ঞতা এই উপন্যাস রূপায়নে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে নব্য পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে পূর্ববাংলার মানুষ বন্দী হয়। ঔপন্যাসিক নব্য উপনিবেশ কবলিত পূর্ববাংলার নাগরিক ও গ্রামীণ জীবনের বিস্তৃত পরিসরকে 'চিলে কোঠার সেপাই' উপন্যাসের বিষয়বস্তু করেছেন। নগর জীবনের জটিল ও দ্বন্ধময় চেতনার প্রেক্ষাপটে শাসক পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ, ও এদেশে শোষিতের প্রতি অসম বৈষম্যমূলক সম্পর্ক সেই সূত্রে শ্রেণিসংঘাতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কেন্দ্রে স্থাপিত আত্মনিমগ্ন ওসমানগণি, যে অধিকার আদায়ে উত্তাল গণআন্দোলনের দিকে অগ্রসরমান, ভাসমান শ্রমিক খিজির আলী গণ অভ্যুত্থানের একজন স্বতঃস্ফূর্ত সৈনিক– যে শ্লোগান দেয়, পাল্টা শ্লোগান দেয়। বক্তৃতায় উত্তাল করে তোলে মিছিল মিটিং-আন্দোলনের পরিণতি নিয়ে খিজিরের মত মানুষ উদ্বিগ্ন হয়। আলাউদ্দিন ঘাবড়ে যায়, কেননা তার অনেক দিনের অভিজ্ঞতায় সে জানে এসব ব্যাপার কেবল শব্দবাণে সীমাবদ্ধ থাকে না। ছাত্র জনতার ঐক্যটাই হলো এ আন্দোলন সার্থক হওয়ার বড় অস্ত্র।

দ্বিতীয় ধারায় আছে সামন্ত চেতনা ও বুর্জোয়া ভাবাদর্শের দ্বন্ধময় বৈশিষ্ট্যে গঠিত গ্রামজীবন– সেখানে আছে ভূমি নির্ভর জোতদার এবং বুর্জোয়া শ্রেণির সামন্ত, যাদের সাথে অবিরত চলে বর্গাচাষী ও বিত্তহীনদের দ্বন্ধ সংঘাত। করমালি, খয়বার আলী এই ধারার প্রতিনিধিত্ব করে। একটি সময় পরিধির সামাজিক রাজনৈতিক জীবন সৃষ্টির প্রয়োজনে নগর ও গ্রামীণ জীবনপ্রবাহকে অখণ্ড তাৎপর্যে রূপায়িত করেছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। রাজনৈতিক প্রসঙ্গকে উপন্যাসের ভিত্তি করেছেন কিন্তু সামাজিক প্রসঙ্গকে বাদ দেননি।

বাড়িওয়ালা রহমত উল্লাহর চরিত্র, বাড়তি ভাড়া আদায়, চাকরিজীবী মানুষের আর্থিক সমস্যার প্রেক্ষাপটও তিনি উল্লেখ করেছেন। ওসমানকে চাকরির বাইরেও প্রাইভেট টিউশনি করতে হয়, ছোট চাকুরে মকবুল হোসেনের বেশি ভাড়ার বাড়িতে থাকার সামর্থ নেই, শওকত, খালেদ, আনোয়ার হুইস্কি খায় নিঃসঙ্কোচে। খিজিরদের বস্তিতে নোংরা পরিবেশ, হাড্ডি খিজির যে নিজের বাপের নাম জানে না, যে বড় হয়েছে রাস্তায় রাস্তায়, যার মা বোন দুজনেই মহাজন রহমতউল্লাহর ভোগ্য, রানুর প্রতি ওসমানের তীব্র ভালোবাসার তৃষ্ণা, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি একজন তরুণের স্বাভাবিক আকর্ষণ যা ওসমানের হয়েছে– এসব লেখক প্রকাশ করেছেন সহজ ভাষায়। রানুর প্রতি ওসমানের ভালবাসাকে লেখক এভাবে প্রকাশ করেছেন– 'রানুর নাকের ডগায় ও ঠোঁটের ওপরকার জলবিন্দু শুষে নেবার জন্য ওসমানের পিপাসা পায়। ওসমান ছটফট করে। সেই পিপাসা ছড়িয়ে পড়ে তার শরীরে, সেই পিপাসার তীব্রতা ক্রমে বাড়ে। আরো আছে আফসার গাজীর পতিতা পল্লীতে যাওয়ার কথা, বস্তির জীবনের কথা আছে। এই স্থুল ভোগাবাদীদের বিবেক বলতে কিছু থাকে না। স্বামী স্ত্রীর নিম্নরুচির কথাবার্তায় বস্তিবাসীদের চরিত্র ও জীবন যাপনের কথা উঠে এসেছে। নেশা করা, স্ত্রী নির্যাতন করা এদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। পেটের সন্তানকে খিজির খাবার দিতে পারবে কি না জুম্মনের মার কাছে সেটাই বড় কথা। তাই খিজিরকে ছেড়ে কামরুদ্দীনকে বিয়ে করতে তার বিবেকের দংশন নেই। আরও আছে দেশীয় যাত্রাপালার কথা। সুদে টাকা ধার দেওয়া নেয়ার প্রসঙ্গ। প্রেম-ভালোবসা তাদের কাছে তুচ্ছ। রহমতউল্লাহ-আলাউদ্দিন প্রতিপক্ষ, মহল্লার নেতৃত্ব উভয়েরই লক্ষ্য।

বেসিক ডেমোক্রেসি, আওয়ামীলীগ-মুসলিম লীগের কথার পাশাপাশি চর অধ্যুষিত বাংলাদেশের নিম্নবিত্ত মানুষ নবেজদের কথাও এই উপন্যাসে এসেছে। খয়বার গাজী, হোসেন আলীদের কাছে নবেজরা অসহায়। চরের মধ্যে তাদের দাপটে সবাই ভীতু। গরু আটকে রেখে টাকা নিলেও নবেজ কথা বলতে সাহস পায় না। এরা গরুওয়ালাদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করে। ইউনিয়ন বোর্ড, আইয়ুব খানের পার্টি, ভোট এসব করে এই শ্রেণির মানুষ সুবিধা আদায় করে চর এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করে নিরীহ মানুষকে শোষণ করে। হোসেন আলীরা ওয়াকার্স প্রোগ্রামের গম বিক্রি করে দিলেও নবেজ আলীরা কিছু বলার সাহস পায় না। করমালিকে তাদের ভয় স্বপ্নে তাড়া করে বেড়ায়। গরীব চাষাভুষারা এসব স্বার্থান্বেষী তথাকথিত শিক্ষিত অর্থবান মানুষদের দ্বারা নিগৃহীত হয়। রহমতউল্লাহর ও খয়বর গাজী পাকিস্তানি শাসকচক্রের সেবাদাস এলাকায় তারা নিজেদের প্রভাব সম্প্রসারিত করতে

চায়। বর্গাচাষীদের নির্মমভাবে শোষণ করে তারা। খয়বার আলির নির্দেশে গ্রামাঞ্চলের বর্গাচাষীদের চুরি করা গরু রাখা হয় চরের নিরাপদ আস্তানায়। ফলে এক সময়ে নিগ্রহিতরা ক্রুদ্ধ হয়ে আলিবক্সের নেতৃত্বে পুড়িয়ে দেয় খয়বর গাজীর দুষ্কর্মের সহযোগী হোসেন আলীর আস্তানা। খিজির আলী, টেংটু বান্দু শেখ করমালি আলিবক্স গংদের মধ্য বিত্তহীন শ্রেণির স্বভাবজাত সহমর্মিতার বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত। এই সংগঠিত জনতা গ্রাম্য-কুসংস্কারের পীঠস্থান বৈরাগীর ভিটা পরিষ্কার করে খয়বর আলীর বিচারের জন্য গণ আদালতের আয়োজন করে। খয়বর গাজী জুম্মার নামাজের কথা বলে আদালতের কার্যক্রম বিলম্বিত করে। এক সময়ে আওয়ামীলীগের মিছিল এসে নষ্ট করে গণআদালতের কার্যক্রম। খয়বার গাজীর মৃত্যুর দণ্ডাদেশ গণ আদালত আর কার্যকর করতে পারে না।

সুযোগ সন্ধানী হোসেন আলী কথার মার প্যাঁচ দিয়ে আনোয়ারসহ অন্যান্যকে বশ করার চেষ্টা করে। খোয়ারে গরু আটকে রেখে এরা টাকা আদায় করে। তাদের ভণ্ডামির শেষ নেই। আলিবক্সের সাথে আনোয়ারের সম্পর্ক আছে বলে তাকে হোসেন আলী সমীহ করার ভাব দেখায়। আনোয়ার কৃষকদের গরুগুলো উদ্ধার করার চেষ্টা করে কিন্তু হোসেন আলির চাতুর্যের কাছে সে পেরে ওঠে না। এই খয়বার আলি-রা এত শক্তিশালী যে আনোয়ার গং-রা তাদের উচ্ছেদ করতে পারে না। এই খয়বার আলীর জন্য চর এলাকার জমি উঠলে আসল মালিক তার দখল পায় না, তা খয়বার আলীর ভোগদখলে চলে যায়, এই ব্যক্তির হুকুমে কত মানুষ মরেছে যে তার হিসেবে নেই, জমির লোভে সে অনেক মানুষকে পথে বসিয়েছে। সমাজের আর একজন দুষ্টু মানুষ– মৌলিক গণতন্ত্রী আবদুল কাদের মণ্ডল, মাদারগঞ্জ থানার গরুচুরির ব্যাপারে হোসেন আলির প্রধান প্রতিনিধি। আকালের সময় সে এবং তার ছেলে একেক জন চাষাকে ২০/৩০ সের করে ধান দিয়ে তাদের সর্বস্ব লিখিয়ে নিয়েছে। মানুষ মারতেও এরা দ্বিধা করে না। খয়বার গাজীর নামাজ পড়তে পড়তে কপালে কড়া পড়ে গেছে, কিন্তু মিথ্যাবলা ও দুষ্কর্ম করা তার স্বভাব।

খয়বার আলী, হামিদ তালুকদার, মাদারী আকন্দ– এদের উপর ভর করেই সার্কেল অফিসার, তহশীলদার, এমএলএ, মন্ত্রীরা মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। এরা স্বেচ্ছাচারী, জমিতে ইচ্ছামত খাজনা বসায়। জমি থেকে ভিটা থেকে মানুষকে উচ্ছেদ করে, যাকে তাকে ধরে থানায় দেয়, বেগার খাটায়। এক তহশীলদার ছয় বছর চাকরি করে জমি করেছে একুশ বিঘা, পুকুর কিনেছে দুইশটা। এই সব অপশক্তির বিরুদ্ধে একজোট হওয়া প্রয়োজন মনে করে আলি বক্সরা। গ্রামের এই উঠতি কর্মীরা শহুরে নেতাদের পার্টি ভাঙ্গা

পছন্দ করে না। তারা বিশ্বাস করে দল ছাড়াও দরকার সকলের একজোট হওয়া। মানুষকে তারা এইভাবে Motivate করতে চায়। বামরাজনীতিবিদ আলিবক্স বোঝে– 'জনগণতান্ত্রিক কন আর স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক কন, উপনিবেশ কন আর আধা উপনিবেশ কন, গাঁয়ের মধ্যেকার শয়তানগুলাক শ্যাষ করবার না পারলে কোনো কাম হবে না।'

হোসেন আলীরা যাই-ই করুক আলি বক্সদের ভয় পায়। হোসেন আলিরা তাদের শ্রেণিশত্রু। আলি বক্সরা শ্রেণিশত্রু ধ্বংস করতে চায় যাতে এমএলএ মন্ত্রী কারো ক্ষমতা হবে না এই যমুনার পুব পশ্চিম কন্ট্রোল করে। এ জন্য একতা প্রয়োজন। তৃণমূলের সাথে সংশ্লিষ্টহীন রাজনীতিকরা তার গুরুত্ব দেয় না। গ্রামের সহজ সরল আলিবক্স যা বিশ্বাস করে, শহুরে আনোয়ার বাস্তব অবস্থা জানে যে গ্রামের কিছু লোক মেরে ফেললেই রাষ্ট্রযন্ত্র ভেঙ্গে পড়বে না। এদের দাপট যতদিন থাকবে এই রাষ্ট্রকাঠামোতে ততদিন কোন চিড় ধরানো অসম্ভব। খয়বার গাজীরা রাষ্ট্রযন্ত্রের ছত্রছায়ায় থাকে বলেই গণআদালতের বিচার থেকে পালিয়ে জেল ফে্‌ আওয়ামীলীগ নেতার নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। নির্মমভাবে হত্যা করা হয় চেংটুকে। চেংটুদের পরিষ্কার করা বৈরাগীর ভিটায় আওয়ামীলীগের সমাবেশ চলে। কিন্তু এই ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাজনৈতিকর্মী আনোয়ারের থাকে না। আনোয়ারদের গ্রামে সংঘটিত গণআন্দোলনের নেতৃত্ব চলে যায় আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে; তাতে শ্রেণি সংগ্রামে বিশ্বাসী সংগঠন সমূহের সংগ্রামের গতি বাধাগ্রস্ত হয়। দু'পক্ষের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিভক্তিতে গণসংগ্রামের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

এই উপন্যাসে আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ আছে জালাল মাস্টার। জালাল মাস্টারের মুখ দিয়ে ঔপন্যাসিক গ্রামের দুশো বছরের পুরোনো বটগাছের প্রসঙ্গে ইংরেজ শাসনের গোড়ার দিকে কোম্পানি আমলের শুরুতে ফকির সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহের কথা বলেছেন। মজনু শাহ, ফকির মুসা শাহ, ভবানী পাঠক প্রমুখ দেশপ্রেমিক বিদ্রোহীর কথা বলেন। পরাজিত বিদ্রোহীদের পরিণতির জন্য এদেশবাসী দায়ী। ইংরেজদের হাতে তখন আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। এ দেশি বড়লোকেরা তাদের লাঠিয়ালে পরিণত হয়। তাদের মারে সন্ন্যাসী ফকিরের দল ছিটকে পড়ে এদিক ওদিক। গভীর জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে তারা আরো বড় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। ভবানী পাঠক মিলিত হন ফকিরদের পলাতক কর্মীদের সাথে। মহাস্থান, ঘোড়াঘাট ফকিরদের ঘাঁটিতে যেয়ে ভবানী পাঠক বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিয়েছেন কিন্তু দেশীয় শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতায় ধীরে ধীরে সেই বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে যায়। এদেশে ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তারে দেশীয় স্বার্থান্বেষী চক্রান্তের ঐতিহাসিক সত্যতা

ঔপন্যাসিক প্রসঙ্গান্তরে বলেছেন– চিলেকোঠার সেপাই উপন্যাসের পটভূমি ঊনসত্তরের গণ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায়। দুশো বছর আগে থেকেই এদেশের মানুষ দেশের জাতীয় ও স্বাধিকারের আন্দোলন শুরু করেছিল– উপন্যাসে আলোচিত প্রেক্ষাপট তাই এদেশে নতুন কোন বিষয় নয়।

রাজনীতি বিশ্লেষক বামপন্থী আনোয়ার মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আযম, জওহরলাল নেহেরু, ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী-র মত বড় বড় ঘরের উচ্চ শিক্ষিত নেতাদের মধ্যে আন্দোলন সংগ্রামের নেতৃত্ব সীমাবদ্ধ দেখতে চাননি– এক্ষেত্রে লেখকের চিন্তাচেতনার বহিঃপ্রকাশ ও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন লক্ষ্যণীয়, তিনি ঘটনা প্রসঙ্গে এই উপলব্ধি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে বাণীবদ্ধ করেছেন– 'বিদেশীর বিরুদ্ধে আন্দোলন, তার আর বড়ো ছোটো ঘর কি? দেশের সকল অধিবাসীর সংগ্রাম, বিদেশী শাসকদের এদেশীয় দোসরদেরও অভাব নেই, নিজেদের স্বার্থে তারা বিদেশি শাসকদের সাথে হাত মিলায়।'

রিক্সাচালক খিজির, রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর দর্শন স্বচ্ছ। একটি পোষ্টারে একজন সৈন্যর ছবি, তার মাথায় হেলমেট, কোমরে ফিট করা পিস্তল, হাতে রাইফেল। তাক করা, রাইফেলের সামনে হাজার হাজার মানুষের মিছিল। সৈন্যের চোখ দুটো কালো কাপড়ে ঢাকা'– এ ছবি দিয়ে পোস্টার শিল্পী বুঝিয়েছেন– 'মিলিটারির লোকজন অন্ধের মত মানুষ হত্যা করে চলেছে'– কিন্তু খিজির তা বিশ্বাস করে না। খিজির মনে করে আইয়ুব খান অন্ধ নয়, শয়তান 'শয়তানের চোখ বরং অনেক বেশি, আগে পিছে সে অনেক কিছু দেখতে পায়। তার থেকে বাঁচাতে হলে তার চোখগুলো চিরকালের জন্য অন্ধ করে দেয়া দরকার। স্বায়ত্ত শাসনের সপক্ষ শক্তির সমর্থক ঔপন্যাসিক খিজিরের মত নিঃস্বার্থ দেশ প্রেমিক চরিত্র সৃষ্টি করে আন্দোলনের সপক্ষে তাঁর মতবাদকে প্রকাশ করেছেন।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস জাতীয় রাজনীতির এই অন্তঃস্বরূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন। ঊনসত্তরের উত্তাল গণআন্দোলনে জাতীয় মুক্তির সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত হলেও সাধারণ মানুষের গুণগত পরিবর্তন হয় না। ওসমানের জীবনের পরিবর্তনে খিজির চেংটু আলিবক্সদের প্রভাব পড়েছে। এক নেতায় বিশ্বাসী আলাউদ্দিন, ভোটের অধিকার প্রার্থী আলতাফ, রাজনীতি বিশ্লেষক বামপন্থী আনোয়ারদের জায়গা দখল করেছে হাড্ডি খিজির গং। চিলে কোঠার দুর্গ থেকে ওসমানকে বেরিয়ে পড়তে প্ররোচনা দেয় হাড্ডি খিজির। ওসমানের চিলে কোঠায় মশারির নিচে ঘুমায় বিপ্লবী আনোয়ার। খিজিরের ডাকে ওসমান দরজা ভাঙে, কিন্তু সুস্থ আনোয়ার সাড়া দেয় না, আনোয়ারদের কানে

খিজিরদের ডাক লেখক পৌঁছে দিতে চান। শ্রমজীবী মানুষের স্বপ্ন দেখার অসীম শক্তিকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসেই লেখক সমাজের শ্রেণিগত মানুষের ত্রুটি বিচ্যুতির সমালোচনা করেছেন।

গণ অভ্যুত্থানের সংগ্রামের সদস্য হওয়ার অপরাধে খিজিরকে মধ্যরাতে কারফিউ চাপা রাস্তায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হতে হয় মিলিটারির হাতে। নিহত খিজিরের ডাকে সক্রিয় সাড়া দিয়ে ওসমান ঘরের তালা ভাঙ্গে। সবার অগোচরে সে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়, কারফিউর দাপট অগ্রাহ্য করে। তার সামনের সব রাস্তা খোলা। জনৈক সমালোচক, বলেছেন- 'ওসমান যে দিকেই পা বাড়ায় সেদিকেই পূর্ব বাঙলা। এভাবে বাঙালির মুক্তি আন্দোলন শেষ পর্যন্ত মধ্যবিত্তের স্বপ্ন ও সংগ্রামে পরিণত হয়।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের এই উপন্যাসের বিষয়গত ভাবনার যথাযথ মূল্যায়ন করেছেন জনৈক সমালোচক 'এই উপন্যাসের বিষয় কল্পনার মূলে মধ্যবিত্তের আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মরূপান্তরের স্বরূপ অন্বেষণের প্রেরণাই মুখ্য। আশির দশকের রাজনীতি প্রবাহ সেনাতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের বিনাশী কর্মধারা মধ্যবিত্তের দোদুল্যমান প্রতিবাদ ও সংগ্রাম, রাজনৈতিক সংগঠন সমূহের আদর্শগত দূরত্ব, দ্বিধাবিভক্ত প্রভৃতির বাস্তব অভিজ্ঞতা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে উত্তাল সময়খন্ডের সমাজ রাজনৈতিক সত্য অন্বেষায় উদ্ধুদ্ধ করেছে।'

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত জীবনের সংগ্রামী চেতনাকে তিনি প্রায় দুই-দশকের কালিক দূরত্ব থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। সংগ্রাম আন্দোলনের পাশে তিনি আধুনিক জীবনের জটিল সংকটকেও তুলে ধরেছেন। বিচিত্র ঘটনা ও নানা মাত্রিক চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে শহর ও গ্রামের মানুষের সংঘাতময় জীবনের স্বরূপ অঙ্কন করে মধ্যবিত্তের জীবন ও সমাজসত্তার পরিচয় তুলে ধরেছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে গতানুগতিক জীবনের বৃত্তাবদ্ধতা থেকে তিনি বের করে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। ইলিয়াসের সাহিত্যে কোন ভাব প্রবণতা ছিল না। সাহিত্যে তিনি প্রেম ভালোবাসা নিষ্ঠুরতা আক্রোশ ঘৃণাকেও গুরুত্ব দিয়েছেন কেননা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলোর উপযোগিতা থাকে। ইলিয়াসের লেখায় মানবিকতার এই ব্যাখ্যা একটি তত্ত্বরূপ নিয়েছে। আজকের সমাজের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের জন্যই হয়তো তিনি প্রেম ভালোবাসা মায়া মমতা বিশ্বাস আস্থার মত মানবিক গুণাবলীর উপর মূল্যবোধ আরোপ করাকে একমাত্র উপযোগ মনে করেননি, তাই তো লেখক দেখিয়েছেন প্রতিবেশী সহনামী রঞ্জুর তরুণী বোনের প্রতি ওসমান আসক্ত, মেয়েটির শরীর সে কামনা করে, কিন্তু প্রেম

তার কিশোর রঞ্জুর প্রতি। গণঅভ্যুত্থানে সামরিক শাসকদের নির্যাতন শুরু হলে চিলেকোঠার চার দেওয়াল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মানসে উত্তেজিত হয়ে ওসমান সহনামী রঞ্জুকে চুম্বনে ক্ষত বিক্ষত করে আত্মপ্রেমে পরাজিত হয়ে– এই সব বিচারেই আখতারুজ্জামান ইলিয়াস অন্যান্য লেখক থেকে স্বতন্ত্র্য।

আশির দশকে দেশের স্বৈরতন্ত্রের বিধ্বংসী রাজনীতির প্রবাহে মধ্যবিত্তের প্রতিবাদ ও সংগ্রাম, রাজনৈতিক আদর্শচ্যুতি ও দ্বিধাবিভক্তির মধ্যে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সমাজ ও রাজনীতির সত্য সন্ধানের অন্বেষায় 'চিলে কোঠার সেপাই' উপন্যাস লিখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

খোয়াবনামা

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চেতনা ও সৃষ্টিতে রয়েছে আধুনিক সমাজ চিন্তা ও জীবন জিজ্ঞাসা। সমকালীন মুসলমান মধ্যবিত্তের জাগতিক ও মানসিক চিন্তা চেতনার মধ্যে তিনি গ্রামীণ পরিবেশ, লৌকিক জীবনের চালচিত্র, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের সংস্কার ও বিশ্বাসের চিত্র উদঘাটন করেছেন। সমাজ বিচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং সমাজ সংশ্লিষ্ট কর্ম চেতনা দুই-ই তাঁর 'খোয়াবনামা' উপন্যাসের অনুসঙ্গ হয়েছে।

বাঙালি জাতির অস্তিত্ব সংগ্রামের আবহমান চেতনা উপজীব্য করে জীবনের চলমান রেখা ও সুরের সাথে মিথ। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অনিবার্য সম্পর্ক সূত্র নির্দেশ করে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস 'খোয়াবনামা' (১৯৯৬) উপন্যাস রচনা করেন। বাঙালি জীবনের বিচিত্র পট, মানব অস্তিত্বের সঙ্কট, সামাজিক মানুষের শ্রেণি বিভাজন ও শ্রেণি সংগ্রামের রক্তিম অন্ত:স্রোত এ উপন্যাসের বিষয়বস্তুকে অসাধারণত্ব দান করেছে। বাঙালি জাতির আবহমান অস্তিত্ব সংগ্রামের সাথে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট, তারই ধারবাহিকতায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াস নিপুণ দক্ষতায় তা এ উপন্যাসে রূপদান করেছেন। বিচিত্র ঘটনা, উপঘটনা ও চরিত্রের যে সমাবেশ এ উপন্যাসে আছে–তা কেবল জীবনের বর্হিবাস্তবকেই নয়, সমাজসত্তার অন্তর:স্থ গভীরতর সত্যকেও উন্মোচন করে।

গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ সাহিত্যে তিনি এক স্বল্পগ্রজ লেখক কিন্তু তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে রয়েছে তাঁর গভীর জীবনবোধ। কোন বিষয়কে তিনি সমগ্রতায় দেখে শিল্পীর দায়বদ্ধতায় তাঁর নিজস্ব বিশ্বাসকে তুলে ধরেছেন। তাঁর উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রতে রয়েছে সুগভীর অর্ন্তদৃষ্টি, তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি ও পুঙ্ক্ষানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। তাঁর গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ পাঠ করার পথ মসৃণ নয়। তাঁর গল্প উপন্যাস ভাবতে ভাবতে থেমে থেমে পড়তে হয়। তাঁর চিলে কোঠার সেপাই, খোয়াবনামা উভয় উপন্যাসেই লেখকের দায়বোধেই তিনি জীবন যাপনের মধ্যে মানুষের সমস্ত সত্যটিকে তুলে ধরেছেন। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন উপন্যাসের কাজ বর্তমানের ভেতর। গল্প উপন্যাসে রূপকথা, কেচ্ছা থাকতে পারে, কিন্তু তা থাকে বর্তমানকে তাৎপর্যময় করে তোলার লক্ষ্যে। তাই দুই উপন্যাসেই তিনি স্পষ্টভাষায় বক্তব্য রেখেছেন, তাতে চরিত্রের

স্বত:ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে। মধ্যবিত্ত ব্যক্তির তরল পানসে দুঃখ বেদনার পাঁচালি থেকে তিনি বাংলা উপন্যাসের বাক পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। তাই প্রচলিত ধারার সামাজিক সঙ্কট মুক্তির লেখকেরা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কায়েমি স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রত্যয়কে সহজভাবে গ্রহণ করেননি।

১৮৫৭-র বিপর্যয়ের অব্যবহিত পর থেকে শুরু করে এদেশে হিন্দু মুসলমানের মিলিত জীবনস্রোত, সংঘাত, মুসলমান ভূস্বামীদের উত্থান, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, গ্রামীণ কৃষি সংস্কৃতি এবং অন্ত্যজ শ্রেণির জীবন যাপনের সাথে ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সংযোগ যে কেন্দ্র ও সত্যের দিকে আমাদের চালিত করে তা নি:সন্দেহে বাঙালির স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রেক্ষাপট উন্মোচিত করে। এই বইয়ের ইত:স্তত বিক্ষিপ্ত এই সব কাহিনীর উপস্থাপন বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদের মত পাঠককে উদ্বেলিত করে। এই ধরনের মননশীল উপন্যাস শুধু বাংলাদেশের সাহিত্যে নয় সমগ্র বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে বিরল। দেশ, রাজনীতি ও সমাজের উদাহরণ ও ঘটনার বহুলতা বইটিতে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র।

উপন্যাস সাহিত্যের সবচেয়ে জীবন ঘনিষ্ঠ মাধ্যম। আর তাই এই লেখকের উপন্যাসে সংযোজিত হয়েছে নতুন শতাব্দীর উপযোগী বিষয় ভাবনা ও শিল্পমাত্রা। 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাস থেকে 'খোয়াবনামা' একেবারেই আলাদা মেজাজের। কারণ তিনি নিজের ব্যবহৃত, পরিচিত ও পরিক্ষীত রীতির বাইরে যেতে চাইতেন। তিনি মনে করতেন একই বৃত্তের মধ্যে ঘুরপাক খেলে প্রকৃত শিল্পীসত্তা নষ্ট হয়ে যায়। তাই গল্প উপন্যাসে তিনি সমাজ রূপান্তর ঘটাতে চেয়েছেন।

খোয়াব অর্থ স্বপ্ন। এই রূঢ় বাস্তব সমাজে খোয়াব ছাড়া গত্যন্তর নেই। রূঢ় বাস্তব সমাজে অনেক কিছুই আকাঙ্ক্ষা প্রাপ্তির বাইরে থাকে, বিপন্ন মানুষ তা কল্পনা বা স্বপ্নে পেয়ে আশ্বস্ত হয়। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বলেন– 'স্বপ্নের বিশ্লেষণ ছাড়া স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার আয়োজন নেওয়া যায় না; জিজ্ঞাসা বঞ্চিত স্বপ্ন এক ধরনের ইচ্ছাপূরণ মাত্র। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন– 'স্বপ্ন জিজ্ঞাসার তাগিদেই গল্পকার ঔপন্যাসিক ইলিয়াসকে ঢুকতে হয় বাংলা গল্প উপন্যাসের কন্দরে, সেখানে সঞ্চিত উক্তি উপলব্ধি সব ছেড়ে বেছে দাখিল করতে হয় স্বনির্বাচিত এক সংকলন। যে তাড়নাতে তারাবিবির মরদ পোলা বা চিলেকোঠার সেপাই খোয়াব নামা উপন্যাস লেখেন সে তাড়নাতেই গল্প উপন্যাস নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন তিনি। ইলিয়াসের সাহিত্য চিন্তা সূত্রে ই লিয়াসের

সাহিত্য পড়ায় হয়তো বিপাক আছে, কিন্তু এটুকু অন্তত জোর দিয়ে বলা যায়, তাঁর কথা সাহিত্যে ও প্রবন্ধের পেছনে রয়েছে অভিন্ন রাজনৈতিক অভিনিবেশ। প্রবন্ধে তাই রাগ-ক্ষোভ হাসি-সব নিয়েই ইলিয়াস উপস্থিত গল্প উপন্যাসে যেমন তেমনি এখানে (প্রবন্ধ) তন্ন তন্ন করে দেখেন বাঙালি মধ্যবিত্তকে, জানতে চান ইতিহাসের কোন বাকে কোন উপায়ে সমাজ সংস্কৃতির ভরকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় যে, মধ্যবিত্তের সৃষ্টিতে সচরাচর কোন আদলে কোন গ্রন্থনায় হাজির হয় প্রান্তদেশের লোকজন– কোন রহস্য সে আখ্যানে।'

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোয়াব নামা'য় তেভাগা আন্দোলন এবং ভারত ভাগের ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সংমিশ্রণ ঘটেছে কোন না কোন সূত্রে অতীতের পলাশীর যুদ্ধ, সিপাহী বিদ্রোহ, ফকির বিদ্রোহ প্রভৃতি আন্দোলন। বগুড়ার কাছাকাছি কাৎলাহার ও তার আশেপাশের মানুষদের নিয়ে খোয়াবনামা কাহিনী রূপলাভ করেছে।

কাৎলাহার বিল ও এর পার্শ্ববর্তী গ্রাম গিরির ডাঙ্গা, নিজগিরির ডাঙ্গা ও গোলাবাড়ি হাট প্রভৃতি স্থানের লোকায়ত চেতন অবচেতন অচেতন জগতের সাথে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঘটনা ধারার ক্রমরূপান্তরশীল অধ্যায়ের দ্বন্দ্ব জটিল সংঘাত উপন্যাসটিতে চিত্রিত হয়েছে। স্থানিক পরিচয়ের নিম্নবর্গের অতীত ঐতিহ্য পরিবর্তন হয়ে যায় কম্পানি ও ব্রিটিশের ডান্ডা দেশি সাহেবদের হাতে উঠে আসার পর। ভারত ভাগ হয়ে গঠিত হয় নতুন রাষ্ট্রে পাকিস্তান, দেশীয় শাসকেরা নতুন আইন তৈরি করে। দেশ বিভাগের পরে ঘটে হৃদয় বিদারক মানবিক বিপর্যয়। বগুড়া অঞ্চলের উপভাষার বাধা অতিক্রম করে উপন্যাসের ঘটনার মধ্যে অনুপ্রবেশ করলে বর্ণনাকালীন সময়ের বাস্তবতা যেমন, বিভাগ পরবর্তীকালের উদ্বাস্তু সমস্যা, দেশত্যাগ, মন্বন্তর, দারিদ্র্য, দাঙ্গা ইত্যাদি কথা বস্তুর মধ্যে সমাজ জীবনের দ্বন্দ্ব সংকট ও সংঘর্ষের অন্তর্ময় রূপায়ণ ঘটেছে উপন্যাসটিতে। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানসের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, সংগ্রাম, স্বপ্নভঙ্গ, গ্রামীণজীবন ও শহুরে জীবনের রাজনৈতিক প্রতিঘাত ও পাকিস্তানের সহযোগীদের চরিত্র উন্মোচনে ঔপন্যাসিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ায় দ্বন্দ্বময় বিষয় ভাবনা উপন্যাসটিকে ঋদ্ধ করেছে। তেভাগা প্রসঙ্গের রূপায়ণে ইলা মিত্রের সংগ্রামী জীবনের প্রসঙ্গ অনেকবারই অশিক্ষিত মানুষের কথাবার্তায় উদাহরণ হিসেবে এসেছে। তমিজের বাবা, দাদা পরদাদা, চেরাগ আলী, বাঘার মাঝি কুলসুম, শরাফত মন্ডল, কেরামত, ফুলজান, বৈকুণ্ঠের কাহিনী অন্যদিকে দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক চেতনা, দেশত্যাগ, রিফুউজি আগমন তেভাগা

আন্দোলনের বিবরণ ৫৮ টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে। জাতির সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সমস্যা এবং সমস্যার আবর্তে ঘূর্ণিত ক্ষত বিক্ষত ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনের অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ জীবনের বিন্যাসে খোয়াবনামা একটি বিশিষ্ট উপন্যাস।

ভারত ভাগ হয়ে গঠিত হয় নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান, দেশ বিভাগের ফলে হিন্দু মুসলমানের সহাবস্থান চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। গৃহহীন ও বাস্তচ্যুত দেড়কোটি মানুষ নতুন দুটি দেশে দুই দেশ থেকে অভিপ্রয়াণ করে। কেউ কেউ করে পারস্পরিক গৃহ বিনিময়, উদ্বাস্তু হয় বহু মানুষ। কেউ হয় নগরবাসী, কেউ হয় কন্টাক্টর। আবার নিজ দেশে পরবাসী হয় কোটি কোটি মানুষ। হিন্দু জমিদার নায়েব চলে যাওয়ার পরও স্বাধীন পাকিস্তানে জমি আর বিলের মানুষ নিজেদের মাটির পত্তন ফিরে পায় না। গতানুগতিক ধারার ব্যতিক্রম তাঁর উপন্যাস দু'টি। দ্বিতীয় উপন্যাসটির নাম রেখেছেন বিদেশি ভাষায়। প্রথম নাগরিক জীবনের নিম্ন ও নিম্নবিত্ত মানুষের দ্বিধা, সংকোচ ও সংগ্রাম নিয়ে লেখা আর দ্বিতীয়টি দীর্ঘকাহিনী অবলম্বনে গ্রামীণ জীবনের আখ্যান।

কথা শিল্পী হিসেবে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর জীবনকালেই বাংলা সাহিত্যে এক মর্যাদার আসন করে নিয়েছিলেন। উপলব্ধির সততা, বাস্তবতা ও মৃত্তিকাস্পর্শী জীবন চেতনায় সমৃদ্ধ ঔপন্যাসিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। 'খোয়াবনামা' উপন্যাসে লেখক জীবনবোধের নতুন প্রান্তে উপনীত হয়েছেন। দারিদ্র্যপীড়িত কুসংস্কারচ্ছন্ন মানুষের জীবনের সংকট ও সংগ্রামকে তিনি রূপায়ণ করেছেন এ উপন্যাসে। ইতিহাসের প্রভাব জড়িয়ে রয়েছে-এর অবয়বে। বিষয় ও রচনা রীতির দিক থেকে খোয়াবনামা উপন্যাসের এক অনন্য মর্যাদা রয়েছে বাংলা সাহিত্যে।

খোয়াবনামার কাহিনীর পটভূমি সমকালের তমিজের পাঁচ পুরুষ আগের। সে অনেক অনেকদিন আগের কথা। তমিজের পাঁচপুরুষের আগের প্রজন্ম ঘন জঙ্গল সাফ করে নতুন মাটি ফেলা ভিটায় বসবাস করে বাঘার মাঝি। কাৎলাহার বিলের সাফ করা জঙ্গলে সোভন ধুমা চাষাবাদ শুরু করে বাঘের ঘাড়ে লাঙ্গল চাপিয়ে। ওইসব দিনের এক বিকেল বেলা মজনুশাহের অগণিত ফকিরের সাথে মহাস্থান গড়ের দিকে যাওয়ার সময় করতোয়ার বাদিকে মুনশি বয়তুল্লাশাহ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেপাই টেলরের গুলিতে মারা পড়ে। কাৎলাহার বিলের দুই ধারের মানুষের বিশ্বাস বিলের উত্তরে পাকুড় গাছে আসন নিয়ে রাতভর বিল শাসন করে মুনশি। অন্ধ বিশ্বাসে বিলের দুই ধারের মানুষ জানে দিনের বেলা সেই অশরীরী মুনশি রোদের মধ্যে রোদ হয়ে ছড়িয়ে

থাকে আর রাতভর পাকুড় গাছের মাথায় থেকে বিল শাসন করে। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে অনেক গাছের সাথে পাকুড় গাছও কাটা পড়ে, উন্নয়নের ধারায় ইটখোলা প্রতিষ্ঠিত হয়, বন জঙ্গল পরিষ্কার করে যেভাবে জনবসতি গড়ে ওঠে, তাতে তমিজের বাবা-শ্রেণির মানুষেরা শঙ্কিত, মৃত্যুর পর তারা কোন গাছে ঠাঁই পাবে?

কাৎলাহার বিল শুকিয়ে যায়। শুকনো জমিতে চাষাবাদ হয়, আবাদি জমির ধার ঘেষে মানুষ ঘর তোলে। বিলের পশ্চিম তীরের খালি জায়গার পর মাঝিপাড়া। বিলের মালিকানা জমিদারের হাতে চলে যাওয়ার পর জেলে পাড়ার পাঁচ ছয় ভাগ মানুষই হয়ে পড়ে চাষা। অয়েল মিল স্থাপিত হওয়ায় গ্রামের অর্ধেকের বেশি কলুরা চলে যায় পুবদিকে যমুনার তীরে, নিজ পেশা বাধ্য হয়ে ছেড়ে এরাও চাষা হয়ে যায়। তারপর লেখকের চাষাবাদের গ্রামের বে-আব্রু বর্ণনা– এ ভাবে খোয়াবনামা'র শুরু।

কাৎলাহার বিলের দুই পাড়ের দুই গ্রাম রাতের অন্ধকারে এই বিলের মধ্যে একাকার হয়ে যায়। প্রকৃতির বিভিন্ন উপমায় দুর্ভিক্ষের অথবা দুর্ভিক্ষের বর্ণনায় প্রকৃতির প্রসঙ্গে লেখক প্রকৃতি ও দুর্ভিক্ষকে উপস্থাপন করেছেন। এ রকম উপমার মাঝখানে দাঁড় করানো হয় মুনশি বয়তুল্লাহ শাহকে।

বিলের মালিকানা জমিদারের হাতে চলে গেলে, চাষী জমি হারিয়ে, মাঝিরা বিলের মাছধরা থেকে বঞ্চিত হয়ে কামলা খাটে। অলৌকিকতায় বিশ্বাসী মানুষের ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজের কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লেখক ঘটনা প্রসঙ্গে বলেছেন। আকালে এক শ্রেণির মানুষের কৌশলী কারসাজিতে কামারদের জমির মালিকানার হস্তান্তর ঘটে। সামন্ত প্রভুদের যোগসাজশে গ্রামে শরাফত মন্ডল প্রভূত জমির মালিক বনে যায়। জমির বঞ্চিত মালিকেরা জীবিকার সন্ধানে গ্রামছাড়া হয়ে শহরে শ্রমজীবী হয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। এভাবে গ্রামীণ অর্থনীতির পরিবর্তন ঘটে।

দশ বারো বছর আগেও গিরিবডাঙ্গা গ্রামের দিনমজুরদের গ্রামের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন পড়েনি; গ্রামের জোতদারের ধান কেটেই জীবিকা নির্বাহ হতো, এই কয় বছরে গ্রামের মানুষের অবস্থা নি:স্ব কসিমুদ্দিনের মতো। দুর্ভিক্ষে মানুষ মরেছে, দেশান্তরী হয়েছে, জমি বিক্রি করে করে কৃষকেরা ভূমিহীন নি:স্ব হয়ে গেছে। চারদিকে কাজের জন্য হাহাকার। তাই তমিজকে গ্রাম ছেড়ে কাজের সন্ধানে যেতে হয়েছে খিয়ারে। এই জীবিকার জন্যই গ্রাম ছেড়ে কাজের সন্ধানে যেয়ে গ্রামের মানুষকে বিয়ে থা করে অন্যত্র সংসার পেতে ঘরজামাই হয়ে দাসত্বের জীবন যাপন করতে হয়। আবার এই গ্রামেই

যখন কাৎলাহার বিল শরাফত মন্ডলের হাতে চলে যায় তখন তাদের বর্গাচাষের সুযোগ আসে। দুর্মূল্যের দিনে কেরোসিন তেল বেচাকেনা করে, ইটের ভাটা দিয়ে শরাফত মন্ডল ধনাঢ্য হয়ে ওঠেন।

বর্ণনার অতিকথনে, আঞ্চলিক শব্দচয়নের বহ্বাড়ম্বতায় লেখক অতি আধুনিকতার ছাপ রাখতে মাঝে মাঝেই একবৃত্তে ঘুরেছেন। তমিজের বাবা ও তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কুলসুমের ঘরকান্নায় উঠে এসেছে দুর্ভিক্ষ তাড়িত আর্থিক বিপর্যস্ত সমাজের কথা, তমিজের খিয়ারে যেয়ে মজুর খাটার প্রসঙ্গে লেখক উপস্থাপন করেন বর্গাচাষীদের আন্দোলনের কথা। 'উত্তর থেকে পশ্চিমে থেকে নতুন নতুন ঢেউ আসছে, বর্গাদাররা সব ধান নিজেদের ঘরে তোলার জন্য একজোট হচ্ছে।' –এই সামাজিক প্লটের উপর লেখক রাজনীতি এনে ব্যক্তির স্বরূপ সন্ধানে তৎপর হয়ে চারপাশের জীবন ও সামাজিক প্রেক্ষাপটকে গুরুত্ব দিয়েছেন। সচেতন লেখক যুদ্ধকালীন অবস্থার বর্ণনায় মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, সুবিধাভোগী শহুরে মানুষের কথা বলেছেন, তারা চারআনা জিনিসের দাম নেয় দশ আনা, কুকুরের মাংসকে খাশির মাংস বলে চালায়– শহুরে জীবনের চালচিত্রে রয়েছে নারীর প্রতি তাঁর তীব্র কটাক্ষ। অবস্থার বিপাকে পড়া নষ্ট চরিত্রের নারীদের তিনি এঁকেছেন আঞ্চলিক ভাষায়। জাত-পাত নিয়েও গালমন্দ কম চলে না তাদের সমাজে। মাঝি, চাষা, কলু, হানাফি, মোহাম্মদী বিভেদ হিন্দু সমাজের বর্ণভেদ প্রথার মত মুসলমান সমাজেও জাতিগত অনৈক্য যে পার্থক্য সৃষ্টি করে তা কালাম মাঝি, গফুর শেখ এদের আচরণ ও কথাবার্তায় প্রকাশ পেয়েছে। কলুর স্পর্শ থেকে দূরে থাকার হুমকি কালাম মাঝির কণ্ঠে, মাঝিদেরকেও গালমন্দ শুনতে হয় চাষাদের কাছে কথায় কথায়। জাতিগত বিদ্বেষে গফুর কলু ও আবিতনের বিয়ের জন্য তাদের একঘরে করে রাখা হয়। আবার পাকিস্তান প্রশ্নে কোন ভেদাভেদকে দূরে রেখে তারা এক হয়েছে। সাম্প্রদায়িক শক্তি তখন তাদের কাছে মুখ্য হয়। প্রজন্মান্তরে এই মুসলমান সমাজ শিক্ষা গ্রহণকে প্রাধান্য দিয়ে জাতিগত বিভেদ দূর করতে চায়। শিক্ষা তথা উঠতি চাকুরিজীবীর প্রতি মোহ নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করে। ভোটের স্বার্থে কেউ সমাজে বিরোধিতা করতে চায় না, আবার ভোটের স্বার্থেই গফুরকে গিরিডাঙ্গা গ্রামে লীগের কাজ থেকে বিরত রাখতেও ইসমাইল বাধ্য হয়েছে।

গিরির ডাঙ্গা, গোলাবাড়ির হাটের মানুষেরা মহাজনী সুদের টাকা গুণতে গুণতে নিঃস্ব হয়েছে। জমি বর্গা নিতে তাদের অনেক কৌশল করতে হয়। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের নিরাবেগ বাস্তব জ্ঞান এক মধ্যবিত্ত মানস। সময়

ও সমাজের অন্তরঙ্গ ও বহির্সত্য প্রত্যক্ষ করে নতুন মাত্রায় তা রূপায়ণ করেছেন। বৈকুণ্ঠের মারফতি ও কীর্তন গান, বাবুর আড়তে জিরার ভেজালে শটিবীজ কোন কিছুই তার অভিজ্ঞতা থেকে বাদ পড়েনি। একটি সময় পরিধির সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সমগ্রতা সৃষ্টির প্রয়োজনে নগর ও গ্রামের জীবন প্রবাহকে অখণ্ড তাৎপর্যে রূপায়িত করেছেন ঔপন্যাসিক।

কয়েক পুরুষধরে তমিজেরা বর্গা চাষী হলেও এই ঔপনিবেশিক যুগের প্রজন্ম শরাফত মন্ডলের ছেলে সাব রেজিস্ট্রি অফিসের কেরানি আব্দুল আজিজ, গরু, লাঙল, জোয়াল, মই বীজ-ধানের দামের আধাআধি আগাম দাবি করে কারণ জোতদারদের মতে চাষাদের বাড়াবাড়ি সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গেছে, খিয়ার এলাকার চাষারা ফসলের দুই ভাগ চায়। মালিকের গোলায় দেবে এক ভাগ। তাদের আশঙ্কা শহর ছেড়ে গ্রামেও এই চাহিদা ছড়িয়ে পড়তে পারে। আবদুল কাদের পাকিস্তান আন্দোলনের সপক্ষে কাজ করতে হিন্দুদের বিপক্ষে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করে মুসলিমলীগের পতাকার নিচে গ্রামের মানুষকে জমায়েত হতে বলে। সে বিশ্বাস করে হিন্দু জমিদার আর হিন্দু মহাজনের হাত থেকে বাঁচার জন্যই লীগের পাকিস্তানের জন্য লড়াই। কাদেরের ধারণার মধ্যে পাকিস্তানীপন্থীদের ধারণা রূপ পায়– 'হিন্দু মুসলমান চাষার রক্ত চুষে শেষ করে ফেললো। ... হিন্দু জমিদার ফুটানি মারে মুসলমান প্রজার রক্ত চুষে। পাকিস্তান না হলে মুসলমানের জানমাল ইজ্জত সব বিপন্ন।' পাকিস্তানের স্বার্থেই আবদুল কাদের মাঝি আর কৃষকদের মধ্যে ভেদাভেদ তুলে দিতে চায়, তার দরকার কর্মী। জিন্না টুপি মাথায় দিয়ে কাদের প্রমুখেরা হিন্দু নায়েবের সমীহ আদায় করতে চায়। তেভাগা আন্দোলন ঠেকাতে জোতদাররা পুলিশের সাথে যোগসাজস করে।

বাঘার মাঝির বাপ বুধা মাঝির দাদা না পরদাদা, নাকি তারাও দাদা সোভান ধুমা। তমিজের পূর্ব পুরুষ। সোভানের বাপ আসার আগে এ তল্লাট জুড়ে ছিল জঙ্গল আর জঙ্গল। বাঘ, ভাল্লুক, সাপ শুকর বেষ্টিত জঙ্গল কেটে সোভান ধুমা বসতি স্থাপন করে। কৃষিকাজ দিয়েই এদের জীবিকা শুরু। এই শক্তিমান পুরুষ বাঘের ঘাড়ে জোয়াল চাপিয়ে লাঙ্গল টানত। তারপর তার তিন পুরুষ পরে ভূমিকম্প হয়ে যমুনা নদীর গতি বদলে যায়। যমুনার প্রমত্ততায় জল স্রোত বাঙালি নদী থেকে ঢুকে পড়ে কাৎলাহার বিলে, বন্যায় ভেঙ্গে পড়ে কাৎলাহারের তীর। গিবির ডাঙ্গার জঙ্গল কেটে বসত করা মানুষ কাৎলাহারের পানি পান করে। পাকুড় গাছের মুনশির ইশারায় সোভান ধুমার বংশ হয়ে যায়

মাঝি। এইসব অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস নিয়ে গিরিডাঙ্গার এক অংশের মানুষের বসবাস ও জীবনযাপন।

বৃটিশ রাজত্বকাল এই খোয়াব নামার পটভূমি। বৃটিশ তাড়ানো এবং বৃটিশ পক্ষের দুই শক্তির কথাই আছে উপন্যাসে। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু হলেও দেশ জমিদারদের আইনেই চলে।

জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পর জমিদারেরা এদেশ ত্যাগ করে কলকাতায় ব্যবসা করে, জমিদারি থেকে টাকা সরানো ছাড়া জমিদারিতে তাদের আর কোন আগ্রহ থাকে না। জমিদারদের এ হেন অনীহায় শরাফত মন্ডলের মত মানুষেরা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। শরাফত মন্ডল নায়েবকে হাত করে মোষের দীঘির পত্তন নেয়। দেশত্যাগী হিন্দুদের জমি কিনে ও জমিদারের জমি পত্তন নিয়ে সে প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠে। নায়েবের অসৌজন্যমূলক ব্যবহার সে গা করে না মোষের দীঘির পুবের জমিটা পত্তন নেয়ার জন্য। কারণ জমিদারের কোপে পড়লে কাৎলাহারের এপাড় ওপাড় জুড়ে বিস্তীর্ণ ক্ষেত জমি হাত করার সাধ তার কখনো মিটবে না। তাই নায়েবকে সে চটাতে চায় না। যে নায়েবেরা জমিদারি প্রথা বিলোপের আগে মুসলমান প্রজাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে তাদের নামের বিকৃত করে হেয় করতো। অনেক ক্ষয়-খরচা করে নায়েবকে হাত করে কাৎলাহার বিল একরকম তার নিজের সম্পত্তি হয়েছে। এই শরাফত মন্ডলের আসল শাকিন নিজগিরিডাঙ্গা গ্রামে। কাৎলাহার বিল ভরাট হতে শুরু হওয়ার অনেক আগেই শরিকদের সাথে গোলমাল করে এপারে এসে ঘর তোলে তার বাবা। দুর্মূল্যের দিনে কেরোসিন তেল বেচাকেনা করে ও ইটের ভাটা দিয়ে প্রভূত অর্থের মালিক হয় সে। উঠতি এই ধনাঢ্য শরাফত মন্ডলের স্বার্থের চক্রান্তে সমাজের এক শ্রেণির মানুষের জীবিকার মাধ্যম হয় কাৎলাহার বিল। সে বিলও ধানী জমিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে বলে তমিজের বাপের উৎকণ্ঠা শয়নে-স্বপনে, কেননা এই বিলই তার ক্ষুধার অন্ন জোগায়।

উপন্যাসে লেখক স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রসঙ্গে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কথা বলেছেন। গ্রামের মানুষের চেতনায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহ গল্পের মত করে জানা থাকলেও এই ঐতিহাসিক সত্যকে লেখক বাস্তব অভিজ্ঞতায় জানিয়েছেন। সন্ন্যাসীদের হাতে কোম্পানির গোরা সেপাইদের মৃত্যু যেমন হয়েছে তেমনি আধুনিক অস্ত্রধারী গোরা সৈন্যদের হাতেও সন্ন্যাসীদের মৃত্যু ঘটেছে। ভবানী পাঠকের হুকুমে কোম্পানির সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ হয়, কোম্পানির কামানের গোলায় ভবানী পাঠকের মৃত্যু হয়। মজনু শাহের দাপট এ অঞ্চলে কম ছিল না, তাদের মিলিত শক্তি কোম্পানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কাহিনীর বৈকুণ্ঠ

ভবানী পাঠকের বংশধর এবং তাঁর সাথে যোগসূত্র আছে বলে বৈকুণ্ঠ গর্ব করে। অজ্ঞতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতায় গ্রামবাসিরা ইতিহাসকে সঠিকভাবে বিকৃত করে জানে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের রূপায়ণে তাদের সেই বিকৃত ধারণাকে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন। কেননা অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ের চিত্তবদ্ধতা থেকে তিনি জাতির মুক্তির প্রত্যাশী ছিলেন।

সমাজের বাস্তবতাই আধুনিক সাহিত্যের ভিত্তি, তাই কাদের যে হরেন ডাক্তারকে বাদ দিয়ে নতুন মুসলমান ডাক্তারের পক্ষ নেয়, তাতে তার যুক্তি- 'একটা মুসলমান ছেলে নতুন প্র্যাকটিস করতে বসেছে, কোয়ালিফায়েড ছেলে, তাকে হেল্প না করলে কি চলে'- এই যুক্তির মধ্যে জাতিগত সত্তার সাথে আধুনিক মনষ্কতাও আছে। এই জাতিগত সত্তা এদেশে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবী জোরদার করেছিল। তাদের মতে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে ইসলামের ইজ্জত হয়, মুসলমানের মাথাটা উঁচু হয়। ইসলামের আলোকে নানা সমস্যার সমাধান ও ইসলামের কথা বলে এরা পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েমের দাবি করে। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য অনেকেই কৃষক প্রজালীগ বাদ দিয়ে মুসলিম লীগে যোগদান করে। মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের চিন্তা চেতনার একটা স্বচ্ছ ধারণা লেখক তুলে ধরেছেন। তাই কোথাও কোথাও সামাজিকতার চেয়ে রাজনীতিও উপন্যাসে মুখ্য মনে হয়।

বর্গাচাষীদের সবাই মুসলিমলীগের কর্মী, এই চাষীরাই আবার তেভাগা আন্দোলনের স্বপক্ষের শক্তি- যারা নিজেরাই ধান মেপে একভাগ দিতে চায় জোতদারকে আর দুই ভাগ নিজেদের দাবী করে। তাই শহুরে মুসলিম নেতাদের ভয়- এরা নিজেরা জোতদারদের পাওনা দেয় না, এমনকি কমুনিস্টদের সাথে মিশে সব ধান নিজ নিজ ঘরে তোলার জন্য নিরীহ গ্রামবাসীকে উস্কানি দিচ্ছে ফলে পাকিস্তান ইস্যু মার খাচ্ছে। রাজনীতির স্বার্থে তারা বর্গাচাষীদের বিরোধীতা করে। সাঁওতাল-মুসলমান আধিয়ররা একজোট হয়েছে বলে তারা শঙ্কিত।

কৃষিভিত্তিক জীবনের চালচিত্রে লেখক কৃষকদের ও বর্গাচাষীদের জীবনবৃত্তান্ত দক্ষতার সাথে চিত্রায়ণ করেছেন। সাথে পারিবারিক জীবনকেও রূপ দিয়েছেন। ধান উৎপাদনের সমৃদ্ধতম বগুড়া অঞ্চলকে পটভূমি করে, তেভাগা আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি নাচোল, জয়পুরহাট, দিনাজপুর, নবাবগঞ্জকে ঔপন্যাসিক গল্পের উপজীব্য করে কৃষিভিত্তিক জীবনযাত্রার আলেখ্য উপস্থাপন করতে ধান কাটা, ধানমাড়াই ইত্যাদি বিষয়ের খুঁটি নাটি উল্লেখ করেছেন,

এতে কৃষি ভিত্তিক জীবনযাত্রার সাথে তাঁর সম্পৃক্ততার পরিচয় মেলে। প্রসঙ্গান্তরে কামার, মাঝিদের কথায় জাতিভেদ প্রসঙ্গে বলেছেন। বিশ শতকের মাঝামাঝিতে যারা স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রত্যাশা করে নিজ আবাসভূমি হিসেবে পাকিস্তান রাষ্ট্র চায় তখনো সে সমাজের মানুষ কুসংস্কারাচ্ছন্ন– তারা পীর সাহেবের পানি পড়া ও ঝাড়ফুঁকে বিশ্বাস করে, মাজারে সিন্নি মানত করে, তখনো তারা বিশ্বাস করে চেরাগ আলির মাধ্যমে পাকুড় গাছে সরাসরি যোগাযোগের কথা, কুলসুমের ঘরে তমিজের বাপের 'রুহ' আসা, তার সাথে কথা বলা...। পাকুড় গাছের মুনশি চেরাগ আলির অবর্তমানে তমিজের বাপের উপর তাদের দারুণ বিশ্বাস, আপদে বিপদে তমিজের বাপ তাদের আশ্রয়। গ্রামে গ্রামে মাঝি চাষাদের মধ্যে সম্প্রদায়গত বিভেদ আছে, তেমনি শিয়া-সুন্নী-হানাফি-মোহাম্মদী কাদিয়ানী-র ধর্মগত বিভেদও আছে। এই বিভেদ জাতিগত অনৈক্য সৃষ্টি করে রাখে সমাজে, খাওয়া ছোয়ার বাছ বিচারও সমাজে কম ছিল না।

জোতদার তালকুদার জমিদাররা সম্পত্তি দখলে রাখার জন্য আত্মীয়দের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে। তেভাগার প্রতিক্রিয়া তাদের কাছে মৃত্যুর শামিল। কমিউনিস্টদের সাথে অর্থাৎ যারা তেভাগা আন্দোলনের উদগাতা, তাদের সাথে দলীয় স্বার্থেই মুসলিমলীগারদের বিরোধ, তেভাগা আন্দোলনের লড়াইকে তারা আল্লার বিরুদ্ধে লড়াই বলে মনে করেছে। অনেক মিটিং করেও তারা তেভাগা আন্দোলনকারীদের পাকিস্তানের ইডিওলজিতে বিশ্বাস করাতে পারেনি। মুসলমান মেজরিটি চাষীদের জন্যে তারা কম্পলসারি ফ্রি প্রাইমারি এডুকেশন, হাটে এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন বিক্রির সময় টোল বন্ধের দাবি করে। ধন সম্পদ, জোতজমি, তাদের মান সম্মান– যে ভাবে হোক রক্ষা করা চাই-ই। মুসলিমলীগ কর্মীরা নেতৃত্ব চায়, যাতে ইলেকশনের আগ পর্যন্ত তারা তেভাগা আন্দোলন থেকে দূরে থাকে। বেশিরভাগ জমিদারই মুসলিমলীগের পক্ষে, আর তাদের জমির উপর যদি এই তরুণকর্মীরা আন্দোলন করে তবে মুসলিমলীগের জয়ের সম্ভাবনা কম। সমাজের এই বাস্তবতাকে ঔপন্যাসিক খোয়াবনামা-র কাহিনী প্রসঙ্গে উপস্থাপন করেছেন।

ইংরেজ শাসকের এ দেশীয় কর্মচারিরা নিজেদের স্বার্থে বৃটিশদের কার্যকলাপ সমর্থন করে– 'চাষাদের উৎপাত বন্ধ করতে পুলিশকে একটু গা ছাড়া তো দিতেই হয়। উত্তরে আর পশ্চিমে কিছু মানুষ তো মারতেই হয়েছে... তা নিয়ে এত হৈ চৈ করার কী আছে?' –এভাবে আবদুল কাদেরের প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তান-পন্থীদের মানসিকতার স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে, আবদুল

কাদের ঐ শ্রেণির প্রতিনিধি। হিন্দু জমিদাররাই কৃষকদের শোষণ করে আসছে বৃটিশ শাসনের শুরু থেকে, সিরাজদ্দৌলার পতনের পর থেকে ব্রিটিশের গোলামি করে তারাই মুসলমানদের অর্থ সম্পদ, মান ইজ্জত রক্ষায় বাধা দিয়ে আসছে, মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য হিন্দুরাই দায়ী– এসব বলে পাকিস্তানের পক্ষে ইসমাইল জনমত গঠন করার উদ্যোগী হয়। ঠাকুরগাঁ, নাটোর, নাচোল, হিলির দিকের চাষীদের পুলিশ মার দিলেও চাষাদের জোট ভাঙেনি, তার বিশ্বাস ওদিকে তেভাগা হবেই। মুসলমান কৃষকের উপর হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের জুলুমের কথা বলে নেতৃস্থানীয় খান বাহাদুর মুসলিমলীগের পক্ষে ভোটের প্রচারণা চালায়। গল্প উপন্যাস যে সমাজ বাস্তবতা ও ইতিহাসকে বাদ দিয়ে রচিত হতে পারে না, খোয়াবনামা তার প্রমাণ। ইতিহাসের তথ্য নিয়ে তিনি কাহিনী রূপায়ণ ও চরিত্র সৃষ্টি করেছেন।

দুর্ভিক্ষের সময় হিন্দু মুসলমানের মিলিত তৎপরতার কথা লেখক ইসমাইলের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। স্বতন্ত্রপথ থেকে সমন্বয়ের দিকেই লেখকের প্রবণতা বেশি– এসব ঘটনার উল্লেখে তার পরিচয় পাওয়া যায়। কবি কেরামতের গানে তেভাগা আন্দোলনের সুর ও কথা ঔপন্যাসিকের নিজের। চাষীদের পক্ষে তাঁর সমর্থন বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করিয়ে তেভাগা আন্দোলনের সপক্ষে লেখক তাঁর আত্মসমর্থন জানিয়েছেন।

'যাহার হাতে লাঙল, ফলায় ফসল অন্ন নাই তার পাতে, জমির পর্চা লইয়া জোতদার থাকে দুধে ভাতে।' এই গানের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে দুঃস্থ চাষাদের জীবন। এই গানের মধ্য দিয়েই তেভাগা আন্দোলনের সমর্থক ইসমাইল তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার পথ পায়– 'জমিদারদের হাত থেকে, জোতদারদের হাত থেকে মুসলমান প্রজাদের বাঁচাবার জন্যই ভারতের দশকোটি মুসলমানের নেতা কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিমলীগ আজ পাকিস্তান হাসেলের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অল-ইন্ডিয়া মুসলিমলীগ আর কৃষক প্রজা পার্টির ভোটে মুসলমানের মধ্যে একতা সৃষ্টির লক্ষ্যে লীগের কর্মীদের তৎপরতা লক্ষণীয় কিন্তু ক্ষুদ্র সম্প্রদায় স্বার্থ তাদের মধ্যে বিরোধ জিইয়ে রাখে।

বিল ডাকাতির মামলায় মাঝিদের নিজেদের পক্ষে টানার জন্য তরুণ লীগ কর্মীর বক্তব্য– 'নবাব নাইটদের মুসলিম লীগ আর নেই। চাষী জেলে আর মজুরের হক আদায় হবে পাকিস্তানে।' ছেলেটি এরপর বলে চাকরির কথা– পাকিস্তানে মুসলমানের চাকুরির কোন অসুবিধা হবে না। তার কথায় পাকিস্তানের স্বপক্ষে রাজনীতির স্পষ্ট চেহারা ফুটে উঠেছে। লীগের অনুপ্রাণিত

কর্মীর কথার বিপক্ষে বুড়ো তালুকদারের কথায় বিপক্ষ পাকিস্তানিদের মনোভাব লিখে লেখক পাকিস্তান আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন।

মধ্যবিত্ত তরুণ সমাজে ধীরে ধীরে মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে, সমাজে গোড়ামি ছেড়ে তারা নতুন প্রগতিশীল দেশের স্বপ্ন দেখে। নিজের স্বার্থের জন্য এক শ্রেণির গোড়া মুসলমান মোল্লাদের সমালোচনা করে– 'মোল্লারা ইসলামের নামে মুসলমানদের ব্যাকওয়ার্ড করে রাখতে চায়, তাদের গোড়ামির জন্যই মুসলমানদের আজ এই অবস্থা' ভোটের স্বার্থে এরকম কথা হলেও তরুণদের চিন্তা চেতনায় এই উপলব্ধিই যে সত্য, বিশ শতকের নবজাগরণের চেতনা যে তাদের আলোকিত করেছিল এই ঐতিহাসিক সত্যটিকেও লেখক এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন। এ সব তথ্যে লেখকের সচেতন রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রকাশ– '... এই সব মোল্লা মওলানাদের হাত থেকে ইসলামকে, মুসলমানকে বাঁচাতেই আমরা পাকিস্তান চাই।' এ কথাটি শুধু লীগের কর্মীর নয়, লেখকের মত সচেতন মুসলিম নাগরিক সমাজের।

দেশভাগের আগে হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিস্তারিত বর্ণনাতেও তিনি ইতিহাসকে ধারণ করেছেন। ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধ শিল্পী দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাকে অবলম্বন উপন্যাসটিকে মহাকাব্যিক রূপ দিয়েছেন। ঔপন্যাসিকের চিন্তা চেতনা ও বিবেক তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মধ্য উন্মোচিত হয়েছে এ উপন্যাসে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ব্যক্তিমানস সময় এবং সমাজ জীবনকে সূক্ষ্মভাবে অবলোকন করে উপন্যাসের ঘটনা প্রবাহ নির্মাণ করেছেন। গল্পের অজয় দত্ত-র বক্তব্য লেখকের ব্যক্তি মানসের প্রতিক্রিয়া–

'হিন্দু মুসলমান চাষীরা এক সাথে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছে জমিদার জোতদারদের বিরুদ্ধে। আমরা কম্যুনিস্ট পার্টি হিন্দু মুসলমান চাষীদের সঙ্গে তেভাগা আদায়ের জন্য আজো লড়াই করে চলেছি। এখন আমরা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ আর তাদের তল্পিবাহক জমিদার ও জোতদারদের সঙ্গে লড়াই না করে লেগে পড়েছি নিজেদের ভাইদের সঙ্গে দাঙ্গা হাঙ্গামায়। নিজেদের এই সর্বনাশ করার উন্মাদনা থেকে আমাদের বিরত থাকতেই হবে। ভাইয়ে ভাইয়ে দাঙ্গা বন্ধ করতে আমরা যে কোনো দলের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত তাই রাজনৈতিক মত পার্থক্যও সত্ত্বেও আমরা আজ এসেছি ইসমাইল হোসেনের সঙ্গে...আমরা ভাইয়ে ভাইয়ে সংঘাত বন্ধ করতে চাই।'– লেখকের এই বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তাশীল উপলব্ধি আজকের প্রজন্মের জন্যও প্রয়োজন।

রাজনৈতিক মত পার্থক্য থাকবেই, কিন্তু দেশের স্বার্থকে দলমত নির্বিশেষ প্রাধান্য দিতে হবে– লেখকের এই রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আত্ম উজ্জীবনের অন্ত:প্রবাহী চেতনা স্রোত 'খোয়াবনামা'র মৌল চেতনা। মহাত্মা গান্ধী ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কাছে গল্পের অজয়ের আবেদন– 'আপনারা সাম্প্রদায়িক হানাহানি বন্ধ করতো ঐক্যবদ্ধ হোন। হিন্দু মুসলমান হানাহানি বন্ধ হোক, এজন্য লেখক একটা সময় পরিধির সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের জীবন প্রবাহকে তাৎপর্যময় করে রূপায়িত করেছেন, সেখানে তাঁর বোধ জাগ্রত ছিল অনুক্ষণ।

সাধারণ মানুষের একাত্মতাকে সমাজের তথাকথিত শিক্ষিত উঁচু শ্রেণির মানুষেরা উসকে দিয়ে সম্প্রদায়গত বিভেদ জিইয়ে রেখেছে। তরুণ সমাজ যখন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চেষ্টা করেছেন সেই সময় স্বার্থান্বেষী মহল 'সুবাবর্দি নিজের হাতে পিস্তল দিয়ে হিন্দু মারলো, মীনা পেশোয়ারিকে দিয়ে কতো কতো হিন্দুর প্রাণ নিলো–' ইত্যাদি বলে আগুনে ঘি ঢেলে দিয়েছেন বিভাগপূর্ব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এপার বাংলা ওপার বাংলার মানুষকে কীভাবে নিষ্পেষিত করেছিল তার ঐতিহাসিক সত্যতাকে লেখক ধারণ করেছেন। দেশভাগের পর ওপার বাংলা থেকে মুসলমানেরা এদেশে আসে, সেই বাস্তুহীন রিফিউজিতে শহর ভরে যায়। হিন্দুরাও দেশান্তরী হয়, কেউ বাড়ি বিক্রি করে, কেউ বাড়ি বদল করে। এই সত্য সাহিত্যে মধ্যে বিবৃত হয়ে ইতিহাসকে রক্ষা করেছে।

অবিভক্ত বাংলার জন্য বঙ্গভঙ্গ নিরোধ আন্দোলন যেমন তীব্র হয়েছিল আবার বিভক্ত বাংলার পক্ষে এক শ্রেণির মানুষ মত দিয়েছেন–'দে বিলং টু এ ডিফারেন্ট কালচারাল লেবেল–' বলে ধর্ম পার্থক্যের চেয়ে সাংস্কৃতিক পার্থক্যকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কল্যাণে অর্জিত শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে তারা নিম্নবর্গের ধর্মান্তরিত মানুষকে নিয়ে বসবাসের মত আত্মঘাতী হওয়ার শামিল মনে করেছে। অবিভক্ত বাংলাকে তারা উত্তরাধিকারিদের প্রতি ক্ষমার অযোগ্য অন্যায় বলে তা বাস্তবায়নের পক্ষে থেকেছে কারণ তাদের মতে 'ইউনাইটেড সভেরিন বেঙ্গল মানেই মুসলমানের পার্লামেন্টে মেজরিটি মেনে নেওয়া,' আর তার ডিমেরিটস যে কত তা নিয়েও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেনি। এই উচু শ্রেণির নায়েব মোক্তাররা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সব হিন্দু মিলিত হওয়ার কথা বলেছে। অন্যদিকে কেষ্টপালদের মত সাধারণ মানুষ হিন্দু মুসলমানের মিলিত শক্তিতে বিশ্বাস করে। কামার পাড়ায় আগুন লাগানোর কারণে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল তাতে বৈকুণ্ঠ আফসারকে সতর্ক

করে দেয়। তাদের সম্প্রদায়গত আত্মবিশ্বাস এতটাই দৃঢ় যে গল্পের মধ্যে ইতিহাস ঢুকিয়ে দেয় এবং বলে ফকির মজনু শাহ ও ভবানী সন্ন্যাসী 'এই দুইজন যুদ্ধ করিছে কোম্পানির গোরা সেপাইদের সাথে।' তাই কেষ্টপাল, বৈকুণ্ঠের বিশ্বাস পাকুড় গাছের মুনসি ছিল মজনু শাহ'র সাথে, আর বৈকুণ্ঠ বলে মুনশি ছিল ভবানী সন্ন্যাসীর সেনাপতি। কুসংস্কারের প্রতি এদের দারুণ আস্থা ছিল কিন্তু দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেদের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাসী এবং তা অবশ্যই অহংকার ও গৌরবের। মজনুশাহ, ভবানী সন্ন্যাসীকে এরা ডাকাত বলে কেষ্টপাল, বৈকুণ্ঠ, যুধিষ্টিরদের বিশ্বাসকে আঘাত করে।

গিরিডাঙ্গা, গিজগিরিডাঙ্গা গ্রামের এই মানুষেরা কুসংস্কারচ্ছন্ন কিন্তু জাতিগত একটা টান তাদের মধ্যে আছে। তাই তো আফসার কলকাতার দাঙ্গার কথা শুনে কামারপাড়ায় আগুন লাগায়, জুম্মার নামাজের পর কুদ্দুস মৌলভী মোনাজাতে কলকাতা আর বিহারের মুসলমানদের দুর্দশা নিয়ে আল্লার দরবারে কান্নাকাটি করে।

স্বাধীন পাকিস্তানে কাৎলাহার বিলের পত্তন চলে যায় ব্যক্তি মালিকানায়। সব মাঝিদের দাবি অগ্রাহ্য করে, তা হয় কালাম মাঝির ব্যক্তিগতসম্পত্তি সেখানে আর কারো জাল ফেলার অধিকার নেই। গল্প উপন্যাসে তিনি সমাজ রূপান্তরের যুক্তি দিয়ে সাহিত্যের রূপান্তর ঘটাতে চেয়েছেন। গল্প উপন্যাসে প্রচুর রঙ্গশ্লেষ আর যৌনতার খোলামেলা বিবরণ দিয়ে লেখক চরিত্র ও ঘটনাকে চিত্রিত করেছেন।

জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হলে জমিদারের নায়েবেরা মোটা টাকা উৎকোচ নিয়ে পুকুর জমি প্রভাবশালীদের মধ্যে ইজারা দেয়, সেও তখন গরীব মানুষের কাছে খাজনা দাবি করে– সমাজের এই দিকটারও রাজনৈতিক সত্য অন্বেষায় যুগ চেতনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। 'খোয়াবনামা'য়। শরাফত মন্ডলের হাত থেকে বিল উদ্ধার হলেও তা কালাম মাঝির সম্পত্তি হয়ে যায়, সাধারণ মানুষ তা থেকে বঞ্চিত হয়।

লেখক তাঁর চিন্তাধারার প্রকাশের নিমিত্তে যে ঘটনা সাজিয়েছেন, সেই ঘটনা ও কাহিনী বিন্যস্তে তিনি তমিজের বাবা, কুলসুম, তমিজ শরাফত মন্ডল, কালাম মাঝি, বৈকুণ্ঠ ইসমাইল হোসেন– এরকম প্রধান ও অপ্রধান চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। উপন্যাস ও সমাজ বাস্তবতা প্রবন্ধে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস লিখেছেন– 'ধর্ম বা রাজাকে ডিঙিয়ে ব্যক্তি যখন নিজের বিকাশ ঘটাবার মহা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তখনই উপন্যাসের জন্ম।' তাই তাঁর উপন্যাস ও গল্পে ব্যক্তির আত্মবিকাশকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন ব্যক্তির

মুক্তি প্রয়াসের উদ্যোগ ব্যাপক ও সংগঠিত, তাই তিনি ব্যক্তির স্বরূপ সন্ধানে তৎপর থেকেছেন চারপাশের জীবন ও সামাজিক প্রেক্ষাপটকে গুরুত্ব দিয়ে। বাংলা কথাসাহিত্যে ব্যক্তি বিকাশের প্রথম সুযোগ দেন রবীন্দ্রনাথ, তিনি এমন জীবন ও মানুষ তৈরি করেন যাদের গড়ে ওঠা আছে, জীবনে বিকাশ আছে, তারা সমস্যায় পড়ে, আর সমস্যায় পড়ার সাথে সাথেই সমাধান খুঁজে পায় না। জীবনের জটিলতা থেকে ধাপে ধাপে মুক্ত হয় ব্যক্তি। এই জটিলতা মুক্তির কৌশল শিল্পী ভেদে ভিন্নতর তাতে উপন্যাসে আসে বৈচিত্র্য।

আখতারুজ্জামানের উপন্যাস থেকে বাংলাদেশের সমাজ মানস ও ব্যক্তি মানসের বৈচিত্র্য ও গভীরতা স্পর্শ করতে পারি। তিনি উপন্যাসে মানব অস্তিত্বের উদ্বেগ, জটিল জিজ্ঞাসা ও দ্বন্দ্বময় জীবনের অনেক সত্যকে তুলে ধরেছেন। মানুষের স্বপ্ন দেখার অসীম শক্তিকে তিনি সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসেই সাহিত্যে তা যুক্ত করেছেন। সমাজের শ্রেণিগত মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে তিনি সমালোচনা করেছেন।

তমিজের বাবা, তমিজ ও কুলসুমের ঘরকন্নায় দুর্ভিক্ষ তাড়িত আর্থিক বিপর্যস্ত সমাজের কথা উঠে আসে। দুর্ভিক্ষের দিনে হাড়িতে বলকানো ভাতের গন্ধ পেয়ে তারা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এত আকালের মধ্যে ভাতশূন্য পেটেও কুলসুমের জীবনের প্রতি স্পৃহা আছে। কামনা বাসনা বিবর্জিত নয় সে। আয়নায় মুখ দেখে সে তার অতীত খোঁজ করে। তার নাকছাবিপড়া নাকে বিলের পানির সোদা গন্ধ, মাছের আঁশটে গন্ধে তমিজের বাপের পিঠের তলায় পিষ্ট শাপলা ফুলের মধ্যে সে মিষ্টি হালকা গন্ধ খুঁজে পায়। কুলসুমের মাতৃত্ববোধ অনেক বয়সী সৎপুত্র তমিজের প্রতি মমত্ববোধে জড়িয়ে যায়। ঘুমের মধ্যে তমিজের বাপ শোলক বলে, দিনের বেলা মেজাজ ভালো থাকলে সে সেই স্বপ্ন বা স্বপ্নে বলা শোলক মনে করার চেষ্টা করে। তার কালের নস্টালজিয়া তাকে আক্রান্ত করে। সারাটা শরীর দিয়ে বাতাস টেনে যে শাপলা ফুলের গন্ধ নেয়, শাপলা ফুলের তাজা সোদা গন্ধ নিতে নিতে ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী তার কাছে গদ্যময় হয়ে ওঠে। তার দীর্ঘশ্বাসকে শব্দে ছেঁকে নিলে কথাগুলো হবে এরকম– 'বুড়া যদি শাপলার ডাঁটা কয়টা তুলে আনতো! তা হলে কী হতো? তাহলে বেশি করে মরিচ দিয়ে, রসুনের কয়টা কোয়া কুচিয়ে ফেলে কুলসুম কী সুন্দর চচ্চড়ি রেঁধে ফেলে। একটু চচ্চড়ি হলে পোড়া মরিচ কয়টা ডলে নিয়ে তমিজের বাপ তিন সানকি ভাত সেটে ফেলতে পারে একাই।

রাতভর হাঁটাহাঁটি করে আর কাদাপানি ঘেঁটে ঘরে ফিরলে পরদিন অনেক বেলা করে উঠে তমিজের বাপ কী ভাতটাই না গেলে। এই হাড়গিলা গতরটার ভেতর বুড়া এতো ভাত রাখে কোথায়? পেট ঠান্ডা থাকলে বুড়া কী ঘুমটাই যে পাড়ে!' কুলসুমের প্রসারিত করা লম্বা নি:শ্বাসের ভাবনায় তমিজের বাপের চরিত্রের পরিচয়ও উঠে এসেছে। দুর্ভিক্ষের দিনে বেশির ভাগ দিনেই তাদের উনুনে হাড়ি চড়ে না, শাক আলুও জোটে না কোন দিন। চাল সন্ধানের চিন্তা তাদের অনুক্ষণ কুড়ে কুড়ে খায়। হাড়িতে বলকানো ভাতের সুবাসের কল্পনায় কুলসুমের পেট, বুক চনচন করে ওঠে। এত কিছুর মধ্যেও রূপ প্রিয়তা তাকে আচ্ছন্ন করে। এত কিছুর মাঝেও তমিজের বাবার দ্বিতীয় পক্ষ কুলসুম চিন্তা করে– এই অবোর মানুষটা কি তার বিয়ে করা বিবির শূন্য কোলের কাথা কখনো ভাবে? –নারীর মাতৃত্ববোধের আকাঙ্ক্ষাই তাকে এই আবোর মানুষটার ঘরে বেঁধে রেখেছে, তার মধ্যে কুলসুম বাতেনি আলেমের জোরে সন্তানের প্রত্যাশায় দিন গোনে। তমিজের পুরনো কাপড়ের গন্ধে সে সন্তান আকাঙ্ক্ষার সাধ মেটায়। তমিজের কথা বার্তায় মাঝে মধ্যে ভাবান্তর দেখা যায়। খিয়ার থেকে ধান কেটে ফেরা তমিজের বর্ণনার উচ্ছ্বাসে কুলসুম আন্দোলিত হয়। গর্ভে তো সে কাউকে ধরলো না, ছেলে বলো আর মেয়ে বলো তমিজই তার সব! কুলসুমের হাসির সৌন্দর্য ছড়িয়ে পড়ে কথায় কথায়। দাদা চেরাগ আলী ফকিরের সাথে ঘুরে ঘুরে চেয়ে চিন্তে খেয়ে কুলসুম বড় হয়েছে। তাই চন্দন দহের আকন্দ, শিমুল তলার তালুকদার, রৌহাদহের খাঁ আর গোসাইবাড়ির মন্ডল ছাড়া নিম্নবিত্তের মানুষ ও তাদের জীবনাচরণ তার জানা। শোলকে শোলকে মানুষের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে বেড়ায় চেরাগ আলি ফকির। গ্রামের মানুষের কুসংস্কার তার জীবিকা নির্বাহের পুঁজি। কুলসুমের যুক্তিসঙ্গত প্রশ্নে চেরাগ আলি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তার জবাব দেয়। 'মাদারি পাড়াত না তোমার দাদা পরদাদা ব্যমাক মানুষের গোর আছে। একজন মানুষের কব্বর হয় কয় জায়গায়?' মাদারি পাড়ায় চেরাগ আলি ফকিরের পূর্বপুরুষের আস্তানা ছিল বলে কুলসুমকে সে বলে এসেছে। তারপর গোলাবাড়ি হাটে গিরির ডাঙ্গা গ্রামের কালাম মাঝির বাঁশঝাড়ে পাট খড়ি ঘেরা ছাপরায় আলসের হাড্ডি চেরাগ আলি আস্তানা গাড়ে, সে কোন দিন চাষের কামে হাত লাগায় নি, শুধু শোলোক গেয়ে ভিক্ষা করার বাহানা। এখানে কুলসুমের কিছুই ভাল লাগে না, কাৎলাহারের মাঝি পাড়ার মানুষ তেমন খয়রাত দিতে চায় না, মিলাদ পড়ায় কম, ছেলেদের খতনা করায় কিনা সন্দেহ, এখানকার ময়মুরুব্বিরা ছেলে মেয়েদের খোয়াব দেখায় না। এখানের রোজগারে দুজনের পেট ভরে না, অথচ কুলসুমকে সে মিথ্যা করে বলে– 'হামাগেরে পরদাদারা এখানে আস্তানা

লিছিলো।... তানাগোরে রুহ এখনো... এটিই ঘোরাঘুরি করে রে বুবু, এই জায়গা যি সি জায়গা নয়।' শেরপুরের এক পীরের দুই মোকাম, দুই মাজার... এই সব মিথ্যা বলে কুলসুমের কচিমনে তা বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করে। তার খাওয়া নিয়ে কম কথা শুনতে হয়নি এই গিবিরডাঙ্গা গ্রামে-অবোধ বালিকার সন্দেহে চেরাগ আলি হাসে।

চেরাগ আলির শোলক বাধায় সে সন্দেহ করলেও আবার বিশ্বাস করে এগুলো তার দাদার পূর্ব পুরুষ থেকে পাওয়া শোলোক। শুনতে শুনতে কুলসুমের তা মুখস্থ হয়ে গেছে। রাস্তার মোড়ে, হাটে বাজারে মেলায় দোতারা বাজাতে বাজাতে এগুলো গাইতে গাইতে ভুলে গেলে কুলসুম সুর করে গায়, তার ভুল শুধরে সে ঠিক করে গায়। এ গ্রামে থাকার জন্য কুলসুম বৈকুণ্ঠকে দোষারোপ করে। তাই গিবিরডাঙ্গার মানুষের উপর, জলবায়ুর ওপর কুলসুমের রাগ যায় না। বৈকুণ্ঠের মুখের পান জর্দার সুবাসে তার মাথা ঝিমঝিম করে। মাথা ঝিমঝিমিতে তার স্মৃতি চলে যায় বহুদিন আগের বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায়, ছুটতে ছুটতে উঠেছিলো কালাম মাঝির দোকানে হাটবারে। মাদারি পাড়ার মেঘলা দিনে দাদার হুকুমে তাকে চাল আনতে ছুটতে হয়েছে পড়শির ঘর থেকে, কত মুখ ঝামটা তাকে শুনতে হয়েছে। দরগা থেকে উৎখাত হয়ে ভাসমান জীবনে আশ্রিত কুলসুমের বিয়ে হয় তমিজের বাপের সাথে এত এত দু:খের মাঝেও তমিজের বাপের ঘরে মাচা থেকে চাল নিতে নিতে তার গলা থেকে বেরিয়ে আসে শোলোক ও দোতরার বোলের সুর। এ সুর ক্ষুধামুক্তির। ক্ষুধা জর্জরিত জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় সে শিউরে ওঠে। বিত্তহীন মানুষের জীবনে ক্ষুধা মুক্তিই বড় কথা। স্বামীর বয়সের প্রশ্ন সেখানে গৌণ। কুলসুমের চরিত্রে লেখক সমাজের সেই পরিচয় তুলে ধরেছেন।

কুলসুমের চাহিদা খুবই সামান্য, একটা কাঁথার স্বপ্ন তার চোখে শান্তির ঘুম নিয়ে আসে। স্বপ্নতত্ত্বে বিশ্বাসী সমাজে কুলসুম দাদার আমলের খোয়াব নামায় আস্থা রাখে। সে বিশ্বাস করে তার দাদার খোয়াবনামা বৈকুণ্ঠের শিয়রে থাকলে ডাকাতের হাতে তার মৃত্যু হতো না। তমিজের বাপের স্মৃতি তাকে তাড়া করে ফেরে, ঘরে তার উপস্থিতি অনুভব করে, তার আধ্যাত্মিক ফকিরী শক্তির উপর তার আস্থা আছে।

তমিজ 'খোয়াবনামা' উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র, সে বর্গাচাষী, তেভাগা আন্দোলনের কৃষকের মানসিকতা তার চরিত্রের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সে কুবেরের মত গরিবের মধ্যেও গরিব। তমিজ জমির স্বপ্ন দেখে। বীজ কেনার মত অর্থ তার কাছে না থাকলেও বর্গাচাষের আশায় সে শরাফত

মন্ডলের দ্বারস্থ হয়। কয়েক পুরুষ তমিজেরা বর্গাচাষী, তাই তেভাগা আন্দোলন শুরুর পরেও সে চিরাচরিত জমির মালিকানা জমিদারের– এই আজন্ম বিশ্বাসই তাকে চালিত করে, তাই 'ফসল বন্টনের এখতিয়ার জমির মালিকদের' এই বিশ্বাস থেকে সরে আসতে তার দেরি হয়।

ধানের স্বপ্ন তমিজকে বিভোর করে তোলে, ক্ষেত ভরা পাকা ধান দেখে তার চোখ জুড়ায়, মন ভরে। সে বর্গাচাষী হওয়ার খোয়াব দেখে, বর্গাচাষী হলে তার অবস্থা পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখে সে, অবস্থা পরিবর্তন তখন সময়ের ব্যাপার মাত্র তার কাছে। তেভাগাটা হয়ে গেলে অর্থাৎ বাস্তবায়ন হলে ধান বেচে যা থাকবে তার সাথে কাদেরের কাছে জমা রাখা টাকা মেলালে তার ঘর ভিটা খালাস হয়। তারপর কামারপাড়ার বাস্তুত্যাগী হিন্দুদের জমি কেনার খোয়াব দেখে, তার মধ্যে উচ্চাভিলাস আছে বলেই জীবনের অবস্থান্তর চায়। সে তেভাগার লড়াই এ শরিক হতে চায়। তেভাগার আন্দোলন তার মনে স্বপ্নের জাল বুনে দিয়েছে। বিল ডাকাতির আসামী তমিজ ক্ষমতাবান ভদ্রলোকের বাড়ির চাকর হয়ে পুলিশকে এড়ায়। সে খোয়াব দেখে হুরমতুল্লার কাছ থেকে জমি নিয়ে আউশের আবাদ করবে, দোপা জমিতে আউশের এমন ফলন করবে যে আমনের খন্দকে ছড়িয়ে যাবে। কালাম মাঝির কাছ থেকে বন্ধকী জমি ছাড়ানোর জন্য সে টাকা সঞ্চয় করে, কয়টা খন্দ করে কাদেরদের জমি নেয়ার স্বপ্ন দেখে। বর্গা পেলে গরু বাছুর কিনবে। এই ভাবে জীবনের স্বপ্ন তাকে বিভোর করে রাখে।

জীবনের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পুলিশের তৎপরতা সে এড়িয়ে যায়। হিলির গ্রামে এখন পুলিশ। থাকা চলবে না। এই গাড়ি ঠাকুরগাঁয়ে না গেলে হয়তো নাটোর যাবে। নাটোর নেমে সুবিধা করতে না পারলে সে উঠবে নবাবগঞ্জের গাড়িতে। নাচোল যাবে। ওখানে তেভাগা কায়েম হয় তো বর্গা সে একটা ঠিকই জোগার করে নেবে। ফসলের হিস্যা যা জুটবে তাতে প্রথমেই খালাস করে নেবে ভিটা আর ঘর। এ ভিটায় তরকারির চাষ হবে ভালো। ফুলজান খাটবে ওই জমিতে, কুলসুম পারবে না। কুলসুম তার বেটিকে শোলোক শোনাবে আর তার বেটি শোলোক শুনতে শুনতে বেগুন ক্ষেতে নিড়ানি খেলবে।' স্ত্রী কন্যা নিয়ে সুখ সংসারের স্বপ্নে তমিজ চলতি ট্রেনের দুলুনিতে বিভোর হয়ে ওঠে তমিজ। তমিজের ভাবনায়– শান্তাহার হয়ে পুলিশের জয়পুর, আক্কেলপুর, হিলি, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁ, নাটোর কিংবা নবাবগঞ্জে যাওয়ার অর্থ সেখানে চাষারা দুই ভাগ ফসল তুলছে নিজেদের গোলায়, তাই জোতদাররা পুলিশ নিয়ে আসে। রেলগাড়ি ভরা পুলিশ স্টেশনে স্টেশনে

ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে– চাষারাও তাদের কাস্তে হাতে তাড়া করেছে– তমিজ শান্তাহারে গাড়িতে উঠে পড়ে সকলের অজ্ঞাতে– যেখানে বাক-ঝুড়ি, কোদাল নিয়ে চাষারা চলেছে ঐ সব অঞ্চলে কাজের সন্ধানে। নাচোলের নাম তার আগেই শোনা ছিল জয়পুরহাট ধান কাটতে গিয়ে। তমিজ শোষিত মানুষের প্রতিনিধি, সে শোষক শ্রেণির পক্ষ নিয়ে শোষনের প্রতিবাদ করে।

তমিজের মধ্যে প্রতিবাদী চেতনা রয়েছে– তাই কাদেরের মুখের উপরে বলতে পারে– 'আপনারা না কছিলেন জমির উপর বর্গাদারদের হক কায়েম করার আইন জারি হবি? ফুলজানের বাপেক আপনার বাপজান জমি থ্যাকা উঠায় ক্যাংকা কব্যা?' এ্যাসম্বলিতে বর্গাদারের কথা না না উঠায় সে বিস্মিত হয়।

তমিজের মধ্যে প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ তেভাগার ক্ষেত্রেই শুধু নয়, মাঝিরা কাৎলাহার বিলে তাদের অধিকার রক্ষা করতে গেলে জালে আটকে সেখানে নবিতনের ছেলে আফাজের মৃত্যু হলে শরাফত মন্ডল তাদের মাছ চুরি ও মৃত্যুর জন্য পুলিশে দেয়ার উদ্যোগ নিলে তমিজ বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলে–'অত সাটাসাটি কিসক, কাৎলাহারের বিল তো মাঝিগোরে বিল। মাঝিরা মাছ ধরবি না?' এই দৃঢ়চেতা তমিজ গ্রাম্য ধনাঢ্যদের চক্ষুশূল হয়ে ওঠে– তাকে বিল ডাকাতি ও খুনের আসামী করা হয়। কামার পাড়ার মানুষ তমিজের পক্ষে, তারা তার জেল খাটাকে ভালভাবে নেয় না। শরাফত মন্ডলের উপর তাদের রাগ– সে বর্গাচাষীদের অর্ধেক ফসলও দেয় না–তমিজ ভাবে খিয়ারের চাষীদের মত এখানে চাষীরা একত্র না হলে ঠকেই যাবে শরাফত মন্ডলদের কাছে। সে হরমুতুল্লার জমিতে কামলা খাটতে চায় কিন্তু মনে তার তেভাগার স্বপ্ন। জেল থেকে বেরিয়ে কাজের সন্ধানে বের হয়েও তার একই স্বপ্ন। মাঝির ছেলে সে কিন্তু ধান চাষে দক্ষ। জাত চাষী হুরমুতুল্লাও চারা রোপনে তার সাথে পারে না। আমনের শীর্ষে দুধ আসলে সে রাতেও জমির তদারক করে। সংগ্রামশীল জীবন চেতনার প্রখর উজ্জ্বলতায় দীপ্ত তমিজ। শত কন্টকের যন্ত্রণা অতিক্রম করেও সে আত্মানুসন্ধানী। সত্য সন্ধানের ভাবনা তাকে মানব চৈতন্যের প্রাগ্রসর পথে চালিত করেছে।

তমিজ তরুণ। জৈবিক আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। লেখক ফ্রয়েডীয় চেতনায় তার মধ্যে সেই জৈবিক তাড়না দেখিয়েছেন। তার যৌন ক্ষুধার কাছে তার বাবার দ্বিতীয় স্ত্রীকেও সে ভোগ করতে ধর্মীয় বিধি নিষেধের কাছে বাধা পায়নি। এক সন্তানের মা কেরামতের স্ত্রীকেও নিজের

করে নিতে কোন সঙ্কোচ করেনি। সবই হয়েছে স্বভাবজাত জৈবিক বৃত্তির জন্য।

কেরামত তার সব কাজের মধ্যে কুলসুমের পটল চেরা চোখের কথা ভাবে। আবদুল কাদেরের নেতৃত্বে রিফিউজিদের মধ্যে রিলিফের মাল দিতে দিতে কেরামত মাথায় পদ্য (কবিতা) আসার বদলে ভেসে ওঠে কুলসুমের মুখ। রিফিউজি ক্যাম্পে অত্যাচারিত স্তনহীন বিহারী মেয়েটির জায়গায় সে কুলসুমের কল্পনা করে। কুলসুম তার গান করার সঞ্জীবনী শক্তি। সম্পর্কে চাচি হলেও কুলসুমের রূপ যৌবনের প্রতি কালাম মাঝির মোহও ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের মধ্যেই পড়ে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো মানব মুখিনতায় ভাস্বর। তমিজের বাবা চোরাবালিতে পড়ে মারা যায়, বৈকুণ্ঠনাথ নিহত হয় নির্মমভাবে। কেরামত আলী তেভাগার কবি থেকে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের কবি হয়। আর তমিজ শেষ পরিণতিতে ঢাকাগামী ট্রেনে উঠেও নাচোলের উদ্দেশ্যে নেমে পড়ে। নিম্নবর্গের মানুষগুলো দেশভাগের পরবর্তী রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে নানা নিপীড়নের মধ্যেও নতুন করে স্বপ্ন দেখে। সংগ্রামী মানুষের চিরায়ত আখ্যান সৃষ্টি হয়েছে খোয়াবনামায়। ইলিয়াসের সাহিত্যে আছে স্বদেশের মাটি আর মানুষদের নিয়ে রিয়ালিজম আর মনোরিয়ালিজম। যে মানুষগুলোকে আমরা তাঁর উপন্যাসে পাই তারা অচেনা ও উদ্ভট মনে হলেও একেবারে অপরিচিত নয়।

যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগ এসব রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সাথে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতকে সংযুক্ত করেছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। উদারনৈতিক মানবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে লেখক উপন্যাসে এসব উপস্থাপন করেছেন। লেখকের প্রগতিশীল চিন্তাধারায় অনেক দার্শনিক সত্য প্রকাশ পেয়েছে উপন্যাসে। যেমন– 'উঁচু জাতের শিক্ষিত হিন্দু পাড়ায় থাকলে বাড়ির ছেলেমেয়েরা বয়ে যায় না। ... নতুন যারা আসবে, তাদের বেশির ভাগই লুটপাটের পার্টি, পাড়াটা নষ্ট করে দেবে।'

দেশ বিভাগের মানবিক বিপর্যয় আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে স্পর্শ করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেশ বিভাগ (১৯৪৭) এ অঞ্চলে রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে ট্রাজিক ঘটনা। উপমহাদেশের হিন্দু মুসলমানের সহাবস্থান দেশ বিভাগের ফলে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। দেশ ভাগের কারণে মৃত্যু ঘটে প্রায় ৫ লক্ষ ভারতবাসীর। গৃহহীন ও বাস্তুচ্যুত হয় প্রায় দেড় কোটি মানুষ। নতুন দুই দেশেই দুই দিক থেকে অভিপ্রণায় ঘটে। কিছু পরিবার

পারস্পরিক গৃহ বিনিময় করে বসতি স্থাপন করলেও অনেক মানুষকে উদ্বাস্তু হতে হয়।

দেশ বিভাগের পর হিন্দুদের এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়া, ওদেশ থেকে কিছু সংখ্যক মুসলমানদের চলে আসা; হিন্দুদের বিষয় আশয় জলের দামে বিক্রি করে গোপনে ভারতে যাওয়া, বর্ডার পার হতে বিক্রিত সম্পত্তির নতুন মালিকদের সহযোগিতা করা– সব লেখক খুব স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা এত ঋদ্ধ যে হিন্দুর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের (মুকুন্দ সাহা) দরজায় ঝোলানো লক্ষীপুজার সরা আর দড়িতে দড়িতে বাধা আমপাতাও তাঁর নজর এড়ায়নি। মুকুন্দ সাহার দোকান দখল করতে যেয়ে কালাম মাঝির আচরণ, বৈকুণ্ঠর সাথে তার সম্প্রদায়গত কথাবার্তায় পাকিস্তানপন্থী একশ্রেণির মানুষের মানসিকতার যথার্থ বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে এখানে।

বিশ শতকের পাঁচদশকের মাঝামাঝি সময়ে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হলে জমিদারের নায়েবেরা মোটা টাকা উৎকোচ নিয়ে পুকুর জমি প্রভাবশালীদের মধ্যে ইজারা দেয়, সেই নায়েবও তখন গরীব মানুষদের কাছে খাজনা দাবি করে– সমাজের এই দিকটার রাজনৈতিক সত্য অন্বেষায় যুগ চেতনা মূর্ত হয়ে উঠেছে খোয়াবনামা-য়। শরাফত মন্ডলের হাত থেকে বিল উদ্ধার হলেও তা আরেক ব্যক্তির (কালাম মাঝি) সম্পত্তি হয়ে যায়, সাধারণ মানুষ তা থেকে বঞ্চিত হয়। ইলিয়াসের বিচার ভাবনার মত তাঁর শিল্প সাহিত্যেও গুরুত্ব পেয়েছে 'ব্যক্তি'র তত্ত্ব। কেননা আধুনিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ব্যক্তির উত্থান, পতন, ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিনাশ। আধুনিক একজন ব্যক্তির মধ্যে পুঁজিবাদের শক্তি, শোষণ, বিজ্ঞানের আর্শীবাদ ও অপপ্রয়োগের কুফল সবই দেখা যায়। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উপন্যাসে ব্যক্তির চরিত্রায়ণে এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাঁর সৃষ্ট আদর্শ ব্যক্তি যেমন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথিকৃৎ আবার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেরও অনুসারী। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মত শক্তিমান লেখকও পুঁজিবাদী সমাজের ভাবধারার মধ্যেই আবদ্ধ থেকেছেন। পুঁজিবাদকে এড়িয়ে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার উত্তরণ ঘটাতে পারেননি। এই দ্বৈতসত্তায় প্রায়ই তিনি আচ্ছন্ন হয়েছেন। তিনি মনে করেন পুঁজিবাদের সাথে নব্য বিজ্ঞানের যোগসূত্র আছে, তাই তাঁর উপন্যাসে পুঁজিবাদের শক্তি ও শোষণ এবং বিজ্ঞানের কল্যাণ ও ধ্বংসের মূর্তি এক সাথে স্থান করে নিয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে বাস্তব আর অলীকের সমন্বয় করেছেন ঔপন্যাসিক। তাই একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষদের তিনি উপন্যাসের কেন্দ্রমূলে আনতে

পেরেছেন। সাম্প্রদায়িক এত দাঙ্গাবাজির মধ্যেও তমিজকে পুলিশের হাত থেকে রক্ষায় বৈকুণ্ঠের প্রাণান্তকর চেষ্টা, গফুরের কাছে তমিজের ধরা পড়ায় বৈকুণ্ঠের অনুশোচনায় যেমন আবহমান বাংলার মানুষের সম্প্রীতির বাস্তব চিত্র উঠে এসছে, আবার বৈকুণ্ঠের অদৃশ্য সন্ন্যাসী ঠাকুরের মূর্তির কল্পনার মধ্যে অলীক ঘটনাও অনেক রয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের স্বপ্ন দেখার অসীম শক্তিকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসেই সাহিত্যে তিনি তা যুক্ত করেছেন। কাহিনী ও চরিত্রের প্রবাহমানতার ভেতর দিয়ে লেখক সমাজের শ্রেণিগত মানুষের ত্রুটি বিচ্যুতির সমালোচনা করেছেন।

চল্লিশোত্তর সময়ে সারা দেশে যখন চলেছে মন্বন্তর দাঙ্গা ধর্মঘট রক্তপাত, ঔপন্যাসিকের লেখার ভাজে ভাজে লুকানো রয়েছে সেই সব নিষ্ঠুর সময় আর সমাজের ছবি। দেশভাগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে লেখক জেনেছেন মানবিক বিপর্যয়ের রক্তাক্ত ইতিহাস। কাহিনী আখ্যান চরিত্র ট্র্যাজেডি সব কিছুতে যোগ হয়েছে লেখকের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। এই উপন্যাসে তাঁর চিত্রিত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি পাঠকের মনে অনুরণন জাগায়। গুরুগম্ভীর বিষয়কে তিনি কথকতার ভঙ্গিতে বলেছেন– দাঙ্গা, তমিজের বিয়ে গ্রাম্য দলাদলির বিবরণ গ্রন্থটিকে মহার্ঘ করেছে, যা পাঠকের চিন্তাভাবনাকে আলোড়িত করে। এই উপন্যাসে গ্রামীণ অর্থনীতির একটি পূর্ণ বৃত্তান্ত উঠে এসছে। মাঝি চাষী কৃষক শ্রমিক সব শ্রেণির মানুষের সূক্ষ্ম জীবনাচরণের বর্ণনায় উপন্যাসটি মহাকাব্যোচিত বৈশিষ্ট্যে উন্নিত হয়েছে।

প্রাবন্ধিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের একমাত্র প্রবন্ধের বই 'সংস্কৃতির ভাঙ্গা সেতু'। তাঁর বিশুদ্ধ মননচর্চার এই প্রবন্ধগুলো পাঠকসমাজে বহুল পরিচিত নয়। গল্প উপন্যাসের মত তাঁর প্রবন্ধও সংখ্যায় স্বল্প কিন্তু তাতে রয়েছে তাঁর গভীর জীবনবোধ, তাঁর বিশ্বাস। আত্ম-অভিজ্ঞতায় আখতারুজ্জামান সমৃদ্ধ ছিলেন, তাই আলোচিত বিষয়কে তিনি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে তাঁর বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ১৯৮০ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধগুলোর বিষয়বস্তু সামাজিক চিন্তা-চেতনা, ব্যক্তি, ব্যক্তিত্ব, তাদের সাহিত্যকর্ম ও জীবনবোধ সুগভীর অর্ন্তদৃষ্টি, তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি দিয়ে তিনি তা বিশ্লেষণ করেছেন। ব্যক্তির জীবনযাপনের মধ্যে তিনি মানুষের সম্পূর্ণ সত্তাকে উপলব্ধি করেছেন।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর চিলেকোঠার সেপাই ও খোয়াবনামা উপন্যাসে মধ্যবিত্তের ছকবাঁধা পানসে দুঃখবেদনার পাঁচালি রচনার পথ থেকে সরে এসেছিলেন। তাঁর প্রবন্ধেও কোন ভাবালুতা নেই, নির্মোহ আত্মসমীক্ষায় তিনি আলোকিত ব্যক্তির জীবন ও সাহিত্যবোধ উপস্থাপন করেছেন। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ সব মাধ্যমেই তিনি বহুল ব্যবহৃত, পরিচিত ও বহুদিনের পরীক্ষিত রীতির বাইরে যেয়ে রেওয়াজ ভাঙতে চেয়েছেন। তিনি মনে করেন আত্মচেতনার অভাবের কারণেই যা আছে তার জন্য স্তুতি আর যা নেই তার জন্য হাহাকার করে আমাদের শিল্পীরা মেধার অপচয় করেন। এই ভাবের শিল্পীরা অন্য ঘরে অন্যস্বর শুনতে আগ্রহী নন, তাই জীবনের বাস্তববৃত্তির শরীর নামক পদার্থটিকে আড়েঠারে দেখেন মাত্র, যৌনতার অবাধ প্রকাশ সাহিত্যে দেখাতে পারেন না। শিবাজী বন্দোপাধ্যায় বলেছেন– 'ইলিয়াসের গল্প-উপন্যাসে দেদার বঙ্গশ্লেষ আর যৌনতার খোলামেলা বিবরণ যে একে অপরের লাগোয়া আদৌ তা আপতিক নয়।' যৌনতাকে অস্বীকার করলে সাহিত্যের সত্যতা ক্ষুদ্র হয়, জীবন অপূর্ণভাবে প্রকাশ পায়– তিরিশোত্তর সাহিত্যিকদের এই চেতনা যথার্থ বলে মানেন আখতারুজ্জামান। তাই বাংলা সাহিত্যে বাস্তব আর অলীকের এক নতুন রাস্তা তিনি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

গল্প উপন্যাসের মত প্রবন্ধেও তিনি তন্ন তন্ন করে বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনাচরণ অন্বেষণ করেছেন। সমাজ-সংস্কৃতির কোন ভরকেন্দ্রে বাঙালির অবস্থান, ইতিহাসে বাঙালির স্থান কোথায়, মধ্যবিত্তের সৃষ্টিতে প্রান্তদেশের

মানুষের রহস্যময় আখ্যান কীভাবে এসেছে। এসব বিষয়ে তিনি নিজের অভিজ্ঞতার সংযোজন করেছেন তাঁর প্রবন্ধে। তাঁর কথাসাহিত্যে ও প্রবন্ধের পেছনে রয়েছে অভিন্ন রাজনৈতিক অভিনিবেশ ও চিন্তাধারা। শিল্পসাহিত্য রাজনীতি অর্থনীতি সংস্কৃতি সব বিষয়েই ইলিয়াসের বিচার ভাবনায় গুরুত্ব পেয়েছে ব্যক্তি। তিনি বিশ্বাস করেন ব্যক্তির উত্থান, পতন, ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিনাশ আধুনিকতার অন্যতম প্রধান ঘটনা। তাঁর অভিমত নব্য বিজ্ঞানের সাথে পুঁজিবাদের অচ্ছেদ্য যোগ রয়েছে। তাঁর উপন্যাসে তাই পুঁজিবাদের সূচনায় শক্তি ও শোষণের চেহারা, বিজ্ঞানের কল্যাণ ও ধ্বংসের মূর্তি এক সাথে স্থান করে নিয়েছে। পুঁজিবাদের সূচনায় ব্যক্তি চরিত্রের মধ্যে সচেতনা আসতে শুরু করে, সেই সচেতনতাবোধ এখনো পর্যন্ত সঞ্চয় করে মানুষ বাস্তব ও বিভ্রমের আলেখ্যর মধ্যে নানা রূপে তার সচেতনতাকে প্রকাশ করে চলেছেন।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রবন্ধে কথা আছে বিস্তর, সোজা ও বাঁকা পথে কথার পরে কথা অনেক উঠে এসেছে। তাঁর বিশ্লেষণী পদ্ধতিতে অনেকের হয়তো আস্থা নেই কিন্তু তাঁর রচনার আধুনিকতা সম্পর্কে কারো সম্পর্কে দ্বিধা নেই। ২২টি প্রবন্ধের সংকলন তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থ 'সংস্কৃতির ভাঙা সেতু', যা তাঁর মৃত্যুর পর কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। সমকালীন বাংলা সাহিত্যের এক ভিন্নমাত্রার গ্রন্থ এটি। গ্রন্থকারে প্রকাশের আগে এই লেখাগুলো বিভিন্ন আলোচনা সভা, আড্ডা ও সেমিনারে কথিত ও পঠিত হয়েছিল। সাহিত্যিক, শিল্পী বা সংস্কৃতি কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য, উপন্যাসে সমাজ বাস্তবতা, বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পদৃষ্টি বা দৃষ্টিভঙ্গি, বাংলা ছোট গল্পের ভূত ভবিষ্যৎ, রবীন্দ্র সঙ্গীতের শক্তি, বুলবুল চৌধুরীর বহুমুখী শিল্প প্রতিভা, শওকত ওসমানের প্রতিক্রিয়া– শামসুর রাহমানের স্মৃতিময় ঢাকা শহর, শহীদুর রহমানের গল্পের পটভূমিতে ষাটের দশকে গল্প লেখার ইতিকথা, সূর্যদীঘল বাড়ি, গান্ধী চরিত্র, নোবেল বিজয়ী জার্মান সাহিত্যিক গুন্টার গ্রাস, কায়েস আহমেদ ও অভিজিৎ সেন প্রমুখ সমকালীন লেখকদের রচনা বিষয়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের আলোচনা– সমালোচনায় রয়েছে তাঁর সুগভীর অর্ন্তদৃষ্টি। তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি দিয়ে তিনি তা বিশ্লেষণ করেছেন। শিল্পীর দায়বদ্ধতায় তিনি তাঁর বিশ্বাসকে প্রবন্ধগুলোতে তুলে ধরেছেন, তাঁর অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও চিন্তাভাবনার সাথে মতপার্থক্য থাকলেও পাঠক তাতে চমৎকৃত হন। কারণ হিসেবে শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত উল্লেখ করা যায়– 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রবন্ধে সাক্ষাৎকারে– আলাপ চারিতায় জন কয়েক বাঙালি সাহিত্যিকের নাম– প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে

আসে। যেমন : সুকুমার রায়। তাঁর মতে– যিনি স্যাঁতস্যাঁতে তরল আবেগতাড়িত বাঙালিদের ভিড়ে আগাগোড়া বেমানান, জীবনের সব বিষয় নিয়ে অবিরাম মজা করার ক্ষমতায় অদ্বিতীয় সুকুমারের বৈশিষ্ট্য ঠিক এখানেই যে তিনি ''কখনো মুগ্ধ করেন না, হাসাতে হাসাতে সচেতন করে তোলেন,'' তাঁর প্রতি ভক্তিতে গদগদ হওয়ার সুযোগ তিনি নিজেই দেন না।' এই রকম মানুষ তাঁর কাম্য চরিত্র। এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তাঁর রচনার অভিমতের সাথে পাঠকের মত পার্থক্য থাকলেও তাঁর অর্ন্তদৃষ্টি পাঠককে মুগ্ধ করে। পর্যায়ক্রমে তাঁর প্রবন্ধগুলোর বিষয়বস্তু আলোচনায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর সত্যতা মিলবে। পাঁচভাগে বিন্যস্ত এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলো।

গ্রন্থটির কাব্যিক নামে প্রারম্ভের প্রবন্ধটির নাম সংস্কৃতির ভাঙ্গা সেতু। ভাঙ্গা শব্দটিতে রয়েছে লেখকের ক্ষোভ। এখানে তিনি তাঁর দায়বদ্ধতা থেকেই প্রাচীনকাল থেকে বাংলার মানুষের জীবন, মানসিকতা ও প্রাণের সাথে নিবড়ভাবে জড়িয়ে থাকা বাংলা ও বাঙালির ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিধারার বিভ্রান্তিকে তুলে ধরেছেন। আবহমান বাংলার ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এদেশের কোটি কোটি মানুষ, সেই মানুষের অনির্বচনীয় আনন্দধারা আজ চিরচেনা পথ ছেড়ে অন্য পথে হাঁটা শুরু করেছে। প্রবন্ধটির প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর ১৯৮৪। রচনাটিতে রয়েছে সামাজিক চিত্রায়ণ। দেশের মাটি ও মানুষের সাথে সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সংস্কৃতি আমাদের জীবনধারা, বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও চৈতন্যের স্মারক। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মের বিকাশের মাধ্যমে দেশ ও জাতির সামগ্রিক জীবনবোধ ও জাতীয় চেতনা প্রকাশ পায়, কিন্তু বর্তমান সমাজে তাতে ভাঙ্গন ধরেছে। এর কারণ সমাজ জীবনে অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ। এই অপসংস্কৃতি শহর থেকে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছে; আর তা বিস্তার পেয়েছে উচ্চবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত কিশোর তরুণদের মধ্যে। সামাজের জানা ও দেখা বিষয় প্রাবন্ধিকের লেখায় প্রাণ পেয়েছে– 'সদা পরিবর্তনশীল কাট ছাটের কাপড় চোপড়, স্টিকার, চেন ইত্যাদি তো বটেই, কোকাকোলা থেকে শুরু করে মদ, গাঁজা, চরস, ক্যামেরা, টেপরেকর্ডার টিভি ভিসিআর হোণ্ডা গাড়ি যে যেমন পারে প্রভৃতি উপাদান ছাড়া এই সাধনা অব্যাহত রাখা বড় কঠিন। এখানে ক'টা বাপ-মা আছে যারা নিয়মিত এসবের জোগান দিতে পারে? তা সে ব্যাপারেও সাহায্য করার জন্য আমাদের টিভি ও সিনেমাওয়ালা সদাপ্রস্তুত। হাইজ্যাক, চুরি, ডাকাতি, মারামারি লম্ফঝম্ফ প্রভৃতি ছবি দেখিয়ে যুব সম্প্রদায়কে এরা অর্থ সংগ্রহের শর্টকাট পথ রপ্ত করার প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এতে পয়সা কামানো চলে, অন্যদিকে পয়সা কামাবার পদ্ধতিটা ও ঐ ধরনের সংস্কৃতিচর্চার অবিচ্ছিন্ন অংশ। এইভাবে

earn while you learn– কর্মযোগে উদ্বুদ্ধ হয়ে যুব সম্প্রদায়ের একটি অংশ একই সঙ্গে অর্থোপার্জন ও সংস্কৃতিচর্চা দুটোতেই সমান পারঙ্গম হয়ে উঠেছে। অর্থাগম হচ্ছে দেখে এদের রক্ষণশীল বা রুচিশীল বাপ-মাও চুপচাপ থাকাটাকে বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেন।' স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে যুব সমাজের একাংশের মধ্যে যে নৈতিক অবক্ষয় ঘটে, তার একটি তথ্যচিত্র তিনি রসসমৃদ্ধ করে তুলে ধরেছেন। রম্য সাহিত্যিক সুকুমার রায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথের কৌতুক রঙ্গে অনুপ্রাণিত আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কৌতুকবোধও অসামান্য। এই কৌতুকরঙ্গে বাস্তবকে উপস্থাপনের মধ্যে লেখক যেমন সামাজিক সত্যকে তুলে ধরেছেন তেমনি তার প্রতি তাঁর ঘৃণা ক্রোধের আগুনও বিচ্ছুরিত হয়েছে। ধর্মের আচ্ছাদনে এই বিভ্রান্ত যুবকেরা তাদের অপকর্মকে আড়াল করতে চায়। উনিশ শতকের ইয়ংবেঙ্গলের এক অংশের মত আশির দশকে এদেশের যুবসমাজের একাংশের মধ্যেই শুধু ঘুণ ধরেনি, ঘুণ ধরেছে কতিপয় বুদ্ধিজীবীর মধ্যেও। রেডিও টিভি গণমাধ্যমে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে তাদের কথা বলার উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন। টিভি, চলচ্চিত্র সুস্থ ধারার সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অপসংস্কৃতির বাহক হয়ে অশ্লীলতাকে প্রাধান্য দিচ্ছে– সমাজের সচেতন মানুষের এহেন কর্মকাণ্ডে যুবসমাজ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে দিকনির্দেশনার অভাবে বিচারবোধ হারিয়ে ফেলেছে। এই অপসংস্কৃতিচর্চা বেশি করে গ্রাস করেছে মধ্যবিত্ত সমাজকে। মধ্যবিত্ত সমাজের একটি বড় অংশ নিজেদের সামাজিক ও শ্রেণিগত অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত নন। যেনতেন ভাবে অর্থ উপার্জন তাদের কাছে মুখ্য। হঠাৎ অর্থবান হয়ে সমাজের উঁচুস্তরে অবস্থান তাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। উপরে উঠতে যেয়ে অনেকেই খাদে পড়ে চোরাবালিতে আটকে নিঃশেষ হয়ে যায়। যারা হোঁচট খেয়েও বেঁচে থাকে তারা হয় উচ্চাভিলাষী। তাই প্রাবন্ধিক বলেন– 'বুর্জোয়া দেশগুলোর উচ্চবিত্তের জীবনযাপনকে আদর্শ ধরে নিয়ে মধ্যবিত্ত সেটাকেই অন্ধভাবে অনুসরণ করতে শুরু করে। কিন্তু বুর্জোয়া মূল্যবোধ ও মানসিকতা তার ধরাছোয়ার বাইরে। ওদিকে ওপরের ধাপে ওঠার জন্য মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত এতই উদগ্রীব ও অস্থির যে এজন্য হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তা-ই সে আঁকড়ে ধরে। ঐ ধাপে পৌছার জন্য মাজারে বা পীরের কাছে ধরণা দিতেও তার বাধে না।' এই মধ্যবিত্তের মানসিকতার মধ্যে তিনি বৈপরীত্য দেখেছেন, আমাদের মধ্যবিত্তের জীবনযাপন কিংবা ঈপ্সিত জীবনযাপন এবং মূল্যবোধ পরস্পর বিরোধী। এই শ্রেণির মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ থাকে না, 'সামন্ত ও গ্রাম্যমূল্যবোধের সাথে বুর্জোয়া জীবনযাপনের' ফলে তারা এক উৎকট জীবনযাপন করে– প্রাবন্ধিক

তার নাম দিয়েছেন অপসংস্কৃতি। আর সেই জন্যই আমাদের সাহিত্য চলচ্চিত্র, সংগীত, নিস্প্রাণ নির্জীব হয়ে পড়েছে। আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী কারো মধ্যেই সাড়া জাগাতে পারছে না। সৃজনশীল শিল্পীর হাতে না পড়ে আমাদের সংস্কৃতি তার সৌন্দর্য হারিয়ে পানসে হয়ে পড়েছে।

দেশের সাহিত্যের দৈন্যদশা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে আহত করেছে। সাহিত্যে মৌলিকতার চেয়ে অনুকরণই বেশি, মানুষের প্রতিদিনকার জীবনযাপনে কোন গভীর সত্য বা প্রশ্নের উন্মোচন সাম্প্রতিক কথা সাহিত্যে নেই। প্রচলিত মূল্যবোধ বা সমাজব্যবস্থার সম্পর্কে কোন নতুন জিজ্ঞাসা সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যেকরা তুলে ধরতে ব্যর্থ হচ্ছেন– শিক্ষা সাহিত্যের এই বন্ধ্যাত্বে লেখক দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে শঙ্কিত। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে সাহিত্যের শুদ্ধতা বিনষ্ট হয়েছে। আঙ্গিকের দিক থেকে কবিতা পরিণতি লাভ করেছে কিন্তু এক শ্রেণির কবির সৃজনশীলতার অভাবে কবিতা তার সৌন্দর্য হারিয়ে জীবনের স্পন্দন ও প্রেরণা থেকে বঞ্চিত। এইভাবে প্রবাক্ষিক আমাদের সংস্কৃতির বিভিন্ন মাধ্যম যে মেকি, অপূর্ণ– তার ঘোরতর সমালোচনা করেছেন। আধুনিক সংগীত, নৃত্যকলা সম্পর্কেও তাঁর মনোভাব ইতিবাচক নয়, এখানেও সৃজনশীলতার অভাব মনে করেন। মধ্যবিত্ত সমাজকে যে সংগীত ও নৃত্য অনুপ্রাণিত করে আনন্দ দেয়, তাও সাম্প্রতিক কালের রচনা নয়। আধুনিককালে নগরের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে, তাতে নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনে এসেছে বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতা– কিন্তু সাহিত্য সঙ্গীতে তার অনুরণন নেই। শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি মহৎ, তাঁর সেই উপলব্ধি রয়েছে তাঁর লেখায়– 'সফল শিল্পকর্ম মানুষের আনন্দ ও বেদনাকে অমূল্য করে তোলে। বাঁচাকে করে তোলে অর্থবহ এবং জীবনকে তাৎপর্যময় করে গড়ে তোলার জন্য মানুষকে প্রেরণা জোগায়; সাম্প্রতিক শিল্পচর্চা এইসব শক্তির সবগুলো হারিয়ে ফেলেছে।' এর কারণ হিসেবে মধ্যবিত্তের কর্তৃত্বে রুচিশীল শিল্পচর্চার অক্ষমতা, স্বল্প মেধা এবং আন্তরিকতার অভাবকে তিনি দায়ী করেছেন। মধ্যবিত্ত বাঙালির অহমিকাবোধ সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবিত্ত বাঙালি থেকে যে দূরত্ব বা বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছে, তাতে মধ্যবিত্তের সংস্কৃতি ও শিল্পচর্চা একঘেয়ে প্রাণহীন হয়ে পড়েছে। এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবিত্তেরা শ্রমজীবী, অপসংস্কৃতির বিষময় ছোবল থেকে তারা মুক্ত। মধ্যবিত্তের রুচি ও মেজাজের অংশীদার হলেও এই শ্রমজীবীরা মধ্যবিত্তের বুদ্ধি ও আবেগের সাথে যুক্ত হতে পারে না, মধ্যবিত্তের এক ছোট অংশ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম করেন কিন্তু শ্রমজীবী মানুষকে তা স্পর্শ করতে

পারে না। কেননা তাদের চিন্তাভাবনা, আচরণ শ্রমজীবীর আয়ত্তের বাইরে। তারা শিক্ষার আলোকবঞ্চিত, তাই মধ্যবিত্তের সংস্কৃতি থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবীরা বিচ্ছিন্ন প্রাবন্ধিককে এই বিষয়টি আহত করে। তিনি বিশ্বাস করেন সমন্বিত সংস্কৃতির মধ্যে শক্তি থাকে, সংখ্যাগরিষ্ঠের কর্মপ্রবাহ ও জীবনপ্রবাহের মধ্য প্রেরণা না থাকলে কোন দেশের সংস্কৃতিচর্চা সংগঠিত ও প্রাণবন্ত হতে পারে না। এই তত্ত্বের জন্যই লেখক বলেছেন– 'এই বিচ্ছিন্নতার ফলে আজ আমাদের সংস্কৃতির রুগ্ন দেহ, তার দৃষ্টি ফ্যাকাশে, তার স্বর ন্যাকা এবং নিঃশ্বাসে প্যানপ্যানানি।' সংস্কৃতি ও শিল্পচর্চা মানুষের জীবনকে যদি অর্থবহ করে তুলতে না পারে তাহলে রাজনীতি সমাজনীতি ধর্মনীতি কোন কিছুই ফলপ্রসূ হয় না। স্বাধীনতা বিরোধী জাতির গণশত্রু প্রতিক্রিয়াশীলদের সাথে বামপন্থী রাজনীতিবিদদের সংহতিকে তিনি সমালোচনা করেছেন। জাতীয় সংহতি, নিরাপত্তা, স্বাধীনতারক্ষা এবং গণতন্ত্র উদ্ধারে তাদের ব্যর্থতার কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী নিম্নবিত্তের সাথে যোগযোগ না রাখা। মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক সঙ্কট এদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে, যে জনসমষ্টির মুক্তির জন্য তারা সংগ্রাম করেন, তাদের সাথে এদের সহাবস্থান নেই। তাদের জীবনযাপন পদ্ধতি এরা জানেন না, এই সংস্কৃতির বিচ্ছিন্নতার জন্যই এদেশে সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি প্রাণহীন ও নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। সব কিছুর মূলে রয়েছে আমাদের সংস্কৃতির সংকট। সাংস্কৃতিক চেতনাই জাতিকে সব প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তি দিতে পারে। দেশীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণ না করা এবং বিদেশি সংস্কৃতির উপর নির্ভরশীলতা জাতিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। শোষণমুক্ত ও সাম্যবাদী সমাজ গঠনের সংকট নিয়ে বাপন্থীরা রাজনীতিতে আসেন, সৎ নিষ্ঠাবান এই সব কর্মী শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে না পারার কারণ উভয় পক্ষের সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা। বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্য ও ইসলাম ধর্মের বিস্তারের যুগে এই দেশের হিন্দুরা সাংস্কৃতিক সংরক্ষণকেই তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার হাতিয়ার হিসেবে নিয়েছিলেন। তুর্কি আক্রমণ প্রতিহত করতে না পারার পেছনের কারণ ছিল সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা– তৎকালীন শাসকশ্রেণি এটা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই শাসনক্ষমতা বিচ্যুত ব্রাহ্মণ্যবাদী পরাজিত শাসকেরা সাংস্কৃতিকভাবে সংগঠিত হয়ে শক্তিশালী হওয়ার জন্য দীর্ঘদিনের অবহেলিত অন্তজ-অস্পৃশ্য বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জীবনাচরণ, লৌকিক দেবদেবী, তাদের রচিত ব্রতকথা পাঁচালিকে নিজেদের উচ্চতর মার্জিত শিষ্ঠ সংস্কৃতির সাথে যুক্ত করে নিয়েছিলেন। তাই মুসলমান বিজেতেরা পাঁচশ বছর এদেশে রাজত্ব করে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেননি। অভিজ্ঞ যুক্তিবাদী বুদ্ধিদীপ্ত

এই প্রাবন্ধিক সাংস্কৃতিক সমন্বয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন। সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা দেখে তিনি শঙ্কিত হয়েছেন। এইদেশে শ্রমজীবী মানুষের দারিদ্র্য বহু শতাব্দীর নিদারুণ শোষণের ফল। বাংলার নিম্নবিত্তের ছবি এঁকেছেন হাজার বছর আগের চর্যাপদের কবি– 'টালত মোর ঘর নাহি পরবেসী/হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী।'। দুঃখ দারিদ্র্য সত্ত্বেও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশও এই দেশের মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাই দরিদ্র সরবী বালিকা গলার গুঞ্জা ফুলের মালা পরে উঁচু পাহাড়ে বসেও জীবনকে উপভোগ করতে পারে।

সমাজে প্রত্যেকটি মানুষের আলাদা আলাদা অস্তিত্ব ও আত্মসম্মানবোধ আছে। একজন দরিদ্র নিঃস্ব ব্যক্তিটিও তার পরিবার ও সমাজের একজন সম্মানিত সদস্য। জীবিকা অর্জনের জন্য বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তিনি দায়বদ্ধ– সুতরাং ব্যস্ততা, তৎপরতা, দায়িত্ব কর্তব্য, চিন্তা, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা উত্তেজনা নিয়ে নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী একজন আস্তমানুষ। সুতরাং আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ চিন্তা ভাবনায় তিনিও একধরনের সংস্কৃতির মধ্যে বাস করেন। হতে পারে তা উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত থেকে ভিন্নতর। তাদের সংস্কৃতিচর্চার বিকাশ ও বিবর্তন প্রায় বন্ধ। শ্রেণিগত বৈষম্য ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতাকে বর্তমান সমাজব্যবস্থা ভাঙ্গনের একটি অন্যতম কারণ বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন।

প্রবন্ধটির মধ্যে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সাম্যবাদী চেতনা ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর আলোচনায় ধারাবিবৃতির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে অনেক ক্ষেত্রেই। কথার টানে কথা কোন সময় সোজা হয়ে কোন সময় বা বাঁকা হয়ে তাঁর মনোবৃত্তির ক্রোধ তরল কৌতুকের চেহারায় আত্মপ্রকাশ করেছে। শ্রমজীবী মানুষের স্বপ্ন দেখার অসীম শক্তি' কে জাগানোর জন্য তিনি মধ্যবিত্তের সংকীর্ণতা ও আড়ষ্টতাকে ঝেড়ে ফেলার পক্ষপাতি ছিলেন। অধিকাংশ মধ্যবিত্তের সংগঠিত শৌখিন সংস্কৃতিচর্চা তাঁর জীবিকা ও দৈনন্দিন জীবনযাপনের সাথে সম্পর্কহীন, তাই তিনি মনে করেন একুশে ফেব্রুয়ারি ও পয়লা বৈশাখের লোক দেখানোর উৎসব পালন তাদের স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্য নয়, লৌকিক সংস্কৃতি ধারণ ও গ্রহণে তাদের আন্তরিকতা নেই, বাইরের আবরণ মাত্র। এই শ্রেণির মানুষের চারিত্রিক কৃত্রিমতা সমাজ ও সংস্কৃতি বিকাশের অন্তরায়। তাই বিশ শতকের শেষেও এই দেশের সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে বিরাট টানাপোড়েন।

প্রাবন্ধিক নিম্নবিত্ত শ্রমজবীবীর সংস্কৃতিচর্চাকে তাদের জীবিকার সাথে সম্পৃক্ত মনে করেন। কৃষকের গান, মাঝির গান অর্থাৎ শ্রমজীবীর সংস্কৃতি তাদের কাজের শক্তি। তাদের কাজের সাথে, পরিবেশের সাথে সংগতি রেখেই যেন জারি-সারি-ভাওয়াইয়া গানের বাণী ও সুর সৃষ্টি হয়েছে। মধ্যবিত্ত আর

নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী একই আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করলেও তার প্রকাশভঙ্গিতে পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যের কারণ মধ্যবিত্তের শিক্ষা ও রুচির পরিবর্তন। মধ্যবিত্তের রুচির সাথেও তাদের রুচির পার্থক্য অনেক। আবহমানকালের বাংলার শ্লোক, ছড়া, উপমা, প্রবাদযুক্ত শ্রমজীবীদের ভাষা মধ্যবিত্তের কাছে অশ্লীল মনে হয়, কিন্তু শ্রমজীবীর ভাষা তাদের জীবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রতিকূল অবস্থার সাথে যুদ্ধ করে তারা হাজার হাজার বছর ধরে টিকে আছে, তাদের মধ্যে কৃত্রিমতা নেই। সাহিত্যে সৃষ্টির যোগ্যতা তাদের নেই কিন্তু তারা দেশের সংস্কৃতি বিচ্ছিন্ন নয়। তাদের সংস্কৃতি নিয়েই মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্তের লেখক ও শিল্পীর হাতে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য শিল্প সৃষ্টি হয়। আমাদের বাংলাসাহিত্যের মহাকাব্যিক শ্রেণির মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল কাহিনী গড়ে উঠেছে অন্ত্যজ সমাজের লৌকিক দেবদেবীর পূজা ও উপাসনা লক্ষ্যে রচিত ব্রতকথা পাঁচালিকে উপলক্ষ করে। সেই অন্ত্যজ অশিক্ষিত মানুষের যা সাধ্য ছিল না, শিক্ষিত শ্রেণির মানুষেরাই নিজেদের প্রয়োজনে তাদের ব্রত কথা ও পাঁচালি নিয়ে সেই মহাকাব্যিক মঙ্গলকাব্য রচনা করেছিলেন।

সংস্কৃতির ভাঙা সেতু প্রবন্ধে লেখক আধুনিক শিল্প-সাহিত্য প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। এ সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের অভিমত 'আধুনিক কালে শিল্প ঠিক প্রাকৃতিক নিয়মে গড়ে ওঠে না, শিল্পীর সচেতন ভাবনা ও তৎপরতার ফল আধুনিক শিল্প সাহিত্য। বিটোফোন, ভাগনার প্রমুখ পাশ্চাত্য সংগীত রচয়িতার শিল্পকর্মের উৎস হল ইউরোপের গ্রামের প্রকৃতি, গ্রামের লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি। এঁদের শ্রেষ্ঠ কীর্তিসমূহ সচেতন প্রয়াসের ফল।' আধুনিক সাহিত্য বাস্তব বিষয়কে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে। লেখকের আত্ম অনুভূতি ও জীবন দর্শন যখন কোন বাস্তব বিষয়কে গ্রহণ করে শিল্পসম্মত রূপে প্রকাশ পায় তাই-ই সাহিত্য। সাহিত্যে লেখক তাঁর উপলব্ধি ও বক্তব্যকে প্রকাশ করেন। মানুষ এবং সমাজ এখন সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। আধুনিক সাহিত্যের বর্তমান প্রেক্ষাপট নিয়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এই প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। বর্তমানের অনেক সাহিত্যেই শ্রমজীবী মানুষ অর্থাৎ শ্রমিক, কুলি, কামার কুমারের চরিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। বাংলা নাটক ও চলচ্চিত্রে আছে নিম্নবিত্তের জীবন। সাম্প্রতিক কয়েকটি উপন্যাসের উপজীব্য নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী সম্প্রদায়, এদের দারিদ্র্য ও বঞ্চনার আলেখ্য কারো কারো উপন্যাসের বিষয়বস্তু। কবিতায় আছে নিম্নবিত্তের শোষণ ও শোষণমুক্তির সংগ্রামে অংশ নেয়ার সংকল্পের কথা। কিন্তু লেখকের আক্ষেপ ঐসব সাহিত্যে শিল্পে নিম্নবিত্তের জীবনাচরণ থাকলেও তাদের সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটেনি। আক্ষেপ করেই তিনি আফ্রিকার একটি উপন্যাসের উদাহরণ এনে তাঁর ক্ষোভ

ও অভীপ্সাকে এভাবে লিখেছেন– 'নাইজিরীয় লেখক চিনুয়া আর্চিবির উপন্যাসে নাইজিরিয়ার গ্রাম্য জীবনের গভীর ভেতরে ঢোকার সকল প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। সেখানকার মানুষের জীবনযাপনের পরিচয় তো আছেই, উপরন্তু সেই জীবনযাপন জীবন্ত হয়ে উঠেছে আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষার প্রবাদ-প্রবচন শ্লোক এবং তাদের বিশ্বাস ও সন্দেহ, সংস্কার ও কুসংস্কারের অপূর্ব ব্যবহারের ফলে। এই উপন্যাসগুলো ইংরেজীতে লেখা। অথচ সম্পূর্ণ আলাদা... ভিন্ন মহাদেশীয়, ভিন্ন সভ্যতার, ভিন্ন রুচির, ভিন্ন সংস্কৃতির একটি ভাষায় নাইজিরিয় সংস্কৃত উঠে এসেছে তার অস্থিমজ্জা নিয়ে। এখানে ব্যবহৃত অনেক কথা ও প্রবাদ, কী ছড়া ও শ্লোক, ইংরেজি কী পাশ্চাত্য এমনকী আধুনিক মধ্যবিত্ত বাঙালি রুচি অনুসারে অশ্লীল ও স্থূল। কিন্তু নাইজিরিয়ার পাশ্চাত্য শিক্ষাবর্জিত গ্রাম্য মানুষের সর্বাঙ্গীন ও জীবন্ত রূপায়ণের জন্য লেখক সেগুলোকে তুলে এনেছেন অপরিবর্তিত অবস্থায় এবং একই সঙ্গে তাকে নতুন মাত্রা দিয়ে তাকে তাঁর উন্নত দার্শনিক চিন্তার বাহনে পরিণত করেছেন।' এর প্রেক্ষিতে লেখক অনুশোচনা করেছেন আমাদের দক্ষ ও নৈপুণ্যসম্পন্ন লেখকেরা বাংলা ভাষার প্রবাদ প্রবচন শ্লোকছড়া ইত্যাদি লোকসংস্কৃতিকে সাহিত্যে ব্যবহার করেন না। লোক সাহিত্য ও লোক সংস্কৃতির সংগ্রহ ও সংরক্ষণে কতিপয় পণ্ডিত, গবেষক অত্যন্ত তৎপর। এই সব বিষয়াদি মেলা, সভা সমিতি, সেমিনারে প্রদর্শন ও আলোচনাও হয় কিন্তু আধুনিক শিল্পী ও লেখকেরা যদি তা নিজের শিল্পচর্চার সাথে যুক্ত না করেন তবে এদেশের লৌকিক সংস্কৃতি একসময় লুপ্ত হয়ে যাবে আর মধ্যবিত্তের আধুনিক শিল্প ও সংস্কৃতিচর্চা দেশের সংস্কৃতির মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তা দেশের ঐতিহ্য বিচ্যুত হয়ে প্রাণহীন হয়ে পড়বে।

সংস্কৃতি চর্চা, সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তিনি রাজনীতিকদের স্বার্থন্বেষী মনোভাবকে তীব্র সমালোচনা করেছেন। ইতিহাসের নির্মাতা হচ্ছেন এই শ্রমজীবী মানুষ। আদিম জীবন থেকে বহু মানুষের শ্রমে ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে আজকের সভ্যতা ও সংস্কৃতি। কিন্তু সভ্যতার কারিগররা মর্যাদা পাননি। শিল্পচর্চার প্রাণ ও গতিরক্ষার জন্য আবহমান কালের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সংস্কৃতির চর্চা ও সমন্বয় একান্ত অপরিহার্য।

দেশের সংস্কৃতি রক্ষা, সংরক্ষণ, সমন্বয় ও চর্চার প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দিয়ে একই কথার পুনরাবৃত্তিতে প্রাবন্ধিক তাঁর অনুভব উপলব্ধিকে যেভাবে ব্যক্ত করেছেন তাতে লৌকিক সংস্কৃতি ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি তাঁর মমতা এবং কতিপয় গোষ্ঠীর আচরণ ও তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য তার প্রতিবন্ধকতার দিকটি এই প্রবন্ধে উঠে এসেছে।

সাহিত্য-সংস্কৃতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এই গ্রন্থে তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'উপন্যাস ও সমাজ বাস্তবতা।' এ প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে সাহিত্য তথা উপন্যাসের গতি প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, জীবনবোধ, সমাজ সম্পৃক্ততা, সর্বোপরি জীবন ও সাহিত্যের যোগসূত্র। আমাদের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-ঐতিহ্য সহস্রাধিক বছর হলেও কথা সাহিত্যের ইতিহাস মাত্র দেড়শ বছর আগের। ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাবে উনিশ শতকের প্রথমদিকে গদ্যভাষা ও সাহিত্যের সূচনা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, জীবন সম্পর্কে সচেতনতায় মধ্যযুগের ধর্মভিত্তিক জীবন ও সাহিত্য থেকে যখন মানুষের উত্তরণ ঘটে তখন উপন্যাস সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে। যখন ধর্ম ও রাজা বাদশাহ-র অনুশাসন থেকে বের হয়ে এসে জীবনকে ব্যক্তি মূল্যায়ন করতে শেখে তখন সেই জীবন নিয়ে সাহিত্য রচনা শুরু হয়। জীবন সম্পর্কে মূল্যবোধ ও সচেতনতা সৃষ্টির আগে উপন্যাস রচনা সম্ভব ছিল না, কেননা উপন্যাসের প্রধান উপকরণ মানুষ ও সমাজ। এই সময়েই চর্যাপদ, রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব কবিতার ধর্মীয় আবেদন ও দেবদেবী নির্ভরতা থেকে মুক্ত হয়ে কবিতায় কবি ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিলেন, দেবদেবী ছেড়ে মানুষকে তাঁর কবিতার চরিত্র করলেন্। কবিতার শুধু চরিত্রই বদল হলো না আঙ্গিকেরও রূপান্তর ঘটলো। ইতালির কবি পেত্রার্কোর অনুসরণে মাইকেল মধুসূদন সৃষ্টি করলেন সনেট বা চর্তুদশপদী কবিতা, পয়ারের নিগড় ভেঙ্গে গঠিত হলো অমিত্রক্ষের ছন্দ, প্রবাহমান পয়ার ও মুক্তক ছন্দের কবিতা। এক পংক্তির ভাবের সীমাবদ্ধতা থেকে কবিতা মুক্তি পেয়ে নিঃশ্বাস নিল ভাবের প্রবাহমানতায়। উনিশ শতকের মাঝামিঝিতে সচেতন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও মুক্ত জীবনবোধ নিয়ে পরিণত গদ্যে রচিত হয় উপন্যাস, গল্প।

কথা সাহিত্যতে ব্যক্তির মুক্তি প্রয়াস আর এক ধাপ অগ্রসর হয়। এখানে জীবন আরো বিস্তৃত ও সংগঠিত। এ বিষয়ে প্রাবন্ধিক লিখেছেন–'কবিতার চেয়ে এ পরিধি আরও বিস্তৃত। এক প্রকরণ ছাড়া কবিতার প্রায় যাবতীয় লক্ষণ আত্মসাৎ করেও প্রাথমিক কথা সাহিত্যকে আরও অতিরিক্ত ভার বহন করতে হয়।' কবি তাঁর অনুভূতি, দৃষ্টিভঙ্গী ও উপলব্ধিকে সম্পূর্ণ নিজের মত করে তাঁর কবিতায় প্রকাশে করেন, তারপরেও কবিতার নতুন রূপ ও আঙ্গিক পরিবর্তনে তিনি নিজের জগৎকে নিজের রুচিমত গড়ে তুলতে পারেন।

কথাসাহিত্যিক বা ঔপন্যাসিক স্বাধীন, তিনি সন্ধান করেন ব্যক্তির স্বরূপ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন ব্যক্তি তার চারপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনার সাথে যুক্ত থাকে, সেখানে যুক্ত থাকেন আরো ব্যক্তি ও তার পারিপার্শ্বিক। তাদের নিয়ে সুন্দর করে, সুরসাল করে গল্পটিকে বর্ণনা করেন ঔপন্যাসিক।

কালক্রমিক ভাবে কাহিনী বিন্যাসে তাঁর গল্প গড়ে ওঠে। ঔপন্যাসিককে চারপাশের প্রেক্ষিতকে গুরুত্ব দিয়ে ব্যক্তির স্বরূপ সন্ধান করতে হয়। প্রাবন্ধিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এ সম্পর্কে বোকাচ্চোর প্রসঙ্গ এনেছেন। বোকাচ্চোকে সামন্তবাদের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়ে সাহিত্য জগতে পদার্পণ করতে হয়েছিল বলে তিনি ব্যক্তিকে সব মানুষের অবস্থান ও সব পরিবেশের ভেতর দিয়ে দেখেছিলেন। তখন সত্যকে প্রকাশ করার জন্য তাকে নানা ধরনের রুচি ও স্বভাবের মানুষকে তুলে ধরতে হয়। যা হয়তো তার নিজের রুচি বা স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কবির মত কথাসাহিত্যিকের ধর্মও সত্যকে অনুসন্ধান করা, তাই তাঁর পরিভ্রমণের পথ দীর্ঘ, বিস্তৃত ও বন্ধুর। ব্যক্তির সাথে জড়িত তার সমাজ, তার পারিপার্শ্বিক। তাই ব্যক্তির ভেতরটাকে উন্মোচন করতে বা তার স্বরূপ তুলে ধরতে ঔপন্যাসিক সমাজ ও তার পারিপার্শ্বিকতাকে বাদ দিতে পারেন না তাঁর মার্জিত রুচির পরিপন্থী হলেও। কবি ও কথাসাহিত্যিক উভয়েরই কাজ জীবনের গভীর সত্যকে প্রকাশ করা, আর গভীর সত্যকে প্রকাশ করতে হয় মানুষের জীবনযাপনের পদ্ধতি দিয়ে। এ ক্ষেত্রে লেখকের বক্তব্য–'সমাজের বাস্তব চেহারা তাকে তুলে ধরতে হয় এবং শুধু স্থির চিত্র নয়, তার ভেতরকার স্পন্দনটিই বুঝতে পারা কথাসাহিত্যিকের প্রধান লক্ষ্য।'

ব্যক্তির ক্ষোভ সামাজিক কাঠামোর ভেতরই থাকে, যেমন পেত্রার্কের সনেট। কিন্তু গদ্যে এই ক্ষোভ প্রকাশ শুধুমাত্র সামাজিক কাঠামোর ভেতর সীমাবদ্ধ থাকে না। যেমন বোকাচ্চোকে এই ক্ষোভ প্রকাশ করতে যেয়ে তাঁর সমকালীন সামন্ত প্রভু, তাদের সাঙ্গপাঙ্গ, ধর্মগুরু ও তাদের শিষ্যদের লাম্পট্য, অনাচার এবং ঐ সমাজের সুবিধাভোগী ও ক্ষমতাবান মানুষের ব্যভিচারের বিবরণ তুলে ধরতে হয়েছে।

আমাদের দেশে প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদীর শাসকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যে নীতি বা সংস্কার চালু করেন, তাকে ধর্মীয় মূল্যবোধের মর্যাদা দিয়ে নিরীহ সাধারণ মানুষকে শোষণ ও শাসনের রাস্তা প্রশস্ত ও নির্বিঘ্ন করে ক্ষমতাকে নিষ্কন্টক করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এদেশের শাসক চরিত্রও তার থেকে আলাদা ছিল না। কথা সাহিত্যে সমাজ বাস্তবতার প্রথম উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় বোকাচ্চির-র 'ডেকোমেরন'এ। বোকোচ্চিও কয়েকশো বছর ধরে চলে আসা সামন্ত প্রভু ও পুরোহিতদের চরিত্রের নেতিবাচক দিক পর্যালোচনা করে সুবিধাভোগী ও ক্ষমতাবান মানুষের ব্যভিচার নিয়ে 'ডেকারমেরন' রচনা করেন। মানুষের জীবনের সাথে সাহিত্যের রয়েছে নিগূঢ় সম্পর্ক। সত্যকার অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি উপন্যাসটি রচনা করেছেন। সত্যকার

অভিজ্ঞতা না থাকলে সাহিত্য বা উপন্যাস রচনা সার্থক হয় না। ইংরেজ সমালোচক ম্যাথু আর্নলড এই জন্য সাহিত্যকে Critism of life বলেছেন। কাব্য-উপন্যাস সৃষ্টিতে মানুষের জীবনে সংঘটিত গভীর, উদার এবং বৃহৎ অনুভূতির প্রয়োজন আছে। এই অনুভূতিকেই মোহিতলাল মজুমদার সাহিত্যের সত্য বা বাস্তব-প্রেরণার দিক বলে অভিহিত করেছেন।

আমাদের বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস শুরুই হয়েছে সমাজের বাস্তব বিষয়কে আশ্রয় করে। বাংলা সাহিত্যে এই সমাজ বাস্তবতার পরিচয় পাই উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে রচিত প্রথম উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল উপন্যাস, দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটক, সধবার একাদশী, কালী প্রসন্ন সিংহের হুতোম প্যাঁচার নকশা, 'মাইকেল মধুসূদনের দত্তের বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি সভ্যতা প্রহসনে। এরও আগে ভবানী চরণ বন্দোপাধ্যায় তাঁর কলিকাতা কমলালয় (১৮২৩) নববাবু বিলাস (১৮২৫) নববিবি বিলাস (১৮৩২) প্রভৃতি রচনার মধ্যে নতুন কলকাতা শহরের উঠতি ভদ্রলোক ও সামন্ত প্রভুদের চরিত্র তুলে ধরেছেন। কলকাতার নতুন সমাজ সম্পর্কে এঁদের সচেতনতা ও যথাযথ মূল্যায়নে পরবর্তী প্রজন্ম কলকাতার তৎকালীন ইতিহাস অবহিত হয়েছেন। এঁরা সবাই যে প্রগতিশীল ছিলেন তা নয়। রক্ষণশীল ভবানীচরণ, প্যারীচাঁদ মিত্র বিধবা বিবাহ আন্দোলন, সতীদাহ প্রথা নিবারণে বিরোধিতা করেছেন, দীনবন্ধু মিত্র ইংরেজ ভক্ত ছিলেন। সামাজিক পরিবর্তন বা সংস্কারে এঁদের সক্রিয় সমর্থন ছিল না কিন্তু সমাজের বাস্তবতাকে এঁরা তুলে ধরেছিলেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্য বাঙালির আচার-ব্যবহার, আশা বিশ্বাস, সমাজের চিরাচরিত প্রথা এবং ন্যায়-অন্যায়ের চিত্ররূপ, আর এগুলো উপন্যাসেরও উপকরণ বা বৈশিষ্ট্য। সাহিত্যের দিক দিয়ে এর সব রচনা শিল্পসম্মত না হলেও বাংলা কথাসাহিত্যে সমাজ বাস্তবতা তুলে ধরার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এ সবের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে।

মোহিতলাল মজুমদারের মতে কাব্য ও উপন্যাসে এমন অনেক ঘটনা থাকে, যা সমাজের নিয়মেই ঘটে এবং সেই নিয়ম প্রায়ই চরিত্র বিশেষের জীবনে ট্রাজেডি বা কমেডির কারণ হয়। আর এগুলোর জন্যই চরিত্রের সার্থক বিকাশ হয়। পরবর্তী সময়ে ইউরোপের সাহিত্যে সমাজ বাস্তবতার প্রতিফলন লক্ষণীয়, এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস দন কিহোত। সামন্ত আমলের নাইটদের বীরত্বের অন্তঃসারশূন্যতাকে লেখক প্রকাশ করেছেন। প্রাবন্ধিক লিখলেন– 'ট্রাজেডির নায়ক রাজা বা রাজপুত্র মানেই যে অবিচল অটল ও স্থির সংকল্প কোনো ব্যক্তিত্ব নয় সেই কথা জানিয়ে দেন দল কি হোতের

সমসাময়িক এক রাজপুত্র। ডেনমার্কের যুবরাজের দ্বিধা, সিদ্ধান্তহীনতা ও দোদুল্যমানচিত্ত কোনো উদ্ভট বা উটকো বিষয় নয়। একিলিস কী হেকটর কী অডিসিয়ূসের স্বভাবে টলায়মানতা কল্পনা করা যায় না। এই দ্বিধা কিন্তু যতটা হ্যামেলেটের তার চেয়েও বেশি ডেনমার্কের যুবরাজের। তাঁর সংলাপে সামন্ত সমাজের প্রধান প্রভুদের পাথরের প্রাসাদে চিড় ধরার আওয়াজ। প্রাসাদের ভিত কাঁপিয়ে ঐ সংলাপ ব্যক্তির দিকে আমাদের মনোযোগী করে তোলে। কথাসাহিত্যে সমাজবাস্তবতা এইভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। সমাজ ফুঁড়ে ব্যক্তি আসে, সমাজ ব্যবস্থা তাই রক্তমাংস নিয়ে উপস্থিত হয়।' আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মনে করেন নর-নারীর প্রেম ভালবাসাও সমাজ প্রেক্ষিত। ইউরোপের তৎকালীন বণিকদের দাপট ও ইহুদিদের বিবাদ-বিদ্বেষ প্রকাশ করবার জন্যই যেন শেকসপিয়র মার্চেন্ট অভ ভেনিস এ নরনারীর প্রেম দেখিয়েছেন অথবা নরনারীর প্রেমের ভেতর দিয়ে তিনি সেই সময়ের বণিকদের দাপট ও ইহুদি বিদ্বেষকে উপস্থাপন করেছেন মূলত সামাজিক অবস্থা তুলে ধরাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, শাইলকের চরিত্রের ভেতর দিয়ে তিনি তা দেখিয়েছেন, তার সাথে তিনি একটি গল্পকে যুক্ত করেছিলেন। মূল লক্ষ্য সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতি। সমাজকে পাশ কাটিয়ে ব্যক্তি চরিত্র বা কাহিনীকে যে সাহিত্যে রূপ দেওয়া যায় না ষোড়শ শতকের ইতালীয় ও ইউরোপীয় সাহিত্যেই তার প্রমাণ রয়েছে। লেখক প্রগতিশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল যাই হোন না কেন সমাজ বাস্তবতাকে এড়িয়ে কারো পক্ষেই সাহিত্য তথা উপন্যাস লেখা সম্ভব নয়। সমকালীন সমাজের বাস্তব অবস্থাকে বোঝানোর জন্য ঔপন্যাসিক অতীত ইতিহাসকেও আশ্রয় করেন। সমকালীন সমাজের অবস্থানকে অনুধাবন বেশি সহায়ক হবে মনে করেই ঔপন্যাসিক অতীতকে প্রেক্ষিত করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী, টলস্টয়ের ওয়ার এণ্ড পিস ইত্যাদি।

সমাজের সাথে সাহিত্যের বিরোধ এই যে, সমাজে থাকে সমষ্টির ধর্ম, আর সাহিত্যে ব্যক্তির ধর্মই প্রধান। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বই সাহিত্য তথা উপন্যাসের শক্তি। সাহিত্যের প্রেরণা যদি সামাজিকের রীতি নীতির অনুগামী না হয় তবে তাতে সমাজের মানুষের মন বিচলিত হয়। জনৈক সমালোচক বলেন, যে সাহিত্য সমাজ মনকে পীড়িত করে তা সাহিত্য নয়। সমাজ, সাহিত্য ও সমাজ বাস্তবতা প্রসঙ্গে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের উপন্যাস সম্পর্কে অভিমত অভিব্যক্তি উপস্থাপন করেছেন। বিশিষ্ট সমাজ সচেতন বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক, সামাজিক উপন্যাস লিখেছেন। সামাজিক

বিবর্তনকে তিনি সমর্থন করতে পারেননি। বিধবা নারীর প্রেমকে তিনি গুলি করে হত্যা করেছেন, নারীর পতিপ্রেম পুরুষের পদপিষ্টে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। পতিদেবতার সেবায় নিবেদিত নারী তাঁর দৃষ্টিতে মহান। দেবী চৌধুরানী উপন্যাসের প্রফুল্লের ইস্পাত, ঋজু নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্বে উদ্দীপ্ত হয় বিপুল সংখ্যক মানুষ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রচণ্ড শক্তি তার, সেই নারীশক্তিকেও কাপুরুষ, অপদার্থ স্বামী ও নিষ্ঠুর অবিবেচক শ্বশুরের সেবায় নিয়োজিত দেখিয়ে তিনি নারীত্বের সার্থকতা দেখিয়েছেন। প্রাবন্ধিকের মতে নারীর স্বভাবসুলভ হৃদয়ের আবেগ ও ভালবাসার করুণ পরিণতি দেখিয়ে বঙ্কিম চন্দ্র শিল্পসৃষ্টির ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। সামাজিক চলমানতাকে এড়িয়ে তিনি ব্যক্তির বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরের গভীরতর চেতনায় যে নীতিজ্ঞান ছিল, সামাজিক আচার-ব্যবহার ও বিধি বিধানের সংস্কার নীতিজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করেছিল বলেই সম্মুখের প্রেমরূপ শীতলজল রোহিনীকে পান করবার অধিকার দেননি। মানুষের জীবন প্রবাহকে তুলে ধরাই উপন্যাসিকের কাজ কিন্তু নীতিজ্ঞানের কাছে তা বাধাপ্রাপ্ত হলে সমাজের ছন্দপতন ঘটে। সামাজিক সংগ্রাম ও কর্ম, দ্বন্দ্ব ও বিশ্বাসের ভেতর দিয়ে সমাজের রীতি ও নিয়মের অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা থেকে যায়। সমাজ বাস্তবতা বঙ্কিমের প্রায় উপন্যাসেই রক্ষিত হয় নি, কিন্তু মানবতা বিকাশ বিরোধী মতবাদ কপালকুণ্ডলাতে ছিল না বলেই এই উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রের স্বাভাবিক গতি বাধাপ্রাপ্ত হয় নি। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিম নীতিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন, সমাজের ঘোরতর অনাচার হবে বলে উপন্যাসে মানবিক চৈতন্যের বিকাশকে বাধা দিয়েছেন কিন্তু সংখ্যা গরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষের উপর নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ মতবাদ প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা পত্তন এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের ফলে প্রাচীন সামন্ত পরিবার এবং রাজবংশ গুলো বিলুপ্ত হয়ে ভূমি স্বত্তাধিকারী এক নতুন জমিদার সম্প্রদায় এবং চাকুরীজীবী শ্রেণির উত্থান হয়। সামন্ত সমাজের অবসানে বুর্জোয়া শক্তির উত্থানের ফলেই ইউরোপীয় সাহিত্যে ব্যক্তির পরিচয় প্রাধান্য লাভ করে প্রাবন্ধিক এই মতকে সমর্থন করেছেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সমৃদ্ধ বুর্জোয়া সমাজে যে জীবন চাঞ্চল্য ছিল তার ফলে উপন্যাসে সেই জীবনের বৈচিত্র্য উন্মোচিত হয়েছে। ব্যক্তির প্রাধান্যের মধ্যে দিয়ে ইউরোপের উপন্যাসে সমাজ বাস্তবতাই প্রতিফলিত হয়েছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে ইউরোপীয় বুর্জোয়া সমাজে যে জোয়ার এসেছিল বাংলাদেশের সংস্কারশাসিত সমাজে তা বাধাপ্রাপ্ত হয়। আঠার

শতকের শেষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) চালুর ফলে দেশ এক নতুন সামন্ত সমাজের উদ্ভব হয়। ফলে কলকাতায় এক ধনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। ১৮-১৯ শতকে ইংরেজদের মোসাহেবি করে, ইংরেজদের মুনশি হয়ে, তাদের পণ্য উৎপাদনের কাঁচামাল যোগান দিয়ে, কেউবা লবণ ও জাহাজের ব্যবসা করে অপ্রত্যাশিত ধন সম্পদের মালিক হন। এই সুবিধাপ্রাপ্ত এলিটরা নিজেদের আভিজাত্যে গর্বিত হলেন কিন্তু সমকালীন সমাজের ভাবধারাকে সংরক্ষণে সক্ষম না হয়ে ভারতীয় প্রাচীন বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে পুনরুত্থিত করার প্রচেষ্টায় তারা সক্রিয় হলেন, তাই প্রাথমিক যুগের উপন্যাসে সমাজের গতিধারা লক্ষ্য করা যায় না।

বাংলা সাহিত্যে সমাজ বাস্তবতার স্বরূপ উদঘাটনে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, মানিক বন্দোপাধ্যায়ের উপন্যাসের সমাজ বাস্তবতার বৈশিষ্ট্য নিয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনায় তার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে প্রথম ব্যক্তির বিকাশ ঘটে। তাঁর উপন্যাসেই প্রথম মানুষ ও জীবনের বিকাশ স্থান লাভ করে। চোখের বালি (১৯০১ খ্রি:/১৩০৮ বাং) উপন্যাস রচনার সময় থেকেই সমাজ মানস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চেতনার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের শুরুতে বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ সুস্পষ্টভাবে সমাজে আত্মপ্রকাশ করে। সমাজের সকল কর্ম ও প্রতিষ্ঠানে এই প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণির আধিপত্য। এই প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত সমাজ পরিবেশেই রবীন্দ্রনাথের অবস্থান, তাই মধ্যবিত্ত সমাজের বিচিত্র সুখ দু:খ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ বেদনা, আদর্শের বিরোধ, ব্যক্তি স্বাধীনতা, স্বজাত্যবোধ রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাসের প্রধান বিষয়। মধ্যবিত্ত সমাজ জীবনের ভেতরকার দ্বন্দ্ব, সমস্যা ও বিরোধগুলোকে রবীন্দ্রনাথ সামাজিক চেতনার বাস্তবনিষ্ঠতায় তাঁর গল্প উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। তাই তাঁর উপন্যাসে বাস্তব অনুভূতি প্রবল। তাঁর উপন্যাসে গভীরতর বাস্তবনিষ্ঠতার কারণ সামাজিক চেতনা। তাই রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ক্রমবিকাশমান ধারায় বিকশিত হয়েছে। সেই জন্য প্রাবন্ধিক বলেছেন 'রবীন্দ্রনাথই এমন জীবন ও মানুষ তৈরি করেন যাদের গড়ে ওঠা আছে, যাদের জীবনে বিকাশ এবং যারা সমস্যায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রেডিমেড সমাধান খুঁজে পায় না।' এ সম্পর্কে চোখের বালি (১৩০৮), গোরা (১৩১৪-১৫)' ঘরে বাইরে (১৩২২), যোগাযোগ (১৩৩৪-৩৫) ইত্যাদি উপন্যাস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিজাত সমাজ বাস্তবতার উল্লেখ করেছেন। গোরা উপন্যাসে সমগ্র শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের একটি বিশেষ যুগের

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা রূপ লাভ করেছে। এই উপন্যাসে সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার সাথে মানুষের সম্পর্ককে রবীন্দ্রনাথ যুক্ত করেছেন। গোরা উপন্যাসের ব্যক্তিকেন্দ্রিক চরিত্র বৃহত্তর সামাজিক ও জাতীয় জীবনের সাথে সংযুক্ত। স্বদেশী যুগে আমাদের জাতি, ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের যে জীবনাদর্শ ও জীবনদর্শন গড়ে ওঠে, সেই বিচিত্রভাব ও চিন্তাধারা নিয়েই 'গোরা' উপন্যাসের চরিত্রগুলো গড়ে উঠেছে। গোরার আচরণ ও ব্যবহারে তিনি তাঁর ভাবাদশের্র স্বরূপ সন্ধান করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক সামাজিক চিন্তা ও কর্মধারার আলোকে গোরা চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, এই চরিত্র সম্পর্কে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিশ্লেষণ এরকম- 'সে যতই বলিষ্ঠ চিত্ত হয়, তার সংকট ততই তীক্ষ্ম হতে থাকে। স্বদেশের পরিচয় লাভের জন্য তার ব্যাকুলতা একদিকে তাকে যেমন গৌরব দেয় অন্যদিকে তার অসহায়ত্ব প্রকট করে তোলে।'

১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার পত্তন এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের ফলে প্রাচীন সামন্ত পরিবার এবং রাজবংশগুলো বিলুপ্ত হয় পরিবর্তে ভূমির স্বত্ত্বাধিকারী এক নতুন জমিদার এবং ইস্ট ইন্ডিয়ার কোম্পানীর অধীনে নানা চাকরি এবং জাহাজ ও লবণের ব্যবসা করে সমাজে এক ধনিক শ্রেণি গড়ে ওঠে- ইতিহাসের এই প্রেক্ষাপটকে অর্থাৎ সামন্ত সমাজের বিলুপ্তি ও নতুন বণিক সমাজের উত্থান 'যোগাযোগ' উপন্যাসের পটভূমি। নতুন এই ধনিক সমাজে যে বাবু কালচার গড়ে ওঠেছিল, তার প্রতি রবীন্দ্রনাথের সমর্থন না থাকলেও মধুসূদনের চরিত্র সৃষ্টিতে সমাজ জীবনের অন্তর্নিহিত বিরোধ ও দ্বন্দ্বকে তিনি যোগাযোগ উপন্যাসে যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন। নতুন বণিক সমাজের মানুষের মধ্যেও সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে মাথা চাড়া দিয়েছিল- যোগাযোগের মধূসূদনের মধ্য রবীন্দ্রনাথ সমাজের সেই গভীরতর বাস্তবতাকেই দেখিয়েছেন।

মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ, সমসাময়িক কালের ভাবাদর্শ এবং বিভিন্ন কর্ম ও চিন্তাপ্রবাহ রবীন্দ্রনাথের জীবনে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল তারই প্রকাশ চোখের বালি উপন্যাসে। সমাজ জীবন আশ্রিত মনস্তত্ব বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস চোখের বালি। মনস্তাত্ত্বিক সংকটে সৃষ্ট বিনোদিনী, আশা, মহেন্দ্র, বিহারী। প্রাবন্ধিক মনোবিশ্লেষণের ধারায় এই সৃষ্ট চরিত্র সম্পর্কে লিখেছেন- 'চোখের বালির মনস্তাত্বিক সংকট জীবন্ত ব্যক্তিকে নির্মাণ করে।' আনুপূর্বিক ঘটনাগুলো ঘটেছে চরিত্রগুলোর মনোবিকাশের ভেতর দিয়ে। চারজন চরিত্রের মনের নানা চিন্তা ও ভাবের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বাস্তব অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে।

বিশ শতকের সূচনা থেকেই বাংলাদেশের সমাজ জীবনের নতুন জটিলতা, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, স্বদেশী ভাবধারার গতি প্রকৃতি রবীন্দ্র ধ্যান-ধারণায় বিশেষ রাজনৈতিক বিশ্বাস সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক সেই তৎপরতা নিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে বাংলা সাহিত্যে প্রথম রাজনৈতিক উপন্যাস। এই উপন্যাসের পটভূমি সমাজ। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে বাংলাদেশে যে দেশাত্মবোধ জেগেছিল, তার ফলে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল তার ভেতরে ছিল মস্ত ফাঁক। রবীন্দ্রনাথ তার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। দেশাত্মবোধের নামে কোন সংকীর্ণতা ও মিথ্যাকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। দেশাত্মবোধকে তিনি মানবধর্ম হিসেবে দেখেছেন। কলকাতার উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির দেশাত্মবোধের সংকীর্ণতার মধ্যে যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল সেই বিরোধ উচ্চবিত্ত শ্রেণির নরনারীর ব্যক্তি জীবনকেও সংকটময় করে তুলেছিল, তাই এই উপন্যাসের উপজীব্য।

রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসগুলো সম্পর্কে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিশ্লেষণধর্মী সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের উদ্দেশ্য দেশের সামাজিক চেতনা কীভাবে উপন্যাসের বিষয়ের সাথে যুক্ত হয়েছে। তারপর তার সীমাবদ্ধতা নিয়েও লিখেছেন– 'তাঁর উপন্যাসে ব্যক্তির ঠিকানা বারবার বাধা পায়, তাদের সীমাবাদ্ধতা প্রায়ই স্পষ্ট। ব্যক্তির বিকাশে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও সমর্থন থাকা সত্ত্বেও এরকম হয়। এর কারণ এই যে, ব্যক্তি তার উপযুক্ত প্রেক্ষিত পায় না। যে সমাজ বাস্তবতার পরিচয় তাদের সমস্যা ও দ্বন্ধকে এবং সংকট ও পরিণতিকে তাৎপর্য দেবে তা প্রায়ই ঝাপসা এবং তার পরিসরও খুব সীমিত। সমাজ তার রক্ত মাংস নিয়ে হাজির হয় না বলে ব্যক্তি অসম্পূর্ণ থাকে।' লেখক সাহিত্য ও সমাজের সম্পর্কের উপর গল্প উপন্যাসে চরিত্র ও কাহিনী বিকাশের মূল্যায়ন করেছেন। উপন্যাসের শুরু থেকেই এই সত্যটিকে সাহিত্যিকেরা অবলম্বন করেছিলেন। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্র উপন্যাস পর্যালোচনায় বলেছেন সমাজ-বাস্তবতার প্রেক্ষিত স্থাপন করার জন্যই তাঁর উপন্যাসে আধ্যাত্মিক সংকট নেই। তাঁর উপন্যাসের কাহিনী কবিতার মত সীমা থেকে অসীমের দিকে যাত্রা করেনি বা তাঁর গান ও কবিতার আধ্যাত্মিকতা উপন্যাসে প্রবেশ করেনি।

প্রথিতযশা কথা শিল্পী শরৎচন্দ্রকে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ভিন্ন দৃষ্টিতে এখানে উপস্থাপন করেছেন। আঠার শতকের শেষভাগের ফরাসি বিপ্লব, শিল্পবিপ্লবের প্রভাব এদেশের অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা করে, তার ফলে উনিশ শতকেই ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষ বিদেশি শিল্প বাণিজ্য এবং শিক্ষাদীক্ষার কল্যাণে ইউরোপীয় ভাবধারার জোয়ারে প্লাবিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধ উত্তর পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ

করে মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, নৈতিক বিপর্যয় ও নানা বিশৃংখলা। ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে যেমন পাশ্চাত্যের শিক্ষা সংস্কৃতির দ্বার উন্মুক্ত হয় তেমনি পৃথিবীব্যাপী সমস্যা সংকটেরও অংশীদার হয়। উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে এদেশে রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে যে পরিবর্তন আসে তা তার সাংস্কৃতিক জীবনেও প্রভাব ফেলে। এই পরিস্থিতিতে বর্ণ হিন্দু সমাজের যে আলেখ্য কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র রচনা করেন তা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের দৃষ্টিতে গতিহীন। কেননা সমাজ অনড় নয়। প্রাচীনকালের মুনি ঋষি বা ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসক গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যে সব নিয়মনীতির বেড়াজালে শাসিত জনগণকে শোষণের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র তার ভেতরে সীমাবদ্ধ থেকেও তাঁর প্রগতিশীল উপলব্ধিকে উপন্যাসে রূপদান করেছিলেন। পরিবর্তিত বিশ শতকের নবজাগরণের সমাজকে কিংবা বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে অগ্রসরমান সমাজকে তিনি তাঁর উপন্যাসে আনেননি। প্রাবন্ধিক এ বিষয়ে মন্তব্যে করেন– 'তাই সমাজবাস্তবতা যাকে বলি তা তাঁর ধরাছোয়ার বাইরেই থেকে গেল। সমাজ বাস্তবতার এই অপরিহার্য প্রেক্ষিতের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় পর্যন্ত।'

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সমাজের সার্থক রূপায়ণ দেখেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে এদেশের উপন্যাস সাহিত্যে আধুনিক যুগের শুরু। আধুনিক যুগে বাংলা উপন্যাসে বিষয় পরিধির বিস্তৃতিলাভ ঘটেছে। ভাববস্তুতেও এসেছে অনেক বৈচিত্র্য। আধুনিক ঔপন্যাসিকদের অন্যতম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নীলকণ্ঠ, রাইকমল, কবি, ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, মন্বন্তর, হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, আরোগ্য নিকেতন প্রভৃতি উপন্যাসে তাঁর সচেতন শিল্পীমনের বহিঃপ্রকাশ। তাঁর সমসাময়িক লেখকেরা ব্যক্তি সত্তাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তিনি সমাজকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই তাঁর ধাত্রীদেবতা, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, মন্বন্তর প্রকৃত পক্ষেই সামাজিক উপন্যাস। নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তিনি মানুষের জীবনকে দেখেছেন। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কীভাবে পুঁজিবাদী সমাজ, তার থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজের দিকে এগিয়ে গেছে তার পরিচয় রয়েছে কালিন্দী উপন্যাসে। রাঢ় অঞ্চলের শুষ্ক লাল মাটির মানুষের প্রাণশক্তির জয়গান তিনি গেয়েছেন। বেদে, সাপুড়ে, যাত্রাওয়ালা, মোটর-মেকানিক রাজমিস্ত্রি, জেলের কয়েদি– কত বিচিত্র জীবনযাত্রাই না তাঁর উপন্যাসের কাহিনীর সাথে যুক্ত হয়েছে। রাঢ়ের নিম্নশ্রেণির হিন্দুর জীবনধারা বর্ণিত হয়েছে 'হাঁসুলি বাঁকে উপকথা'য়। বাংলার দুই সাংস্কৃতিক জীবনধারা বৈষ্ণবগীতি কবিতা ও কবিগান, তাদের জীবন নিয়ে রচিত হয়েছে রাইকমল ও

কবি। এই সব কারণেই আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বলেছেন– 'গতিশীল সমাজ বাস্তবতা তাঁর উপন্যাসের প্রেক্ষিত।' এর কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন গ্রামের ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত প্রভু থেকে শুরু করে নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী চাষা পর্যন্ত তাঁর উপন্যাসের চরিত্র হয়েছেন। সমাজের চলমান পরিস্থিতিকে তিনি শনাক্ত করে উপন্যাসের পটভূমি নির্বাচন করেছিলেন। নিজের নিজের স্বভাব অনুযায়ী চরিত্রগুলোকে তিনি রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত শ্রেণির মানুষের এবং নিম্নবিত্ত কৃষকের ক্ষোভ বঞ্চনার বাস্তব চিত্র তাঁর উপন্যাসে উঠে এসেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার পত্তন এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের ফলে ভূমির স্বত্ত্বাধিকারী এক নতুন জমিদার সম্প্রদায় এবং চাকুরিজীবী নানা বৃত্তিধারী এক মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে ওঠে যারা অপ্রত্যাশিত ধনসম্পদে স্ফীত হয়ে ওঠেন। কিন্তু বিশ শতকের দুই তিন দশক থেকে তাদের অবক্ষয় শুরু হয়। মধ্যবিত্ত সমাজের অনেকেই সংকটে পড়েন। মধ্যবিত্তের শোষণ ও নির্যাতনে শ্রমজীবীর মধ্য অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। এই নিম্নবিত্তের অসন্তোষকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে মধ্যবিত্ত, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত এবং পুঁজিবাদীরা কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে অহিংস স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করেন– এই রাজনৈতিক আন্দোলনকেও তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য করেছেন। ইতিহাস, জীবন এবং সমাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞতার জন্যই তাঁর উপন্যাস হয়েছে বাস্তবধর্মী।

চিন্তা চৈতন্যে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমধর্মী লেখক। দেশ, সমাজ ও মাটির প্রভাবে তাঁর ভেতরকার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। হাজার রকমের বিরোধ দ্বন্দ্ব আত্মসাৎ করে তিনি বাংলাদেশের একজন স্বাতন্ত্র্য লেখক। মানুষ, মানুষের জীবন ও সমাজের বিস্তার ঘটেছে তাঁর সাহিত্যে। মানুষের অনুভূতি, কষ্ট, যন্ত্রণা, সংগ্রাম, সংকল্পকে শাখা প্রশাখায় ছড়িয়ে তিনি ঘটনা ও চরিত্রের বিশ্লেষণ করেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সাহিত্যে ভাবপ্রবণতা ছিল না। দু'জনেই সাহিত্যে প্রেম ভালবাসা দয়া মায়া মমতা বিশ্বাস আস্থার পাশাপাশি নিষ্ঠুরতা, আক্রোশ, ঘৃণাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁদের বিশ্বাসে যখন সমসাময়িক কালের শোষণ ও শাসনের আঘাত এসেছে তখন মানসিকতায় প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছেন। বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গির বস্তুবাদী মানিক বন্দোপাধ্যায়ের রচনাবলীর মধ্যেই তাঁর জীবনদর্শনের সার্থক রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়, মনুষ্যত্ব ও মানবতাবাদের জয় তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের ভাঙ্গাগড়ার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব তাঁর সাহিত্যে পরিপুষ্ট হয়েছে। আখতারুজ্জামান

ইলিয়াসও নগর জীবনের পঙ্কিলতা ও রূঢ়তার ভেতর দিয়ে সমাজতত্ত্ব ও শ্রেণি চেতনার দ্রোহকে তুলে ধরেছেন যদিও পরবর্তীকালে তা স্পষ্ট রূপ পায়নি।

সত্তর আশির দশকে গ্রামীণ জীবনে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা মানুষের অস্তিত্বমূলে আঘাত করে আর নাগরিক জীবনে মনস্তাত্ত্বিক সংকট ব্যক্তিকে বিপর্যস্ত করে তোলে, সামাজিক এই প্রেক্ষাপটে তাঁর গল্প উপন্যাসের চরিত্রে এবং প্রবন্ধে বিষয়ের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার চেয়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রতিক্রিয়াই বেশি হয়েছে। প্রাবন্ধিকের মতে বিশ শতকের তিন ও চার দশকের ব্যক্তি ও সামাজিক অবক্ষয়কে মানিক বন্দোপাধ্যায় সফল ভাবে তাঁর কথাসাহিত্যে তুলে ধরেছেন। সমাজ ও ব্যক্তির অবক্ষয়ের জন্যই সমাজ থেকে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মানিক সার্থক রিয়ালিস্ট শিল্পী, তিনি সমসাময়িক কালের মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের নির্মম ট্রাজেডিকে সত্যনিষ্ঠ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রাবন্ধিক মানিকের উপন্যাসের বিশ্লেষণ করতে যেয়ে লিখেছেন- 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র শশী নিজের গ্রামে নিজেকে উপযুক্ত অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। তার মানবিক বোধসমূহ সংকটে পড়লে নিজের অস্তিত্বের তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। পদ্মানদীর মাঝি কুবের বেঁচে থাকার সংগ্রামে রক্তাক্ত হয়েও এই বিচ্ছিন্নতার শিকার। যে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ সে, যাদের প্রতিদিনকার জীবনযাপনের সে একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাকেও কিনা পালিয়ে যেতে হয় অপরিচিত ও অনিশ্চিত ময়নাদ্বীপের উদ্দেশ্যে। এদের সংকট ও সমস্যা সবই উপস্থিত হয়েছে সমাজ বাস্তবতার প্রেক্ষিতে। একথা ঠিক যে গ্রামের খুঁটিনাটি ছবি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আঁকেননি। এক এক জন সাহিত্যিক এক এক ভাবে সমাজ প্রেক্ষিতকে সাহিত্যে নিয়ে আসেন। সমাজ থেকে শশীর বিচ্ছিন্নতা বা অচেনা, শস্যশূন্য হিংস্র জীবজন্তুবেষ্টিত প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাভরা ময়নাদ্বীপে কুবেরের পলায়নের যে পটভূমি পাওয়া যায় তাতেই গাওদিয়া গ্রাম এবং পদ্মানদীর তীরের সমাজ জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষ ও সমাজকে চিত্রিত করে তিনি সমাজ প্রেক্ষিতের রীতি বাস্তবায়ন করেছেন। নিম্নবিত্ত ও সর্বহারা সমাজের ক্ষয়ক্ষতি, মনুষ্যত্বের অপচয়, হতাশা, বিষাদ ও গ্লানি তাঁর যেসব উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে তা সমাজ বর্হিভূত নয়, সামাজিকের জীবনের সংঘটিত ঘটনার অংশ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মার্কসবাদ চেতনার মূল সমাজ বাস্তবতাবোধ। মার্কসবাদের চেতনায় তিনি সমাজের অবক্ষয়কে খুঁজেছেন এবং অবক্ষয় প্রতিরোধের উপযুক্ত সমাজ পদ্ধতি হিসেবে মার্কসবাদকেই মনে করেছেন। প্রচলিত সমাজ কাঠামোর উপর তাঁর বিতৃষ্ণা ছিল। সরদার ফজলুল করিম

বলেছেন জীবন জিজ্ঞাসার টানে অনিবার্য ভাবেই মানিক মার্কসবাদে পৌঁছেছিলেন। তাঁর চেতনায় ছিল বিদ্রোহের সুর। বাস্তব ভূমিতে তিনি জীবনকে দেখেছেন, জীবনের জটিলতাকে অনুভূতির গভীরতায় দেখেছেন আটপৌরে জীবনযাত্রার শৃঙ্খলার মধ্যে নয়। জীবনের জটিলতার মধ্যে বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে জীবনের রহস্য অনুসন্ধান করেছেন। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের সাহিত্যে বিশেষ করে পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে আছে সমাজের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার সাথে বৈজ্ঞানিক জীবনদর্শন। আবেগ ও ভাববিহ্বলতাকে অতিক্রম করে সত্যের অনুসন্ধান করেছেন তিনি। এই উপন্যাসে শিল্পের চেয়ে জীবনের বাস্তবতাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, তাই হোসেন মিয়া তার সাহস, দুঃসাহস, চালাকি, ফন্দি ফিকির নিয়ে পরিণতির দিকে এমনভাবে এগিয়েছে যে তাকে আর অপরিচিত মানুষ বলে মনে হয় না আমাদের সমাজে হোসেন মিয়াদের আধিক্য না থাকলেও অভাব নেই। আবেগ বর্জিত ও পক্ষপাত শূন্য হয়ে তিনি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। অর্থনৈতিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির চরিত্রের পরিবর্তন হয়– এ বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন বলেই বিজ্ঞানী ও সমালোচকের দৃষ্টিতে সবকিছুর পরিবর্তনকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। বাংলা কথাসাহিত্যে তিনি মানবজীবনের এক অনালোকিত অধ্যায়কে উন্মোচন করেছেন তাই তাঁর কথাসাহিত্যে সমাজ দেশ কাল ব্যক্তি বাস্তবভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

ভাষা, চরিত্র সৃষ্টি, মনোবিশ্লেষণ, সমাজের সাথে ব্যক্তি, ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক নিয়ে মানিকের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতাই তাঁর উপন্যাসে স্থান পেয়েছে প্রাবন্ধিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে শুধুমাত্র মনোবিকলনের সার্থক রূপকার বলেননি। মানিক শুধু স্বার্থপরতা ও মানসিক বৈকল্যের চাপে মানুষের ভানকৃত সমাজ ব্যবস্থাকে ধিক্কার দেননি। তিনি মানুষ ও সমাজের প্রকৃত বিশ্লেষণও করেছেন এবং ঐ সমাজ পরিবর্তনেরও চেষ্টা করেছেন। এতে তাঁর সাহিত্যের শিল্পসৌকর্মের ঘাটতি হয়েছে কিন্তু সমাজবাস্তবতাকেই সাহিত্যের উপজীব্য করেছেন। উপন্যাস রচনার চিরাচরিত প্রকরণ ছেড়ে সমাজভাবনা প্রকাশের জন্য তিনি নতুন প্রকরণের অনুসন্ধান করেছেন এবং প্রতিটি উপন্যাসে নতুন ভঙ্গি গ্রহণ করেন। প্রাক মার্কসবাদী চরিত্র ও মানবিকতা নিয়ে লেখা সাহিত্যের শিল্পগুণ উত্তর-মার্কসবাদী উপন্যাসে রক্ষিত হয়নি কিন্তু বাংলা কথাসাহিত্যে সমাজবাদী বিশ্লেষণ তাঁর হাতেই সবচেয়ে সফল হয়েছে।

প্রাবন্ধিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর অনুসন্ধানী বিশ্লেষণে আধুনিক সাহিত্য, সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ বুর্জোয়া ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিমত দিয়ে উপন্যাসের সাথে তার যোগসূত্রের সফলতা ও ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা

করেছেন। সামন্তযুগের অবসান ও পুঁজিবাদী বুর্জোয়া সমাজের বিকাশের সময়ে শিল্প সাহিত্যের নতুন প্রকরণের অন্বেষণে মহাকাব্যের পরে সনেটের সৃষ্টি। কিন্তু সনেটেও যখন ব্যক্তি স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় না তখন কথা সাহিত্যের মধ্যে মানুষ মুক্তির পথ খুঁজে পান। অনেক প্রতিবন্ধকতার শেষে সমাজ ও মানুষের, সামাজিক ও ধর্মীয় চেতনার মূল্যবোধে ব্যক্তির বিকাশ নিয়ে উপন্যাসের সৃষ্টি। মধ্যযুগীয় সামন্তব্যবস্থার অবসানের পরে এদেশে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটে। বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পরে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়, তাতে ব্যক্তির বিকাশ ঘটে। বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তির অনুপ্রবেশ ঘটান মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ব্যক্তির প্রতিষ্ঠার জন্য কবিতার সনাতন আঙ্গিক উপযুক্ত ছিল না বলেই তিনি ছন্দের গতানুগতিকতা ভেঙ্গে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করেন। আধুনিক সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তখন দেবদেবী ছেড়ে মানুষ হয় সাহিত্যের উপকরণ। নাগরিক মধ্যবিত্তের হাতে ব্যক্তির সফল রূপায়ণে আধুনিক সাহিত্যের সৃষ্টি ও উৎকর্ষ।

দাসপ্রথা অমানবিক, ঘৃণ্য কিন্তু তাদের শ্রমের ফলভোগী শিল্পীর হাতে সাহিত্য-শিল্প-দর্শন গড়ে উঠেছে। ক্রীতদাসের প্রতি মমত্ববোধে যদি শিল্পী তাঁর সৃষ্টিকর্মকে বন্ধ করে দিতেন তবে তা হতো আত্মবিনাশী অঘটন। আর তা সম্ভব হয় বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার উত্থানে, সামন্ত মূল্যবোধকে অস্বীকার করার কারণে। এই বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা সভ্যতার ইতিহাসে বড় অবদান রেখেছে। চিন্তার জগতে এনেছে নতুন বিশ্লেষণ। বুর্জোয়া শিল্প সাহিত্যকে অস্বীকার করা মানে মানুষকে বড় অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। কিন্তু আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়া মূল্যবোধকে মূল্য দেয়া হয়, প্রাবন্ধিক দেশের সমসাময়িক রাজনীতি সম্পর্কে অভিমত দিয়েছেন। দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের সাথে আমেরিকা ও ভারতের সংসদের গণতন্ত্রের তুলনা করেছেন। দেশের সামরিক স্বৈরশাসকের শাসনামলে প্রবন্ধটির রচনা, সেই সময় রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা, আদালত, সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা ছিল না; বিচারপতির উৎকোচ গ্রহণ, সাংবাদিক বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের চেয়ে বেতন বৃদ্ধিতে বেশি মনোযোগী, সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মারণাস্ত্র তৈরি ও প্রয়োগ করে, অনেক শিক্ষকের মধ্যে শিক্ষক সুলভ আচরণের অভাব- এই বিষয়গুলো তাঁর মনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিপন্থী বলে তার সমালোচনা করেছেন। সেনাবাহিনীর দেশ শাসনের দায়িত্ব নেয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন প্রাবন্ধিক। রাজনীতি, সমাজনীতি সম্পর্কে তার এতসব অভিমতের উদ্দেশ্য বুর্জোয়া সাহিত্যে ব্যক্তির অবমূল্যায়ন।

শিল্পীরা সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ। নতুন সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের সাথে ঔপন্যাসিকও নতুন ধ্যান ধারণার আদর্শে প্রকৃত মানুষের চরিত্র রূপায়ণ করবেন। প্রাবন্ধিকের প্রত্যাশা যাদের হাতে সভ্যতা-সংস্কৃতি ও বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিকাশ হয়েছিল সেই শ্রমজীবীদের ক্ষোভ বিক্ষোভকে ঔপন্যাসিকেরা মূল্যায়ন করবেন তাঁদের উপন্যাসে। পরিবর্তনশীল সমকালীন সমাজের মূল্যবোধ ও চেতনাকে রূপায়ণ করতে না পারলে সাহিত্যের সার্থকতা আসে না। সমকালীন সমাজ বাস্তবতা ধারণ করতে না পেরে অনেক শিল্প সাহিত্য ব্যর্থ হয়েছে। নতুনকে গ্রহণ না করে গতানুগতিকতার স্রোতে গা ভাসিয়ে কেউ-ই শিল্প সাহিত্যের জগতে অবদান রাখতে পারেন না। প্রাবন্ধিকের অভিমত প্রকরণগত পরিবর্তন উপন্যাসের প্রাণসঞ্চার করতে পারে না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর মাত্র কয়েকজন সফল বাঙালি ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব ঘটেছে যাঁরা সমকালীন সমাজ বাস্তবতাকে গ্রহণ করেছেন বলে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মনে করেন। কারণ বেশির ভাগ ঔপন্যাসিকই ব্যক্তির অবক্ষয়কেই বিশ্লেষণ 'রছেন, তাঁরা নতুন সমাজবাদী চেতনাকে অবলম্বন করেছেন কিন্তু সমকালীন মানুষের বেদনা বিক্ষোভ, সংকট সংকল্পের নতুন ভাবনাকে যথাযথ ধারণ করতে সক্ষম হননি।

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মুসলমান সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১২)। এই সমন্বয়পন্থী সাহিত্যিকের সাহিত্য-কর্মের মধ্য দিয়েই পাশ্চাত্য প্রভাবে আন্দোলিত বাঙালি সমাজ ও বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে মুসলমানদের সাহিত্য রচনার দ্বার উন্মুক্ত হয়। যুগ সচেতন শিল্পী মীর মোশাররফ হোসেন তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও উদার সাংস্কৃতিক মানসিকতায় পুঁথি সাহিত্যের গণ্ডি অতিক্রম করে কাব্য উপন্যাস নাটক প্রবন্ধ প্রহসন জীবনচরিত বিচিত্র সাহিত্য রচনা করে এই প্রথম বাঙালি মুসলিম ঔপন্যাসিক বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। অতীত আশ্রয়ী অনগ্রসর মুসলিম সমাজে তিনিই প্রথম সমকালীন সমাজ ও মানুষের চারত্রিক বৈশিষ্ট্যকে সাহিত্যে চিত্রায়িত করেছেন। তাই বাংলা সাহিত্যে মীর মশাররফের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে।

কোন গোষ্ঠী বা জাতির সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে মানবীয় চেতনাকে নিয়ে সাহিত্য রচনা করে তিনি সমসাময়িক মুসলমান বাঙালি লেখকের থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। এই মানব নির্ভরতার জন্যই তাঁর মনোজগতে দোভাষী পুঁথির প্রভাব থাকলেও 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' ও 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে কাজ করতে এসে তিনি সমকালীন সমাজ ও মানুষকে জানার সুযোগ পান, তাঁর সাহিত্যে সেই সমাজ বাস্তবতার রূপায়ণ

ঘটে। তাঁর প্রথম গ্রন্থ রত্মাবতী (১৯৬৯) কে সুকমার সেন উপন্যাস হিসেকে আখ্যা দিয়েছেন। অধ্যাপক আবদুল লতিফ চৌধুরী দোষ ক্রটি থাকলেও রত্মাবতীকে সুখপাঠ্য উপন্যাসে বলেছেন। সমাজ বাস্তবতা অনুধাবনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার ফলেই তাঁর সাহিত্যে রয়েছে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, সৃজনশীল বাংলা সাহিত্য রচনায় তাঁর কৃতিত্বের মূল্যায়ন করেছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস 'সংশয়ের পক্ষে' প্রবন্ধে।

সাহিত্য রচনার সূচনা পর্বে মীর মশাররফের মধ্যে সমাজ জীবন সম্পর্কে যে সচেতনতা দেখা যায় পরবর্তীতে তা রক্ষিত ছিল না। বিষাদ সিন্ধু (১৮৮৫-৯১) জমিদার দর্পণ (১৮৭৩) গো জীবন (১৮৮৯) এবং আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ সমূহে উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য আছে, এমনকি সাহিত্যিক জীবনের প্রাথমিক স্তরের দুর্বল পদ্যেও যেমন বেহুলার গীতাভিনয়-এ (১৮৮৯) সমাজ ও মানুষকে বাস্তবতার আলোকে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু উদাসীন পথিকের মনের কথা (১৮৯০) থেকে মীর মশাররফের সচেতনতার বলিষ্ঠ ধারা থমকে যায়। ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার এস্টেটে কর্মরত ছিলেন। ফজলুল হক সৈকত লিখেছেন– 'অনুমান করা যায় এসময় থেকেই তাঁর মনোজাগতিক ও বর্হিজাগতিক এমন কোনো ঘটনা ও পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিলো যে, তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই দেলদুয়ার পরিত্যাগ করেন এবং তখন থেকে তাঁর সাহিত্যও নতুন মোড় নেয়।' গো-জীবন প্রকাশ নিয়েও তিনি গভীর বিতর্ক ও মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। এর পরিণামে তাঁকে 'তওবা' পড়ে গো-জীবন প্রকাশ বন্দের অঙ্গীকার করতে হয়।

আধুনিক মননশীল লেখক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রগতিশীল প্রতিবাদী চেতনার লেখক। তাঁর লেখায় সমাজ সম্পর্কিত চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটেছে অতীত ও বর্তমান আশ্রিত বিষয়াবলীর প্রেক্ষিতে। তাই তাঁর রচনার উপজীব্য সেই সব সাহিত্যিক, তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যকে সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষাপটে আলোচনার প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর সেই চেতনার প্রকাশ ঘটেছে সংশয়ের পক্ষে প্রবন্ধে। সমাজ বিষয়ক ভাবনার উপস্থাপনে মীর মশাররফসহ উনিশ শতকের মুসলমান সাহিত্যিক সম্পর্কে প্রাবন্ধিক নিজের উপলব্ধিজাত অনুভবকে লিখেছেন। বিষাদ সিন্ধু, জমিদার দর্পণ, গো-জীবন ও আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থগুলোর মধ্যে লেখকের সামাজিক মানুষকে দেখার প্রবণতা ছিল, কিন্তু পরবর্তী রচনাগুলোর মধ্যে তা ছিল না, এ বিষয়ে প্রাবন্ধিকের মন্তব্য– 'কিন্তু এই চেহারা সব সময় অস্পষ্ট, আবার একটুখানি দেখা দিয়েই অনির্দিষ্ট ও সংজ্ঞা বহির্ভূত রচনা কোথায় যে উধাও হয় তার আর পাত্তা পাওয়া যায় না।' বিশ্লেষণধর্মী 'সংশয়ের পক্ষে' প্রবন্ধে তিনি কবিতা,

উপন্যাস-ঔপন্যাসিক, আত্মজীবনীমূলক রচনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একজন সাহিত্যতাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেছেন। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে মুসলমান কবি সাহিত্যিকদের উপস্থিতি, তাঁদের কর্ম নিয়ে তাঁর অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন এই প্রবন্ধে।

সামন্তবোধমুক্ত চেতনা উপন্যাস লেখার অন্যতম প্রধান শর্ত। সামন্তব্যবস্থার প্রতি একজন উপন্যাসিক সমর্থন জানাতে পারেন তবে ঐ সমাজ ও সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেই ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত প্রভুদের প্রতি ঔপন্যাসিক তার সমর্থনের কথা লিখবেন। সামন্ত মনোভাব মুক্ত ঔপন্যাসিকের পক্ষেই এই বিশ্লেষণ বা পর্যবেক্ষণ সম্ভব বলে লেখক মনে করেন। মূলকথা সামন্ত চেতনা মুক্ত মনোভাব নিয়ে উপন্যাস লিখতে হবে। তবেই সেই উপন্যাসে জীবন উদ্ভাসিত হয়। বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সাহিত্যে জাতীয় জাগরণ মূলক চেতনার কারণ তাঁর সম্পূর্ণ সামন্ত আভিজাত্য মুক্ত চেতনা এবং ধর্ম নিরপেক্ষতা, আর এজন্যই তিনি ধর্মীয় প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েননি। প্রতিভা, মেধা ও শিল্পবোধে মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে একজন অনন্য সাহিত্যিক। মীর মশাররফ সামন্ত চেতনা প্রবাহ মুক্ত সাহিত্যিক হলেও তিনি ঔপন্যাসিক নন, কারণ তাঁর প্রতিটি রচনার উৎস ব্যক্তিগত আবেগ, বিষাদ সিন্ধুতে তাঁর সেই ব্যক্তিগত আবেগকে প্রাবন্ধিক বলেছেন ভক্তি। এই ভক্তি চরিত্র ও কাহিনী বিশ্লেষণের পক্ষে অন্তরায়। তাই মধ্যযুগের দেব নির্ভরতা ও সামন্ত প্রভুর আমলে উপন্যাস লেখা হয়নি। জমিদার দর্পণে জমিদার শ্রেণির ভেতরের নোংরা রূপের চিত্র আছে কিন্তু কোন চরিত্রই পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে ওঠেনি। ঔপন্যাসিকের নিজের অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি উপন্যাস বা রচনা নৈর্ব্যক্তিকতা অর্জন করে, যা উপন্যাসের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু মীর মশাররফের আত্মজীবনীমূলক রচনারীতিতে তাঁর আবেগ ও অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণের অভাবে সর্বজনীন রূপ পায়নি। অথচ এই বিশেষ বিশ্লেষণ নৈর্ব্যক্তিকতা অর্জনের জন্য সম্রাট বাবর, বিপ্লবী ক্রপটকীন, গ্রিক লেখক কাজান জাকিস প্রমুখের আত্মজীবনীমুলক রচনা বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে। ঔপন্যাসিক তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে সরাসরি প্রকাশ করবেন না, যদি তা করেন তবে তা উপন্যাস না হয়ে প্রচারমূলক সাহিত্যে হবে। ঔপন্যাসিক তার সমর্থন বা বিরোধিতা চরিত্রের ধারবাহিক উদঘাটনে, কাহিনীর ক্রমবিকাশের মধ্যে তাঁর নিজের কথা এমনভাবে বলবেন যাতে পাঠকের মনে হয় চরিত্র ও কাহিনীর বিকাশের প্রয়োজনেই তাকে এমন করে লিখতে হয়, ব্যক্তি বিশেষের অন্তর্নিহিত বাণী যেন সকলের বাণীতে রূপ পায়। সকলের দুঃখ-বেদনা-আনন্দ ঔপন্যাসিকের সৃষ্ট চরিত্র ধারণ করে, তাঁর

নিজের ব্যক্তিত্বে তিনি সবাইকে ধারণ করে চরিত্র ও ঘটনা চিত্রায়ণ করবেন। আর এজন্য একজন ঔপন্যাসিককে মানুষের চরিত্রের অন্তর্গত ও বর্হিজগতকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। প্রাবন্ধিক তাই সংশয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রাবন্ধিক বলেছেন– 'সংশয়ের তাড়াতেই লেখক প্রত্যেকের ভেতরে ঢোকেন তাকে তদন্ত করার জন্য, এই সংশয়ের তাড়ায় তাঁকে আখ্যানের চেয়ে বেশি তাড়া করে ভেতরের মনোজগৎ এবং তাঁর সমাজ– কারণ তা-ই তাঁকে সাহায্য করে মানুষের বিশ্লেষণে।' সামন্ত বিরোধী মনোভাব থাকলেও মীর মশাররফ এই বিশ্লেষণ ক্ষমতা অর্জন করতে পারেননি। সামন্ত বিরোধিতা মূলত তাঁর ব্যক্তিগত ক্রোধ। সামন্ত প্রভুর ভয়েই জমিদার দর্পণের আবু মোল্লাকে প্রতিবাদী করে সৃষ্টি করতে পারেননি। তিনি লিখেছেন–'তাঁর নিজের কোনো সংশয় নেই, যে সংশয়ের তাড়ায় তিনি চরিত্রের ভেতর অনুসন্ধানের কাজ চালাতে পারেন।' বিশ শতকের শুরুতে বাংলা উপন্যাস রচয়িতা নজিবর রহমান ও ইমদাদুল হক সম্পর্কে লেখক একই মত পোষণ করেন। সামাজিক জীবনের ধর্মীয় আবেগ ও অনুভূতি মানব জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে, কীভাবে নির্মিত হয় জীবনবোধ তাঁর চিত্ররূপ নজিবর রহমানের আনোয়ারা উপন্যাসে। গ্রাম্য দলাদলি, হীন ষড়যন্ত্র, বংশগর্বের অন্তঃসার-শূন্যতা, স্ত্রী শিক্ষার উপযোগীতা, পেশাগত জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বিশ্বস্ত রূপায়ণ ঘটেছে এখানে। ইমদাদুল হকের আবদুল্লাহ উপন্যাসে রয়েছে বিশ শতকের প্রথম দিকের উদীয়মান বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের জীবন ও তার নানামাত্রিক জটিলতা। কিন্তু এক্ষেত্রে লেখকের অভিমত আদর্শ নারী ও আদর্শ পুরুষ গড়তে যেয়ে তাঁরা মানুষের সামগ্রিক বিশ্লেষণ করেননি। উপন্যাস রচনার প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলমান রচিত উপন্যাসে মানুষের মনোজগৎ এবং সমাজ বিশ্লেষণের লক্ষণ দেখা যায় না।

সমাজ বিবর্তনের মাধ্যমে উনিশ শতকের শেষভাগ থেকেই মানুষের মধ্যে সামন্তবোধমুক্ত নগর চেতনা আসে, কিন্তু উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে মুসলমান সমাজে যে আধুনিক শিক্ষা আসে তা তখনো সর্বজনীন রূপ পায়নি, তাই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে নগর চেতনা থেকে যে সংশয়ের জন্ম হয়, তার কোন লক্ষণ দেখা যায়নি। মুসলমান কবি-সাহিত্যিক ও তাদের শিক্ষা সংস্কৃতির সীমাবদ্ধতা তাদের শিল্পকর্মের সৃজনশীলতাকে বাধাগ্রস্থ করেছিল। মুসলমান সমাজে রাজনীতিক, কবি, সঙ্গীত শিল্পী, চিত্র শিল্পীর আর্বিভাব হয়েছে কিন্তু বাংলা সাহিত্যে ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব ঘটেছে অনেক পরে। আবুল হাশেমের নেতৃত্বে তরুণ কর্মীদের তৎপরতার ফলে বুর্জোয়া রাজনীতিতে নিম্নবিত্তের প্রতিষ্ঠা হয়। তিরিশ দশকের শেষে অর্থনৈতিক মন্দা

ও চল্লিশ দশকের যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ মধ্যবিত্তের জীবনে যে টানাপোড়েন সৃষ্টি করে তাতেই কবি সাহিত্যিক শিল্পীর জীবনে সংশয় জেগে ওঠে, আসে সচেতনতাবোধ ও অনুসন্ধিৎসা। আবির্ভাব ঘটে কয়েকজন সচেতন ঔপন্যাসিকের, তাঁদের মধ্যে অন্যতম সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। যিনি সমাজের পীরবাদ নিয়ে লিখে তার ভেতরকার অন্তঃসারশূন্যতাকে সামাজিকের সামনে নিয়ে এসেছেন। ধর্ম ব্যবসায়ীরা নিরীহ সহজ সরল ধর্মভীরু মানুষের ধর্মীয় ভীতি, দুর্বলতা ও অনুভূতি, বিশ্বাসকে কীভাবে উপরে ওঠার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে সমাজে প্রতিষ্ঠা পায় তারই আগাগোড়া চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন, লেখক, ভণ্ড, স্বার্থান্বেষী, ধর্ম ব্যবসায়ীদের প্রতি মানুষের বিশ্বাসকে ভন্ড ধর্ম ব্যবসায়ী তিনি ভাঙতে চেয়েছেন। সমাজের প্রেক্ষাপটে একজন জীবন্ত ব্যক্তিকে সামনে রেখে সামাজিক বিশ্বাসের একটা একটা দৃশ্যপট উপস্থাপন করে ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ীদের নগ্নরূপকে তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন দৃশ্যপটে বিভিন্ন মানুষের দ্বন্দ্ব আর সংঘাতের চিত্র তুলে ধরে সবল সজীব উপন্যাস লিখেছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। এর পেছনে রয়েছে লেখকের গভীর অনুসন্ধিৎসা।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মনে করেন সংশয়ই সাহিত্যিক বা ঔপন্যাসিককে ধাপে ধাপে অনুসন্ধানের গভীরে নিয়ে যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্যের মনোবিশ্লেষণমূলক চুম্বকীয় Style-এর কথা লিখেছেন। তাঁর মতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হচ্ছেন সংশয় সমৃদ্ধ লেখক, যার জন্য মানুষের ভেতরের দ্বন্দ্ব দেখার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছেন অন্যায় সামাজিক স্থলনের মূল কারণ। সংশয় ও সংঘাতের জৈবিক প্রক্রিয়া মানুষের জীবনে আছে বলে অন্যায় প্রতিরোধের পথও দ্বন্দ্বময় ও জটিল। লেখক বলেছেন সংশয়ের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে মানুষের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত দেখলেই মানবাত্মার মহৎ ঐকতান উপলব্ধি করা যায়। রুশ দার্শনিক দস্তয়েভস্কি মানুষের টানা পোড়েন, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও বৈপরীত্যের ভেতরেই মানব প্রকৃতির অখণ্ড ঐকতান উপলব্ধি করেছেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য বৃটিশ ভারতের সেই সময়কার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবধারার মধ্যে থেকেও ব্যতিক্রম। বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালির সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের একটা নাতিদীর্ঘ ইতিহাস তুলে ধরেছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর 'মানিক বন্দোপাধায়ের রাগী চোখের স্বপ্ন' নামের প্রবন্ধে। প্রবন্ধের নামকরণে প্রাবন্ধিকের সাহিত্যধর্মিতার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের সাহিত্যচর্চার আগে এই উপমহাদেশে মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঘটে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পত্তনের

পর এই দেশে এক ধনিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। ইউরোপীয় শিক্ষা সংস্কৃতির প্রভাবে মানুষের মধ্যে সচেতনতা আসে, ফলে শিক্ষা গ্রহণে এখানে এদেশের উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এমনকি নিম্নবিত্তরাও আকৃষ্ট হয়। পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে স্বাধীনতার চেতনায় মানুষ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে শুরু হয় স্বাধীনতা আন্দোলন। গান্ধীজী তখন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। ঐ সময়ে এক শ্রেণির মানুষ ইংরেজি শিক্ষা ও সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি প্রবল আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমান ও স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেস রাজনীতির সপক্ষ শক্তি, আবার দেশবন্ধু, তুরস্কের সংগ্রামী কামাল পাশার শক্তিও এদেশের মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। এসময় রাজনীতিতে ফজলুল হকের আবির্ভাব। রাজনীতির পাশাপাশি হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ ও সাম্যবাদের চেতনায় অনুপ্রাণিত করার জন্য নজরুলের ভাববাদী আন্দোলনও জনমনে তখন প্রবল উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। তখন রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাসের সমাজ-সংস্কারের ভাবনা মধ্যবিত্ত সমাজের চেতনায় গভীর প্রভাব ফেলে। দেশের রাজশক্তি ও সমাজশক্তির এই রকম প্রভাবে বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ ধর্ম সংস্কার, সমাজের প্রতি আনুগত্য, আধুনিক শিক্ষালাভ ও শিল্প সাহিত্যচর্চায় আগ্রহী হয়ে উঠলেও পরস্পর বিরোধী অসংগতিপূর্ণ ধর্মবিশ্বাস, ভক্তি, সংস্কার-মূল্যবোধ, প্রেরণা, আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্বের বড় অভাব ছিল এই সমাজে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিতে বাংলায় মধ্যবিত্ত সমাজে যে ব্যক্তির উত্থান হয়, কিন্তু ঔপনিবেশিক পারিপার্শ্বিকতার কারণে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বের বিকাশ তখনো সমাজের আসেনি। লেখকের মন্তব্য– 'এই মধ্যবিত্ত হল দেশবাসীর প্রতি উপনিবেশিক শক্তির দেওয়া উপহার।' ঔপনিবেশিক শাসকেরাই শাসিতকে নিজেদের স্বার্থে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয়নি। সমাজে ছিল না বলে রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভাধরও কোন শক্ত সামর্থ ব্যক্তিকে তাঁর উপন্যাসে উপস্থাপন করতে পারেন নি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশ্বজুড়ে যে অর্থনৈতিক মন্দা আত্মপ্রকাশ করে সেই সংকট তিরিশ শতকের শুরুতে ভারতবর্ষকেও আঘাত করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পায়তারায় ইউরোপের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব মুখ থুবড়ে পরে, ফলে বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাধীনতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে পর্যবসিত হয়ে ব্যক্তিসর্বস্বতায় পরিণত হয়। তিরিশের দশকে বাংলার মধ্যবিত্ত

'ব্যক্তি'র মধ্যে ব্যক্তিত্ববোধের সচেতনতা একেবারে প্রায় শূন্যের কোঠায় নামে।

এই রকম সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। প্রাবন্ধিক মানিকের মধ্যেই ঔপন্যাসিকের সকল গুণ বা বৈশিষ্ট্য দেখেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে মানিকের উপন্যাসেই রয়েছে আধুনিক যুগ চেতনার সব বৈশিষ্ট্য। মানিকের মত সংস্কারমুক্ত সাহিত্যিকই ব্যক্তিকে সাহিত্যে তুলে ধরেন। তাঁর ছিল বিশ্লেষণের প্রবণতা ও দক্ষতা। ভক্তিভাব মুক্ত এই সাহিত্যিক জানতেন ভক্তি ও বিশ্বাসের পার্থক্য, প্রশ্রয় ও ভালবাসা এক নয়। গ্রামবাংলায় মনোরম প্রকৃতি, সহজ-সরল বিশ্বাসী মানুষই শুধু নেই, আছে জীবনের জটিলতা। পুতুল নাচের ইতিকথা উপন্যাসে শশী ডাক্তারের চরিত্রে গ্রামীণ জীবনধারার যে বাস্তবতা তাতে– '...উপনিবেশের ব্যক্তি, সমাজ থেকেও নিজেতে নিজের মতো করে প্রতিষ্ঠা করা তো দূরের কথা, নিজেকে আলাদাভাবে অনুভব করাও তার আয়ত্তের বাইরে। দিন যায়, স্বাতন্ত্র্যের বদলে নিজের বিচ্ছিন্নতা তার কাছে প্রকট হতে থাকে। ...বাপের অপত্য স্নেহ চাপা পড়ে ঐ ঘোরতর বৈষয়িক বুড়োটির ক্ষুদ্রতা, লোভ আর লালসার নিচে।' সেবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ডাক্তার গ্রামে এসেছিলেন, তার আর কিছুই হয় না, সেই পরিবেশে সে পরিণত হয় একটি সংকুচিত জীবে। মানিক গ্রামীণ বাস্তববতায় দেখালেন ইচ্ছা অথবা অনিচ্ছায় সে ব্যক্তির অনিবার্য করুণ পরিণতি।

সেই ঔপন্যাসিকই সার্থক যার সৃষ্ট চরিত্রের সাথে পাঠক একাত্মতা বোধ করেন, পাঠক তার মধ্যে নিজেকে অনুভব করেন অথবা সমাজে এরকমই ঘটে– এরকম মনে করেন। কিন্তু মানিকের প্রথম দিকের সাহিত্যের চরিত্রের শোচনীয় ভয়াবহ রূপের সাথে পাঠক একাত্ম হতে পারেন না। সমাজের রুগ্ন ব্যক্তিত্বের জন্য দায়ী মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে পরিচালিত সমাজব্যবস্থা। অসুস্থ যৌনতাকে মানিক তার প্রথম পর্বের রচনায় ব্যক্তির দুর্বলতার উৎস বলে সনাক্ত করেছেন। মানিক ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে প্রভাবিত ছিলেন। ফ্রয়েড মনে করেন আমৃত্যু মানুষ সমন্বয় ও সংঘাতের ভেতর দিয়ে পরিচালিত হয়। তা শ্রেণি নিরপেক্ষ সমাজ কাঠামোর সাথে সম্পর্কহীন। উপন্যাসে মানিকের সৃষ্ট চরিত্র শ্রেণিগত অবস্থানের শিকার। এখানে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাসের তিনজন মাঝির আচরণগত পার্থক্যের উদাহরণ দিয়েছেন। তিনজনই নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী। এই নিম্নবিত্তের মধ্যেও স্তরভেদ আছে; ধনঞ্জয়ের নৌকা আছে, তাই সুযোগ পেলেই কুবের গণেশকে ঠকায়। কুবেরের থেকেও গণেশের অবস্থা শোচনীয়, কুবের গণেশকে ঠকায়। কুবেরকে যে মাছ নিয়ে

ঠকায় সেও নিম্নবিত্তের শ্রমজীবী কিন্তু কুবের থেকে স্বচ্ছল। প্রাবন্ধিক আমাদের সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে মন্তব্য করেছেন– 'তার ঐ একটুখানি আর্থিক সংগতিই তাকে ওদের ঠকাবার দায়িত্ব অর্পণ করেছে।' এখানে শোষণের রূপ আর্থিক অবস্থার নিম্নগামী। ধনঞ্জয় নৌকার মালিক হওয়ার জন্য কুবেরকে ঠকায়। কুবের ঠকায় তার থেকে নিম্ন আয়ের গণেশকে। মেজবাবুরা উপকারের নামে শোষণ করে, সমাজের নিম্নবিত্তের শ্রমজীবী সব সময়েই শোষণের শিকার। সমাজের এই বাস্তব সত্য লেখক অনেক জায়গাতেই লিখেছেন। প্রাবন্ধিকের মতে সমাজে হাজার বছর ধরে চলে আসা মানুষের মূল্যবোধের মধ্যে লাভক্ষতির হিসেব রয়েছে। সূক্ষ্ম দার্শনিকের দৃষ্টিতে মানিক যে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করছেন তাতে দেখিয়েছেন মানুষের প্রবৃত্তি সামাজিক অবস্থানের উপর নির্ভরশীল– রোজগেরে ছেলের প্রতি মা-বাবার স্নেহ ভালবাসার পেছনে রয়েছে স্বার্থ, বিপত্নীক জ্যেঠামহাশয়ের যত্ন-আত্তির পেছনেও সেই স্বার্থ। একই পবিরারের উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের জীবন-যাপন প্রণালী এবং মানসিক গঠন একেবারেই আলাদা– নির্বিকারভাবে এই সত্য মানিক তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন মানুষের জীবনাচরণ পদ্ধতি, প্রবণতা, মূল্যবোধ, প্রবৃত্তি, বিকার বংশগত নয়, সমাজগত।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের মনোজগতে সূক্ষ্ম অনুসন্ধান চালিয়ে ভেতরের অন্ধকার জগতের সন্ধান তাঁর গল্প উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। মানুষের অবচেতন মনের বিকার নয়, সচেতন মনের আবেগ, বুদ্ধির অপচয় ও শক্তির ক্ষয়কে নানাদিক থেকে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন। নিরন্ন অপারগ বাবা যে স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণ করতে পারে না, ঘরের চালায় জল পড়ে, তা বন্ধ করার সামান্য খড়ও জোগাড় করতে না পেরে বর্ষার রাতে সারারাত বসে কাটায়, ছেলে অসুখের যন্ত্রণায় ছটফট করে, সন্তানের জন্য মাতৃহৃদয়ের হাহাকার থামাতে সামান্য ওষুধ আনার যার সাধ্য নেই সেই বাবাটির মনোজগতের আলোড়নে যে বাক্যটি তার মনে আসে, তা হলো– 'ছেলেটি মরলেই বাঁচি।' বাবার স্নেহময়রূপ স্বাভাবিক কিন্তু একজন অক্ষম বাবার মনের অতলান্ত গভীরের অনুসন্ধান মানিকের মত কেউ দিতে পারেননি। দুর্ভিক্ষে মেয়ের বিনিময়ে একটি চালের বস্তা অনাহারী পিতার কাছে বেশি কাম্য। এই সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তিনি চরিত্র চিত্রায়ণ করে প্রেম ভালবাসার আবেগের গতানুগতিকতা থেকে সরে এসে মানুষের অন্ধকার ভেতরটিকে অনুসন্ধান করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন অভাব মানুষের ভেতরের স্বাভাবিক গুণ নষ্ট করে দেয়। আর এ জন্য মানিক দায়ী করেন সমাজে বহুদিনের সংস্কার ও প্রথার সামাজিক ব্যবস্থাপনা। মধ্যবিত্ত-সংস্কার, ক্ষুদ্রতা, ভক্তিভাব ও শোচনীয়

সীমাবদ্ধতা মুক্ত হওয়ার বিশ্লেষণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন। গভীর জীবন অনুসন্ধিৎসা তাঁর সাহিত্যের প্রাণ। আশৈশব তাঁর এই খাপছাড়া প্রতিভা গতানুগতিক পথে চলতে অস্বীকার করেছে। শূন্যগর্ভ মধ্যবিত্ত জীবন থেকে শ্রমজীবী বিত্তহীন মানুষের বিচিত্র জীবন ধারার সাথে সুগভীর একাত্মতায় তাঁর অভিজ্ঞতাকে একটা ভিন্নধর্মী জগন্ময় সত্তায় সমৃদ্ধ করেছে। সমাজভাবনা কথা সাহিত্যের একটি প্রধান শর্ত। সমাজের এক শ্রেণির মানুষ প্রথাবদ্ধ রীতিনীতির বাইরে সমাজের পরিবর্তনের বিরোধিতা করেন, তারাও সমাজের চিন্তাভাবনায় উদ্বিগ্ন হন, তাদের উদ্বিগ্নতা সমাজের পুরোনো কাঠামোকে সংরক্ষণে, সমাজ কাঠামোয় সামান্যতম চিড় ধরার বিপক্ষে তারা। এই প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রের বিধবা বিবাহে বিরোধিতা, প্রেমে বিধবা রোহিনীর অধিকার নেই বলে তাকে গুলি করে হত্যা, বর্ণভেদের সমর্থনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। সমাজ কাঠামোয় চিড় প্রতিরোধ করাই সেই সময়ের অনেক সাহিত্যিকের উদ্দেশ্য ছিল।

রাজনীতি সমাজেরই অংশ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ উপন্যাসে রাজনীতিকে উপজীব্য করেছেন। ঘরে বাইরে, পথের দাবী ও অন্যান্য কয়েকটি উপন্যাসে রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতি তাঁদের বিষয়বস্তু হয়েছে। কিন্তু অনেকের লেখা দেশের রাজনৈতিক চেতনা, সাংস্কৃতিক বিবর্তন ও জীবনবোধের উপর কোন প্রভাব ফেলেনি। নিম্নবিত্তের দারিদ্র্যের গ্লানি নিয়ে মানিকের সমসাময়িককালে সাহিত্য রচনা হয়েছে, কিন্তু প্রাবন্ধিক এই প্রবন্ধে বলেছেন সেই দারিদ্র্য উপস্থাপনের মধ্যে এই সমাজের যথাযথ দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ও দারিদ্র্যের প্রতি ধিক্কার নেই। সমকালীন রাজনীতির উপর আস্থার ফলেই সমাজে মধ্যবিত্তের মধ্যে ছিল পরস্পরবিরোধী ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ সংস্কার। এই অসামঞ্জস্য থেকে মুক্ত হওার প্রবণতা অনেক শিল্পীর মধ্যেই ছিল না– প্রাবন্ধিক মানিকের সাহিত্যের মধ্যে সেই প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন, তাতে সমকালীন রাজনীতির প্রতি তাঁর প্রত্যাখ্যান স্পষ্ট। মানিক তাঁর উপন্যাসে ব্যক্তি চরিত্র উপস্থাপনের মধ্যে দেখিয়েছেন এই সমাজের স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকদের চরিত্র। মানুষের ক্রোধ ও ক্ষোভের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ চাপা দেওয়াই ছিল নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির মূল লক্ষ্য। আপসের রাজনীতিতে মানিকের আস্থা ছিল না। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মধ্য দিয়েই তিনি সমাজ, সমাজব্যবস্থা, রাজনীতির গতি প্রকৃতিকে তুলে ধরেছেন। সমাজের দূরবস্থার জন্য তিনি মানুষের সৃষ্ট নিয়মনীতিকেই দায়ী করেছেন। তাই এই অসুস্থ ও অবক্ষয়জনিত সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের উপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। মার্কসবাদী মানিক মনে করেছেন অকপট বিশ্লেষণে মানুষকে তার যথার্থ

অবস্থান সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেওয়াই ঔপন্যাসিকের কাজ। তাঁর প্রথম পর্বের রচনার অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের বিশ্লেষণ পরবর্তী রচনাগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রাবন্ধিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস চল্লিশ দশকের বৃটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির একটি চালচিত্র তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে এ প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। সে সময় মার্কসবাদী আন্দোলন শ্রমিক ও ছাত্রদের উপর প্রভাব ফেলে, শ্রমিকেরা ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে। সামন্ত শোষণকে রোধ করার লক্ষ্যে আত্মপ্রকাশ করে তেভাগা আন্দোলন। প্রাবন্ধিক কংগ্রেসকে পুঁজিবাদের সমর্থক বলে আখ্যায়িত করেছেন। কংগ্রেসের অনেক কর্মীর ভেতরে অসন্তোষ ও গান্ধীজী বিরোধিতা শুরু হয়। ঐ সময় পুঁজিবাদী শোষণ ও সামন্ত শোষকদের বিরুদ্ধে কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ছিল। কমিউনিস্টদের প্রভাবে মুসলমান ছাত্র-তরুণদের মধ্যে সামন্ত দাপট ও সংস্কারকে অগ্রাহ্য করার মনোভাব গড়ে উঠেছিল। তিরিশ দশকেই নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষ বাংলা কথা সাহিত্যের উপজীব্য হয়, চল্লিশের দশকের মধ্যবিত্তসুলভ ভাবাবেগ দূর হয়ে অনেক কথাসাহিত্য ও কবিতায় সমাজতন্ত্রের আদর্শই মুখ্য হয়ে ওঠে। সোভিয়েত ইউনিয়ন অনেক তরুণের কাছে তখন আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হয়, তারা বিশ্বাস করে আমাদের দেশেও বিপ্লবের মাধ্যমে শোষণমুক্ত সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সমাজতন্ত্রের বিরোধীরা শ্রেণি সংগ্রামের চেতনায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন।

ভাবাবেগ ও সংস্কারাবদ্ধ গতানুগতিক সমাজের এই পরিবর্তন মানিকের চিন্তা চেতনায় পরিবর্তন আনে, আর তিনি সাহিত্যচর্চায় তা প্রয়োগ করেন। তিনি সাহিত্যচর্চায় মানুষের শক্তির অন্বেষণ করেন এবং আগের মতই মানুষের স্বভাব, প্রবণতা, ঘটনা ও প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ করেন। ব্যক্তিবাদের বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে মুক্ত ঐক্যবদ্ধ নিম্নবিত্তের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে মানিক শক্তির অনুসন্ধান করেছেন। পেশার সাথে নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীরা বেশি ঘনিষ্ঠ বলে পেশাজীবীদের সাথে তাদের একাত্মতা বেশি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্পে আছে সুতার অভাবে তাঁতিরা যখন বেকার নিরন্ন, হতাশা ও বিক্ষুব্ধ– তখন এক মধ্যরাতে সুতাবিহীন তাঁতের খটখট আওয়াজে গ্রামবাসী জেগে ওঠে। এখানে লেখক শ্রমজীবীর কাজের মধ্যেই তার প্রেরণাকে তুলে ধরে তার শক্তিকে দেখিয়েছেন। আর সে শক্তি হলো সুতা লোপাটকারী বিত্তবানদের বিরুদ্ধে তাঁতিদের সমবেত ক্রোধ এবং সৃজনশীলতার প্রেরণা। কিন্তু শুধু ক্রোধ সমাজ ব্যবস্থা পাল্টাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। মানিকের উপন্যাস ও গল্পের কাহিনীকে প্রাবন্ধিক তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে উপস্থাপন করেছেন।

মানিক স্বচ্ছল ও প্রতিপত্তিশীল পরিবারের তরুণের চেয়ে চাষি পরিবারের সন্তানের চরিত্রের মধ্যে শক্তি এবং স্বভাবে সামঞ্জস্য বেশি দেখিয়েছেন। চাষির ঘরের একটি ছেলে ভদ্রলোকের স্কুলে পড়েও তার জাতের অর্থাৎ তার জাতিগত ঐতিহ্যকে হারায় না। একজন মধ্যবিত্ত ঘরের বিদ্রোহী সন্তানের আবেগ নিম্নবিত্তের ব্যক্তিকে স্পর্শ করে না। তার নিজের, পরিবারের ও সমাজের স্বার্থ অভিন্ন। রাজনীতি সচেতন মধ্যবিত্তের চেয়ে নিম্নবিত্তের শ্রেণির সেই মানুষের আসন সমাজে দৃঢ় ও সম্ভাবনা বেশি মানিক তা দেখিয়েছেন কিন্তু গভীর বোধ ও তীব্র অনুভূতি দিয়ে এসব ঘটনা গোটা সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব সৃষ্টি করলেও সংস্কার ভাঙার ক্ষমতা উপযোগী করে চরিত্র সৃষ্টি করতে পারেননি। তাঁর কয়েকটি উপন্যাসে দেখা গেছে সমাজ বিচ্ছিন্ন মানুষ তার ক্ষুদ্রতা ও গ্লানি নিয়ে অস্বস্তিবোধ করেছে, আবার ভাগ্য পরিবর্তনের সংকল্পে উদ্বুদ্ধ মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াবার যথাযথ প্রেরণা পায়নি । সামাজিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে এই বিষয়গুলো তিনি উপন্যাসে দেখিয়েছেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের দূরবস্থার জন্য সমাজের সৃষ্ট ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন, আর তার প্রতিকার মার্কসবাদের নিয়মকানুনের মধ্যেই সম্ভব বলে তিনি মার্কসবাদী হয়ে ওঠেন। কিন্তু মার্কসবাদী চেতনার মূলতত্ত্ব 'বিপ্লবের মাধ্যমে সভ্যতার ফসলে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অধিকার নিশ্চিত করে মার্কসবাদ'– এই দর্শনে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েও তিনি তাঁর শিল্পকর্ম দিয়ে পাঠককে উদ্বুদ্ধ করতে পারেননি। মার্কসবাদ তাঁর কাছে ছিল মানুষের মানুষ হওয়ার হাতিয়ার। রোমান্টিক ভাবালুতাকে পরিহার করে দক্ষ বিজ্ঞানীর মত একের পর এক জীবনসত্যকে উন্মোচন করে বাংলা সাহিত্যেকে পরিপূর্ণ করেছেন। মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও দায়িত্ব চেতনা তাঁকে নিয়ে এসেছে মেহনতী মানুষের কাছে। জীবন জয়ী সাধনায় মানিক যুক্ত হয়েছেন বঞ্চিত, শোষিত, নিপীড়িত মানুষের গণ অভ্যুত্থানে।

আমাদের সমাজে রাজনীতির নেতৃত্ব মধ্যবিত্তের হাতে কিন্তু রাজনীতি সচেতন মধ্যবিত্তের সবাই সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়। আর যারা বিশ্বাসী তারাও সমাজতান্ত্রিক দর্শনের নিয়ম মানে না। কিন্তু এই বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন মধ্যবিত্তের একটি বড় অংশের মধ্যে নতুন ভাবনা ও সংস্কৃতিতে প্রভাব ফেলেছিল, কংগ্রেস ও মুসলিমলীগের একটা ছোট অংশের মধ্যে এ আন্দোলন তোলপাড় তুললেও ব্যাপক সামাজিক প্রভাব ফেলার আগেই কমিউনিস্ট পার্টির তৎপরতা ঝিমিয়ে পড়ে। আর মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা। তেভাগা আন্দোলনের তৎপরতা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের কাছে আর গুরুত্ব পায় না। ফ্যাসিবাদ বিরোধিতার

নামে ইংরেজ বিরোধিতা স্থগিত রাখার জন্য কমিউনিস্টদের সিদ্ধান্তে মানিকের সমর্থন ছিল না, তিনি তাঁর উপন্যাসে কমিউনিস্টদের এই মনোভাবকে ধিক্কার দিয়েছেন, রাজনীতি প্রবক্তাদের কার্যক্রমকে তিনি সমর্থন জানাতে পারেননি বলে তার রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ উপন্যাসের চরিত্রের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ ঘটেনি বলে প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে রচিত প্রবন্ধে শুধু তাঁর সাহিত্য নিয়েই নয় ত্রিশ চল্লিশ দশকের রাজনীতি, রাজনৈতিক সংগঠন সম্পর্কে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ত্রিশ দশকের লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের প্রগতিশীল সংগঠন সমাজবাদ প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য ও ফ্যাসিবাবিরোধী উদ্দীপনামূলক নাটক, সঙ্গীতচর্চা করে দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা জোরদার হয়ে ওঠায় শ্রেণি সংগ্রামকে ছাপিয়ে সমাজ গড়ার বাসনা বড় হয়ে ওঠে সমাজে। আর এতে অংশ নেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থকরা আর তা সম্ভব হয়েছিল কমিউনিস্ট নেতৃত্বের প্রভাবে। প্রাবন্ধিক বলেন– 'সবাইকে একদেহে লীন করার কমিউনিস্টদের উদ্যোগে সবচেয়ে ক্ষতি হল সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের।' –এতে সেই সময় প্রতিক্রিয়াশীল ও রক্ষণশীল শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল।

চল্লিশ দশকের মাঝামাঝিতে মুসলিমলীগও সামন্তবিরোধী আন্দোলন করেন, তার ফল ভোগ করেন বিত্তবানেরা, এরাই সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়বৃত্তি করে। আর তরুণ মুসলমান বুদ্ধিজীবী সমাজবাদের সমর্থকরা পাকিস্তানের দাবিকে সমর্থন করেন। চল্লিশ দশকের সাহিত্যচর্চায় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি ছেড়ে ইসলামি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি কতিপয় কবি সাহিত্যিকের প্রবণতার বিষয়টিও লেখক উল্লেখ করেছেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশেভাগ, আনন্দবাজার, ও আজাদ পত্রিকার ভূমিকা নিয়ে লেখক বলেছেন– তাঁর মতে এই দুই পত্রিকার সাম্প্রদায়িক উস্কানিতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ চরম পর্যায়ে পৌঁছে। লেখক এ বিষয়ে গান্ধীজীকে দোষারোপ করেছেন। তখন সমাজে মানুষ-এর পরিচিতির তুলনায় হিন্দু-মুসলমানের পরিচিতিই বেশি। এই সময় কমিউনিস্ট পার্টি 'গান্ধী-জিন্নাহ এ ক হও' বলে তারা ঐ দুটি প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের ঐক্য চাইলেন। নিজের সংগঠনের এই দাবির প্রতি মানিকের সমর্থন ছিল না। মানিক মনে করেছেন গান্ধী-জিন্নাহর ঐক্য চেয়ে কমিউনিস্টরা জনসাধারণের স্বার্থ নষ্ট করেছেন। মতের মিল না হলেও মানিক ঐ পার্টির সাথেই থেকেছেন, কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল– এদের দ্বারাই সংস্কারাচ্ছন্ন শ্রেণিবিভক্ত সমাজের পরিবর্তন সম্ভব। ইসলামি ঐতিহ্য ও সাহিত্যে সংস্কৃতির প্রতি কতিপয় কবি সাহিত্যিকের প্রবণতার বিষয়টিও লেখক উল্লেখ করেছেন।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, আনন্দবাজার ও আজাদ পত্রিকার ভূমিকা নিয়ে লেখক বলেছেন। তাঁর মতে এই দুই পত্রিকার সাম্প্রদায়িক উস্কানি, বাঙালি জাতির প্রতিকূলে অবস্থান নেয়ায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ চরম পর্যায়ে পৌঁছে। লেখক এ বিষয়ে গান্ধীজীকে দোষারোপ করেছেন। এই পর্যায়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাস লেখেন তখন সমাজে 'মানুষ' এর পরিচিতির তুলনায় হিন্দু মুসলমানের পরিচয়দানকারী মানুষের সংখ্যাই বেশি। এই সময় কমিউনিস্ট পার্টি 'গান্ধী জিন্নাহ এক হও' বলে তারা ঐ দুটি প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের ঐক্য চাইলেন। নিজের সংগঠনের এই দাবির প্রতি মানিকের সমর্থন ছিল না, এই পটভূমিতে উপন্যাস লিখে এক কমিউনিস্ট কর্মীর চরিত্র চিত্রায়ণ করে নিজের মতবাদ তুলে ধরেন যে গান্ধীজী ও জিন্নাহ-র ঐক্য চেয়ে কমিউনিস্টরা জনসাধারণের স্বার্থ নষ্ট করেছেন। মতের মিল না হলেও মানিক দারিদ্র্য, দুঃখ কষ্টের মধ্যেও পার্টির সাথেই থেকেছেন, কারণ তার বিশ্বাস ছিল এদের দ্বারাই সংস্কারাচ্ছন্ন শ্রেণিবিভক্ত সমাজের পরিবর্তন সম্ভব।

প্রাবন্ধিক মধ্যবিত্ত মানসিকতার দারুণ সমালোচনা করেছেন, কৃষকের নিগৃহীত নিরন্ন জীবনের প্রতি তাঁর সহানুভূতির পরিচয় অনেক প্রসঙ্গেই পাওয়া যায়। সমাজের বর্ণপ্রথা, যৌতুক প্রথা, কিশোরী তরুণী বৈধব্য তাকে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত করেছে। এই জন্যেই সমমনা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একজন পছন্দের সাহিত্যিক। কেননা মানিকের মত সেই সময়ের রাজনীতি, সমাজনীতি, অনাচার, উদ্ভট সংস্কারের তিনি বিরোধী ছিলেন। মানিক ব্যক্তি চরিত্রের মধ্য দিয়ে সাহিত্যে তা উপস্থাপন করেছেন। উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্তের দ্বারা নির্যাতিত নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের টিকে থাকার সংগ্রামকে নিয়ে মানিক উপন্যাস রচনা করেছেন। এই শ্রমজীবীরা ছিল মানিকের শ্রদ্ধার পাত্র। প্রাবন্ধিক মনে করেছেন স্বপ্ন রূপায়ণের কাজে নিয়োজিত মধ্যবিত্ত সমাজের রাজনৈতিক কর্মীরা শ্রমজীবীর কাছে অনেক কিছু শিক্ষা গ্রহণ করে, কিন্তু মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসার শক্তি সে পায় না। তাই মানিকের স্বপ্ন সামাজিক বাস্তবতা পায় না।

বিদেশি শাসনের অবসানের পরেও আমাদের দেশে সমাজের সাম্প্রদায়িকতা, শ্রমজীবীদের লড়াই-এ নেতৃস্থানীয়দের প্রতারণা, ফ্যাসিবাদের কদর্যরূপ, দুর্ভিক্ষে মুনাফা অন্বেষী মানুষ প্রভৃতি আখতারুজ্জামানের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। মধ্যবিত্তের এই মানসিকতাকে তিনি ঘৃণা করেছেন।

সাহিত্যরূপ হিসেবে ছোটগল্পের সৃষ্টি উনিশ শতকের শেষার্ধে, ছোটগল্প সাহিত্যের কনিষ্টতম আঙ্গিক। সাহিত্যিকের সচেতন প্রয়াসে বিশাল জীবনের একটা বিশেষ মুহূর্ত বা ঘটনা নিয়ে ছোটগল্প সৃষ্টি হয়। ব্যক্তি বিশেষের কোন

সমস্যা ও সংকটকে কেন্দ্র করে গল্পকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিচর্যারীতির দক্ষ বিন্যাসে ছোটগল্প রচিত হয়। আধুনিককালে জীবনের বহুমুখী জটিলতার বিচিত্ররূপ নিয়ে ছোটগল্পের সৃষ্টি হয়। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে গদ্যে কথাসাহিত্যের সূচনার যুগেও মানুষের বীরত্ব মহত্ত্ব দয়া নিষ্ঠুরতা করুণা হিংস্রতা ক্ষমা ঈর্ষা ক্রোধ ভালবাসা ইত্যাদি প্রকাশ করে সেই সময়ের মূল্যবোধ ও বিশ্বাস নিয়ে মাইকেল মহাকাব্য রচনা করেন। উনিশ শতকে ইউরোপের শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতার প্রভাবে এদেশে যুগের পরিবর্তন আসে, সেই পরিবর্তনে মানুষের চিন্তা চেতনায় জীবনের মূল্যবোধ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সূত্রপাত হয়, তাতে সাহিত্যে দেবত্ব লোপ পায়, সূচিত হয় মানুষের জয়যাত্রা। মানুষকে প্রকাশ করার জন্য মহাকাব্যের আঙ্গিক ছেড়ে নতুন জীবন-ভাবনা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বদৌলতে সমাজে ধনিক শ্রেণির উদ্ভব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিস্তার, নাগরিক সভ্যতার বিকাশে গতিশীল জীবনের শিল্প আঙ্গিক হিসেবে উপন্যাস তার জন্মলগ্নেই সমাজ ও জীবনের বাস্তবতার মুখোমুখি হয়। বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তির উত্থান ও বিকাশে উপন্যাসের জন্ম বলে প্রথম দিকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলোতে সমাজের নতুন মানুষকে মূল্যায়ণ করা হয়েছে। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামোয় ব্যক্তি স্বাধীনতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে পর্যবসিত হয়ে ব্যক্তি সর্বস্বতায় রূপ পায়। এই ব্যক্তিসর্বস্বতাও উপন্যাসের উপজীব্য হয়। শুধু তাই-ই নয় শিল্পিরা মানুষের সমগ্র জীবনের রূপায়ণে চরিত্রের বাইরের অবয়ব, গতিবিধি, দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলীতে চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচন করে। ব্যক্তিকে মানুষে উন্নীত হওয়ার সুপ্ত শক্তির অন্বেষণ করেছেন ঔপন্যাসিক, তাই উপন্যাসের আঙ্গিকে মানুষের জয়জয়কার।

ছোটগল্প জন্মলগ্ন থেকেই একটি মানবিক শিল্পরূপ, জীবন বিন্যাসের ব্যাখ্যা এবং অভিজ্ঞতার ঐক্যবদ্ধ সংহত রূপ নিয়ে ছোটগল্প সৃষ্টি। ছোটগল্পে জীবনের খন্ডাংশের মধ্যেও সৃষ্টি হয় চিরকালীন ব্যঞ্জনা। ছোটগল্প জন্মলগ্ন থেকেই বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তির সমস্যা ও সংকটকে তুলে ধরে। বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থাকালীন সময়ে ছোটগল্পের সৃষ্টি হলেও কথিত সমাজব্যবস্থার কাছে গল্প লেখকেরা আত্মসমর্পণ করেননি।

'বাংলা ছোটগল্প কি মরে যাচ্ছে?' প্রবন্ধটি লেখা হয় ১৯৯০ সালে। লেখক মনে করেন বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের সংকট। রবীন্দ্রনাথের হাতে সার্থক ছোটগল্পের সৃষ্টি, তারপরেও প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রমথ চৌধুরী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখেরা আন্তর্জাতিক মানের গল্প লিখেছেন। সার্থক গল্পকারও পরবর্তী সময়ে আঙ্গিক বদল করে উপন্যাস

লিখেছেন। কারণ প্রকাশকের কাছে উপন্যাসের চাহিদা ছিল বেশি, শিল্পের চেয়ে আর্থিক লাভ লোকসানের হিসেবকে তারা গুরুত্ব দেন। সেই সময় পত্র পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাগুলোতেও উপন্যাসের প্রাধান্য ছিল। আশি নব্বইয়ের দশকে গল্প পড়ার স্থান নিয়েছে ভিসিআর। পাঠক মাত্রই নিজের সমস্যা সংকট, জীবন অনুভূতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষা গল্প উপন্যাসে দেখতে চান, আর তা না পেয়ে সাহিত্য বিমুখ হয়ে ওঠেন। প্রাবন্ধিকের মতে পৃথিবীতে শিল্পমানে উন্নত উপন্যাসের চেয়ে ছোটগল্প রচনার পরিমাণ কম। সৃষ্টির শুরু থেকেই উপন্যাসের চেয়ে ছোটগল্প কম রচিত হয়েছে, এখন তা আরও কম হচ্ছে বলে প্রাবন্ধিক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। এর কারণ হিসেবে ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যেকেই লেখক দায়ী করেছেন। যেমন– আকারে ছোট বলে এতে জীবনের পূর্ণায়ব আলোচনা থাকতে পারে না। জীবনের কোন একটি বিশেষ মুহূর্ত কোন বিশেষ পরিবেশের মধ্যে কেমন ভাবে লেখকের কাছে প্রত্যক্ষ হয়েছে তারই রূপায়ণ ছোটগল্প। স্বল্প সংখ্যক সুনির্বাচিত ঘটনার সাহায্যে ইঙ্গিতপূর্ণ পরিণতি লাভই ছোটগল্পের উদ্দেশ্য এবং সব সময় লেখককে বিশেষ একটি রস-পরিণামকে মুখ্য করতে হয়। কোন একটি বিশেষ সমস্যাকে কেন্দ্রবিন্দু করে লেখককে যথাযথ ভাবে নির্দিষ্ট করার এই সব শর্ত পালন করা সৃজনশীল লেখকের পক্ষে দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছে। জীবনের পরিধি বিস্তার এবং জটিল হওয়ার জন্য এখন একটি মাত্র অনুভূতি বা সমস্যার মধ্যে মানুষের জীবন আবদ্ধ নয়। সংকট ও সমস্যায় আবর্ত সমাজে জীবন আর এখন বিশেষ একটি পরিবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় তাই একটি বিশেষ রস পরিণামকে মুখ্য করতে গেলে চরিত্রটির উৎস যে সমাজ, তাকে যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় না আকার স্বল্পতার জন্য। ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য লেখক যতই মানুন, সমাজ পরিবর্তনশীল ও গতিশীল, প্রতিনিয়তই সমাজে রদবদল ঘটছে তীব্র গতিতে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষ এখন রাষ্ট্র নির্ভর। রাষ্ট্রের নিয়মে প্রতিটি মানুষকে হাজারো প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়ে এবং প্রযুক্তির কল্যাণে আধুনিক বিশ্বের সকল সুযোগ সুবিধার কথা অবহিত হয়েও বঞ্চিত জীবন যাপন করতে হয় বলে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সংজ্ঞার মধ্যে গল্প লেখক আর আবদ্ধ থাকতে পারেন না। প্রাবন্ধিক এ বিষয়ে রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তাঁর বক্তব্যের পক্ষে সমর্থন জোড়ালো করেছেন। যেমন রাষ্ট্রে সুস্পষ্ট কৃষিনীতি নেই বলে সারের মূল্য উর্ধ্বগতি, যা কৃষকের ক্রয় সামর্থ্যের বাইরে। পাটের দামের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই, তাই চাষীরা সর্বশান্ত হয়ে যাচ্ছে। খরা-বন্যায় ফসলের ক্ষতির পর কৃষক মহাজনের ঋণ শোধ করতে না পেরে জমি থেকে উৎখাত হয়ে ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়,

তাতেও জীবন-জীবিকার সংস্থান করতে না পেরে শহর যেয়ে শ্রমিক, কুলি মজুরে পরিণত হয়, কিন্তু রাষ্ট্রের কোন সহায়তা পায় না। সমাজে ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা বলা হলেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ব্যাহত হয় পদে পদে। পরিকল্পিত পরিবারের প্রতি সরকারের উদ্যোগ আছে কিন্তু খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসার সুনিশ্চিত ব্যবস্থা রাষ্ট্র করে না। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি নির্বাচনী অঙ্গীকার হলেও সাধারণ মানুষ নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পায় না। শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনে গণ-আন্দোলনে নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী প্রাণ দেন, কিন্তু সুযোগ বঞ্চিত হন তারা, ফায়দা লুটে কোটিপতিরা। প্রযুক্তির কল্যাণে টেলিভিশন কম্পিউটারে প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষও উন্নত দেশের সাম্প্রতিক জীবন যাপন দেখে কিন্তু নিজের জীবনের সাথে সামঞ্জস্য খুঁজে পায় না। উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা ও রকেট প্রেরণের খবর তারা জানে। উন্নত বিশ্বের এই চিত্র তাদের মনে যে চিত্রকল্প সৃষ্টি করে বাস্তবে এসে যখন দারিদ্র্যের মুখোমুখি হয় হাসপাতালে যেয়ে ঔষুধ তো দূরের কথা, ডাক্তারও পায় না তখন এই হতোদ্যম মানুষেরা নির্জীব জীবে পরিণত হয়। তখন তার গতি হয় পানি পড়া দেওয়া ইমাম সাহেব, ঝাড়ফুক দেওয়া গ্রাম্য কবিরাজ। জিন ছাড়ানোর নির্মম শিকার হয় তার সন্তানেরা। রবীন্দ্রনাথ জমিদার হয়ে গ্রাম্য চাষীদের এহেন দূরবস্থার কথা স্বচক্ষে দেখেছেন, যা রায়তের কথা, পল্লীপ্রকৃতি প্রভৃতি প্রবন্ধে এবং বিভিন্ন চিঠিপত্রে তার উল্লেখ করেছেন।

উনিশ শতকের বঙ্কিমচন্দ্র থেকে বিশ শতকের তিরিশ দশকের শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, চল্লিশ দশকের ওয়ালিউল্লাহর বর্ণনাতেও চাষীদের দূরবস্থার চিত্র উঠে এসেছে। কিন্তু বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের যুগের চাষীদের থেকে আজকের যুগের চাষীদের একটা পার্থক্য আছে, তা হলো আধুনিক প্রযুক্তির সাথে তাদের পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখের যুগে রেলগাড়ি আর টেলিগ্রামের তারের মধ্যে তাদের অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ ছিল, আজ সেই কৃষক শ্রমজীবীরা বিবিসি শোনে, টিভি দেখে, জমিতে শ্যালো মেশিনের প্রয়োগ সম্বন্ধে জানে। কিন্তু প্রযুক্তির ব্যবহার তার জীবনে সম্ভব হয় না। তার কাছে এসব রূপকথা –এই রূপকথা তার মধ্যে কল্পজগতের সৃষ্টি করে কিন্তু রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে তার রঙিন কল্পনা ফিকে হয়ে যায়। যখন প্রযুক্তির সাথে তার সম্পর্ক ছিল না তখন এই রূপকথা– কল্পকথাতে সে সুখ পেত। কিন্তু আধুনিক জীবনে সে জানে এক শ্রেণির মানুষ এইসব সুখ ভোগের অধিকারী। রূপকথার পক্সীরাজ ঘোড়ায় সেও চড়তে পারে না, গ্রামের জোতদার মহাজনও পারে না–এ বিষয়ে দুই শ্রেণির মধ্যে যে সমতা ছিল এখন তা নেই, এখন স্তর ভেদ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে শ্রেণির ব্যাপক মেরুকরণ হয়েছে। এখন ধনিক শ্রেণির মানুষ সে সুযোগ-সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ ভোগ করে তা গ্রামের চাষি তা পারে না। চাষিরা নিজেদের কাছে তাই আরো ছোট হয়ে গেছে।

শাসকদলের পরিবর্তন হলেও তাদের ভাগ্য পরিবর্তন হয় না। কেননা রাজনীতি আজ কোটিপতির করায়ত্ত। তাদের পেছন পেছন ঘোরাই এখন নিম্নবিত্ত মানুষের প্রধান রাজনৈতিক তৎপরতা, তারা দলের সমর্থক মাত্র। ক্ষমতা বদলের হাতিয়ার, তারা রাজা তৈরি করেন কিন্তু রাজা হতে পারেন না। আর কিং মেকারদের এক অংশ আবার রিলিফ পেলেই খুশি। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার মত– 'আমরা ভূসি পেলেই খুশি, ঘুসি খেলে বাঁচি না।' এনজিও গুলো মানুষকে স্বাবলম্বী করার চেষ্টায় ঋণ দেয়, হাঁস মুরগি পুষে ঋণের টাকা শোধ করে তারা সংসার চালায়। লেখক ঋণদাতাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের মনোভাব নিয়ে লিখলেন– 'সম্পদ যারা হাইজ্যাক করে নিয়ে গেছে, তা তাদের দখলেই থাকবে, ওদিকে চোখ দিও না। রাষ্ট্রক্ষমতা লুটেরা কোটিপতিদের হাতে, তাদের [illegible]তই ওটা নিরাপদে থাকবে, ওদিকে হাত দিতে চেষ্টা করো না।' লেখক মনে করেন এতে তাদের মানুষ হয়ে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা, অধিকার– আদায়ের স্পৃহা এবং অন্যায় সমাজব্যবস্থা উৎখাত করার সংকল্প চিরকালের জন্য বিনাশ করার আয়োজন চলছে। এই ঋণ গ্রহণ ও সুদ প্রদানের ব্যতিব্যস্তে তারা অধিকার আদায় ও অন্যায় সমাজব্যবস্থা উৎখাতের জন্য শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে না। নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী তাই ছোট থেকে আরও ছোট হয়। রূপকথা কল্পকথা বিচ্যুত হয়ে সংস্কৃতি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। লোক সংস্কৃতি গ্রহণের অভ্যাস লুপ্ত হয় আবার নতুন সংস্কৃতির স্পন্দন অনুভব করার সামর্থ তার থাকে না। এত প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে সমাজে যে মানুষটিকে চলতে হয়, তাকে নিয়ে গল্প লিখতে গেলে গল্পের একমুখীতার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা সম্ভব হয় না। এত সমস্যার মধ্য দিয়ে মানুষকে চলতে হয় যে কোন একক সমস্যা নিয়ে গল্প লিখতে গেলে অন্যটিও এসে যায়, কেননা সমস্যাগুলো একটির সাথে অন্যটি জড়িত। সমাজে ঘটে যাওয়া সমস্যাগুলো তুলে ধরে লেখক বলেছেন এত এত সমস্যা জর্জরিত মানুষ নিয়ে ছোটগল্প লেখা জটিল হয়ে পড়েছে বলে ছোটগল্প কম লেখা হচ্ছে।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রতিবাদী লেখক। সমাজের অসংগতিমূলক ভণ্ডামি আচার-আচরণ ও বিষয় দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। অযোগ্য লোক যোগ্য হওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমে সংস্কার রেওয়াজ প্রথা সব পালটে বুর্জোয়া হওয়ার সাধনায় ব্যস্ত। বাঙালি জাতীয়তাবাদের আন্দোলনকারী বাংলা বলতে সংকোচ করে, দেশের সংস্কৃতি-ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন করে সন্তানকে বিদেশে

প্রতিষ্ঠিত করে, ধর্মের লেবাসধারী ব্যক্তির হুইস্কি ছাড়া চলে না– এরকম সমাজের মানুষের চরিত্র ছোটগল্পে যথাযথ শনাক্ত করা গল্পকারের পক্ষে কঠিন। লেখক সমাজের ভন্ডামি অসংগতিগুলো চোখে আঙুল দিয়ে পাঠককে দেখিয়ে দিয়েছেন। যারা বিজ্ঞানচর্চা করেন না, তারাই টিভিতে বিজ্ঞান বিষয়ের টক শো করেন, বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার ধর্মগ্রন্থ থেকে চুরি বলে প্রচার করেন তথাকথিত বিজ্ঞানীরা। সংস্কৃতিশূন্য দেশে অপসংস্কৃতির ব্যাপক প্রসারে তরুণেরা দেশটিকে আজ বসবাসের অযোগ্য মনে করে মেধাবীরা বিদেশে পাড়ি জমায় কিন্তু কর্মসংস্থান করে তা প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা নেই, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ইচ্ছামত দেশ পরিচালিত। বেকারের গ্লানিবোধে তরুণেরা বিপথগামী হয়ে অনুভূতিহীন, স্পৃহাবঞ্চিত হয়ে আজ মৃত্যু পথ যাত্রী। এর মূলে রয়েছে অভাব। অভাব মোচনের অজুহাতে পুঁজিবাদী শক্তি আমাদের দেশে প্রভুত্ব বিস্তার করে চলেছে। এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দেশের মানুষকে অভাব থেকে উত্তরণে বাধা তাদের, মানুষ হয়ে বাঁচবার সংকল্পকে মুচড়ে ভেঙ্গে দেওয়ার চক্রান্ত করে। তাই মানুষের মধ্যে সমস্যা উত্তরণের চেয়ে সমস্যাকে এড়িয়ে যাবার প্রবণতাই বেশি লক্ষ্য করা যায়। আমাদের এই অবস্থাকে অর্থাৎ মানুষের স্পৃহা সংকল্পকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব কথাসাহিত্যিকদের। জীবনবোধ ও জীবনের মূল্যায়ণের দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে সাহিত্যিকেরা উপন্যাসে পরিবর্তন এনেছেন। কাহিনীর ধারাবাহিকতায় চরিত্রের পরিস্ফূটন অথবা চরিত্রের রূপায়ণে কাহিনীর গতিশীলতাই এখন উপন্যাসের পক্ষে যথেষ্ট নয়। গল্পে গল্পে উপন্যাসে যুক্ত হয় এখন নতুন মাত্রা অর্থাৎ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রের সাথে যুক্ত হয় বিভিন্ন ঘটনা, যা স্বতন্ত্র গল্প হিসেবেও রূপ পেতে পারে। যেমন লালসালু উপন্যাসে মজিদের সাথে যোগসূত্র এসেছে হাসুনির মা, তার বৃদ্ধ পিতা, আক্কাস, আমেনা বিবি, পীরসাহেব কাহিনী, এগুলো আলাদা আলাদা গল্প কিন্তু মজিদের সাথে যোগসূত্র করে উপন্যাস সৃষ্টি করা হয়েছে। শ্রীকান্ত উপন্যাসে আছে ইন্দ্রনাথ, অন্নদা দিদি, ছদ্মবেশী, নতুনদা, খোট্টামুলুকে বাঙালি মেয়ে, গহর গোসাই, অভয়া, কমললতা ইত্যাদি চরিত্র ও তাদের চরিত্রকেন্দ্রিক ঘটনা– যার সমন্বিত রূপ শ্রীকান্ত উপন্যাস। উপন্যাসের ঘটনাগুলো স্বতন্ত্র গল্পের উপাদান। গল্পে গল্পে গড়ে ওঠে উপন্যাসের আঙ্গিক। আবার একই গল্প নানা মাত্রায় নানা ভঙ্গিতে ছোটগল্পে রূপ পাচ্ছে। তাই লেখক বলেন ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখ কথা'য় এখন আর ছোটগল্প রচিত হওয়ার যুগ নেই। কেননা জীবন এখন আর ছোট নয়, কোন দুঃখও ছোট নয়। প্রতিটি ছোট দুঃখের ভেতর রয়েছে মস্ত প্রেক্ষাপট, তার জটিল চেহারা এবং তার উৎসও কুটিল, যেন ছোটগল্পের ছোট

দেহ জীবনের এত বড় প্রেক্ষাপট, জটিল চেহারার ভার বহন করতে পারছে না। কেননা সামান্য ও ছোট সংকট এখন একক কোন বিষয় নয়, তা সমাজের অন্যান্য ঘটনার সূত্রে উত্থিত হয়। সমস্যা সংকট, দুঃখ সুখ ভোগের মাত্রারও রয়েছে বৈচিত্র্য–একটি ঘটনা ও চরিত্রে থাকে হাজারো মানুষের প্রতিচ্ছবি, তাই ঘটনা ও চরিত্রের স্বভাবের গভীরতায় লেখককে তার বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করতে হয়। ও সব কারণেই ছোটগল্পের পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু পরিমানে কম। সাম্প্রতিক সময়কে উন্মোচন করার জন্য এই মাধ্যমটির সংস্কার প্রয়োজন বলে মনে করেন লেখক। তা হলেই প্রতিষ্ঠিত লেখকেরা এই শাখায় তাদের অবদান রাখতে উৎসাহী হবেন। ছোটগল্পের সনাতন রীতিতে যারা অভ্যস্ত তারা তার বাইরে যেতে চান না। প্রচলিত রীতির বাইরে ছোটগল্প লিখছেন লিটল ম্যাগাজিনের লেখকেরা– উভয় বাংলার লেখকেরা সাম্প্রতিক মানুষকে তুলে ধরার জন্য সনাতনী প্রথা ছেড়ে গল্পের নতুন ধারা তৈরি করছেন, নানা সংকটের কাটায় তা ক্ষতবিক্ষত বলে তার আঙ্গিক মসৃণ নয়। তবুও এই ধারা অব্যাহত থাকলে ছোটগল্পের শরীরে প্রাণ সঞ্চার হবে। কিন্তু তিনি মনে করেন প্রথা ভাঙ্গার নিয়মটি যদি চালু থাকে তবে ভবিষ্যতের লেখকরা অনুপ্রাণিত হবেন এবং প্রতিষ্ঠিত বড় মাপের গল্পকাররাও আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার কন্টকিত জটিল সমস্যাবলির প্রেক্ষাপটেই ঘটনা ও চরিত্রের সমন্বয় করে উৎকৃষ্ট ছোটগল্প রচনায় এগিয়ে আসবেন।

সংস্কৃতির ভাঙ্গা সেতু' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলোকে লেখক পাঁচভাগে সাজিয়েছেন। দ্বিতীয়ভাগের প্রবন্ধগুলোর কলেবর প্রথমভাগ থেকে ছোট, এতে প্রাবন্ধিক ব্যক্তির শৈল্পিক গুণের কথা লিখেছেন। সঙ্গীত, নৃত্য, কথাসাহিত্য, কবিতার চারজন দিকপালের প্রসঙ্গ লিখে বাংলা ও বাঙালির সংস্কৃতি চর্চার বিষয়ে এক বুদ্ধিদীপ্ত ঋদ্ধ দিক তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত বাঙালি সংস্কৃতির বিস্ময়কর ফসল। আমাদের সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথের গান এক অনন্য শ্রেষ্ঠতায় অধিষ্ঠিত, তাই রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিনষ্টি বাঙালির আত্মস্বরূপের মৃত্যু, রবীন্দ্রনাথের গানের সংগতি নষ্ট হলে বাঙালির ঐক্যে ভাঙন ধরবে। এদেশের শাসক শ্রেণি এবং বাঙালি সংস্কৃতির শত্রুরা তা জানতেন বলেই '৪৭ এর দেশভাগের পর থেকেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য শিল্প ও সঙ্গীতের উপর আঘাত করে আসছে। 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের শক্তি' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিকের বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাপ্রসূত বক্তব্যে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাস প্রকাশ পেয়েছে। ১৯৫৮ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হলে দেশে সেনাশাসন বিরোধী প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। সেনাশাসক সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে এই দেশে দমননীতি চালায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পথে তিনটি বড়

ঘটনা ধরা হয়, তা হলো রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্টের বিজয় ও একষট্টিতে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী পালন। সেনাশাসনের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে সেনাশাসনকে চ্যালেঞ্জ করে ঢাকায় উদযাপিত হয় রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী। যা আইয়ুব শাসনযন্ত্রের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল, দুর্বল করে দিয়েছিল তাকে। একষট্টির রবীন্দ্র বিদ্রোহের সৈনিকেরা দ্রোহটিকে জ্বালিয়ে রাখতে ছায়ানট গড়ে তোলেন ১৯৬৩ সালে। ছায়ানটে গীত রবীন্দ্রসঙ্গীত এক অভাবিত মাত্রায় উন্নীত হয়ে জনারণ্যে ছড়িয়ে তা হয়ে ওঠে মানব মুক্তির হাতিয়ার, সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অস্ত্র। বিশিষ্ট জনেরা বলেন মুক্তিযুদ্ধের বিজয় কেতনে আঁকা ছিল রবীন্দ্র আলেখ্য। রবীন্দ্রনাথের গান পুরো ষাটের দশক এবং মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিকে সংগ্রামে জয়ী হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। বাঙালি সংস্কৃতি ও রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রতিরোধ করার জন্য এক বিশেষ গোষ্ঠী দোভাষী ইসলামি মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে আরবীয় সংস্কৃতি আমদানী করে ইসলামি তাহজিব তমুদ্দুন গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছিলেন কিন্তু তথাকথিত পাকিস্তানি সংস্কৃতির অজুহাতে প্রগতিশীলদের প্রচেষ্টায় সেই সময়ের পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা কখনো স্তিমিত হয়নি– একে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বলেছেন রবীন্দ্রস্নঙ্গীতের শক্তি। রবীন্দ্রনাথের গান চিনিয়ে দেয় নিজেকে, মানুষকে, সমাজ, দেশ ও বিশ্বকে, ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ রহিতকরণ উদ্দেশ্যে যে সামাজিক, রাজনৈতিক আন্দোলন হয়, রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেমের গান জনগণকে প্লাবিত করেছিল, সরকারি প্রচার মাধ্যম শত চেষ্টা করেও তা বন্ধ করতে পারেনি। এই গান ভাষা আন্দোলন; ৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান ও '৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রামে শক্তি জুগিয়েছিল। সরকারি রক্তচক্ষু এদেশের সুস্থ সংস্কৃতি চর্চায় বিঘ্ন ঘটাতে পারেনি বরং শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীদের সামরিক অপশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি দিয়ে উদ্বুদ্ধ করেছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে পাশ্চাত্যের ব্যান্ড মিউজিক তরুণদের মধ্যে প্রসার লাভ করলেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা ও চর্চায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি বরং বেড়েছে। রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করার অপচেষ্টা এদেশের শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমনা মানুষের সমর্থন পায়নি। প্রাবন্ধিক মনে করছেন সাম্রাজ্যবাদ পুষ্ট ধর্মান্ধরাই রবীন্দ্রচর্চার বিরোধিতাই মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। সাধারণ মানুষের সাথে সম্পর্কহীন এই ধর্মান্ধদের অপতৎপরতা ষাটের দশকের সংঘবদ্ধ সংস্কৃতিকর্মীদের প্রতিহত করতে পারেনি। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিশেষ অনুরাগ বা ভক্তি নয়, তাঁর গানের আবেদনই তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল।

বিদেশি সাহায্য সংস্থানসমূহ ধর্মান্ধ অপশক্তিকে হাত করে রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব করে ব্যক্তির স্বাভাবিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালায়

কিন্তু আধুনিক সমাজের শিক্ষা পাশ্চাত্য প্রভাব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে ব্যক্তির স্বত:স্ফূর্ত বিকাশ সমাজে ঘটছে। প্রাবন্ধিক বলেছেন– 'এই ব্যক্তির একান্ত অনুভব সবচেয়ে বেশি সাড়া পায় রবীন্দ্রসঙ্গীতে। তাই এই পঙ্গু বা রুগ্ন ব্যক্তিটিকে বারবার যেতে হয় গানের কাছেই।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে আমাদের সমাজের প্রতিকূলতায় যে ব্যক্তির বিকাশ ঘটেছে লেখক তাকে পঙ্গু, রুগ্ন বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের সমাজে শক্ত সামর্থ, ব্যক্তিত্ববান মানুষ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, কেননা তিনি মনে করতেন ব্যক্তিত্ববানরাই আত্মকেন্দ্রিক হয় না, শক্তিমান মানুষ জনগোষ্ঠীর কল্যাণে দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে বলে মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন ব্যক্তিত্ববান মানুষের সমবেত শক্তি মানবতাবিরোধী অচলায়তন ভাঙতে পারে। সোভিয়েত রাশিয়াতে যেয়ে সেখানকার সমাজ ব্যবস্থা দেখে তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে নিজের দেশে তার প্রতিফলন দেখার প্রত্যাশা করেছিলেন। প্রগতিশীল মানবতাবাদী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে বাঙালিকে জাতীয় চেতনায় উন্নীত করার শক্তি অনুভব করেছেন। তিনি মনে করেন শক্ত সামর্থ ব্যক্তিগঠনে রবীন্দ্রসঙ্গীত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, শক্তসমর্থ ব্যক্তি গঠনে রবীন্দ্র সঙ্গীতের অসাধারণ ক্ষমতা এবং তাঁর গান জাতির প্রেরণা।

অবিভক্ত বাংলার রক্ষণশীল মুসলমান সমাজের আধুনিক নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরী। প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তি তার উপভোগ, অনুভব ও অনুভূতিকে মানুষের কাছে তুলে ধরতে চায়। সে তার বিশাল আনন্দ, ব্যথার বেদনা ও উপলব্ধি বোঝানোর জন্য ভাষা ছাড়াও অন্য শিল্প মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারে। মানুষ তার তীব্র ও গভীর মুহূর্তগুলো যেমন ভাষায় প্রকাশ করেন তেমনি তা প্রকাশ করা যায় কবিতা, সঙ্গীত, ছবি, অভিনয় এবং নাচের মাধ্যমে। নাচের এমন একজন গ্রিস দেশের শিল্পীর গৌরচন্দ্রিকায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এদেশের প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরীর নৃত্যকলার পরিচয় উপস্থাপন করেছেন 'বুলবুল চৌধুরী' নামের প্রবন্ধে। আধুনিক গ্রিক কথাশিল্পী নিকোস কাজানজাফিসের 'জোবরা দি গ্রিক' নামের উপন্যাসের নায়ক নৃত্যশিল্পী জোবরা একজন মহৎ শিল্পীর বিরল সৃষ্টি যিনি পুত্রের মৃতদেহের সামনে নেচে শোকের গভীর ভারবহতা থেকে মুক্তির পথ চেয়েছিলেন। এই জোবরার সাথে প্রাবন্ধিক বুলবুল চৌধুরীর তুলনা করেও পার্থক্য দেখিয়েছেন। জোবরা মহৎ শিল্পীর সৃষ্টি আর বুলবুল চৌধুরী নিজেই নিজের সৃষ্টি, তিনি শিল্পী এবং শিল্প। বুলবুল চৌধুরী মানুষের অস্তিত্বের মূল সত্যের অনুসন্ধান করেছেন এবং তা প্রকাশ করেছেন। অস্তিত্বের শ্রেষ্ঠতম

বিষয়কে জীবনব্যাপী অনুসন্ধান করে তা তিনি উপন্যাস, গল্প ও নাটকের মধ্যে প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর স্বল্পায়ু (১৯১৯, ১ জানুয়ারি- ১৯৫৪, ১৭ মে) জীবনে নাটক ও সিনেমায়ও অভিনয় করেছেন। কিন্তু নিজের সত্য অনুসন্ধান ও উপলব্ধি প্রকাশের জন্য নাচকেই তিনি উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন অর্থাৎ তাঁর গভীর ভাবনাবোধ ও চেতনা শরীরে একাত্মতা লাভ করেছিল। জীবন ও অস্তিত্বের মূল সত্যটিকে প্রকাশ করার জন্য অন্য মাধ্যমকে অসম্পূর্ণ মনে করে নিজের দেহকে ব্যবহার করে নিজের অনুভব ও উপলব্ধিকে প্রকাশ করেছেন রক্ষণশীল মুসলমান মনোভাবের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে। নৃত্যশিল্পকে জনপ্রিয়তা ও সামাজিক মর্যাদায় উন্নীত করার চেষ্টা তিনি করেছেন। নাচের প্রতি তাঁর সমসাময়িক কালের রক্ষণশীল সমাজের বিরূপ মনোভাব তিনি দূর করতে চেয়েছিলেন। তাই রশীদ আহমদ চৌধুরী ১৯৩৭ সালে বুলবুল চৌধুরী ছদ্মনাম গ্রহণ করেন।

১৯৪৯ সালে পাকিস্তানের জাতীয় নৃত্যশিল্পী হিসেবে খেতাব পাওয়া বুলবুল চৌধুরী মানুষের রসসৃষ্টির মধ্যে নৃত্যকে সীমাবদ্ধ না রেখে এর মাধ্যমে জীবন সম্পর্কে তাঁর জিজ্ঞাসা ও উপলব্ধিকে প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। এ জন্য তিনি নৃত্য শিল্পে মুদ্রার প্রদশর্নীর চেয়ে মানুষের আনন্দ বেদনার স্বরূপকে স্পষ্ট রূপ দেওয়ার উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

জীবনের প্রথম থেকেই এই নৃত্যশিল্পী প্রথাগত নাচের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে জীবনের অতি পরিচিত সত্য এবং স্বপ্নময়তার সাথে বাস্তবের সংঘাতকে নতুন ভাবে তুলে ধরেন। নৃত্যে একজন ব্যাধের পাখি শিকারের (কচ ও দেবযানী) প্রচেষ্টা ও তার সফলতা, হাফিজের স্বপ্ন, ব্রজবিলাস প্রভৃতি নৃত্যের সফল উপস্থাপনায় নিজের ও সমাজের বিক্ষুব্ধ ও ক্লান্ত মনোভাবকে তিনি ধ্রুপদরীতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। ধ্রুপদ নৃত্যকলার প্রচলিত মুদ্রা ও আঙ্গিকেই তাঁর তাৎপর্যময় রোমান্টিক চেতনায় দর্শক নিজের জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি করে উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন।

সমাজের রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে বুলবুল চৌধুরী বেশিদিন রোমান্টিকতার ফাঁদে আটকে থাকতে পারেননি। জীবন ও অস্তিত্বের সত্যকে অনুসন্ধান করতে যেয়ে দেখেন মানুষের দুঃখ বেদনা ক্ষোভের কারণ হলো সমাজের এক শ্রেণির লোভী ও স্বার্থপর মানুষের অনৈতিক ঘৃণ্য কার্যক্রম। তাদের লোভেই পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারি। মানবসৃষ্ট এই দুর্যোগের উপলব্ধিকে ভারতীয় ধ্রুপদ নৃত্যের কলা ও আঙ্গিকে তিনি মহাবুভুক্ষা বা ব্লাক আউট-নামে নৃত্যরূপ দিয়েছেন মানুষের মধ্যে আবেগ সৃষ্টি করে সাড়া জাগাবার জন্য। শিল্পকর্ম দিয়ে তিনি মানুষকে তার অং মান ও

গ্লানির বিরুদ্ধে সংগ্রামী চেতনায় জাগিয়ে তুলে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। মহৎ শিল্পী তাঁর উপলব্ধি প্রকাশে নাচকেই শক্তিশালী মাধ্যম মনে করে দেশীয় লোকসংস্কৃতির। পাশে পাশ্চাত্য লোক নৃত্যকেও গ্রহণ করেছিলেন। কেননা লোক সংস্কৃতি শ্রমজীবী মানুষের জীবনধারনের উপাদান এবং জীবনযাপনের অংশ। এই প্রতিভাবান নৃত্যশিল্পীর হাতে লোক সংস্কৃতি। নতুন মাত্রা পেয়েছে, শ্রমজীবী মানুষের পেশা এবং জীবন যাপনের সংস্কৃতি অবিচ্ছিন্ন, তাদের কাজকে তিনি শিল্পকর্মে উন্নীত করেছেন– জেলের জাল ফেলার ভঙ্গি, কৃষকের লাঙ্গল চষা, মাঝির নৌকা বাওয়া–ইত্যাদি পেশাজীবীদের সংস্কৃতিকে তিনি নাচের ভেতর দিয়ে অর্থবহ করে মানুষের কাছে তাঁর বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন। তাদের পেশাগত শারীরিক শ্রমের।

সংস্কৃতিকে তিনি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে শিল্পের মহিমা দিয়েছেন। নৃত্যকলায় লোক সংস্কৃতির এরকম ব্যাপ্তি এই উপমহাদেশে একমাত্র বুলবুল চৌধুরীই দিতে পেরেছেন। তিনি গ্রামের লোকসংস্কৃতিকে শহরে আনার এবং লোক সংস্কৃতিকে শুধুমাত্র সংরক্ষণের পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি মানুষের সুকুমার প্রবৃত্তির আবেগময় প্রকাশের জন্য ভারতীয় ও ইরানি পুরাণ ও গাথা ব্যবহার করেছেন। নৃত্যের মাধ্যমে সামাজিক কাঠামোর অনাচারগুলো তুলে ধরে তিনি নৃত্যকে গতিশীল করে নতুন মাত্রা দেন। নিজের আবেগ, বিশ্লেষণ, অনুভূতি ও জ্ঞানকে তিনি শারীরিক ছন্দে রূপায়িত করে তুলেছেন।

প্রাবন্ধিক এই প্রবন্ধে বলেছেন ছন্দ শব্দ বাক্য প্রতীক উপমা রূপক প্রভৃতিতে প্রেম, ভালোবাসা, প্রতিবাদ নিয়ে বাংলা কবিতার একটা মান তৈরি হয়েছে, পাঠযোগ্য অনেক কবিতার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তাঁর মতে– 'বাংলা কবিতা এখন শিল্পের আনন্দ ও কম্পন, বেদনা ও ভার এবং সংশয় ও সংকল্প থেকে বঞ্চিত। নৃত্যকলা, সংগীত, নাটক, উপন্যাস ও চিত্রকলা সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য।' অর্থাৎ শিল্প চর্চা আজ সৌখিন সংস্কৃতি চর্চায় পরিণত হয়েছে। প্রাবন্ধিক মনে করেন আমাদের শিল্প সংস্কৃতির এই অবস্থা থেকে বুলবুল চৌধুরীই একে উদ্ধার করতে পারতেন। কারণ জীবনের প্রতি সশ্রদ্ধ ও সতর্ক পর্যবেক্ষণের গুণে সমাজ, মানুষ ও ব্যক্তিকে গভীরভাবে জানার শক্তি ও স্বচ্ছ দৃষ্টি ছিল বুলবুল চৌধুরীর। তিনি কোন তত্ত্ব ও আবেগ দ্বারা চালিত হননি। সংস্কারের প্রবণতার চেয়ে বিপ্লবের প্রতি তাঁর আস্থা ছিল বেশি। নিজের উপলব্ধির প্রতি তিনি সচেতন ছিলেন, তিনি বিশ্বাস করতেন সব কিছুর উৎস মানুষের চেতনা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে তিনি ১৯৪০ সালে তাঁর নাচের দল নিয়ে ঢাকায় এসে অনেক নাচের অনুষ্ঠান করেন, দেশ ভাগের পরে পাকিস্তানের উভয়

অংশে নাচের কনসার্ট করেন। তাঁর দল নিয়ে ব্রিটেন, আয়ারল্যান্ড, হলান্ড বেলজিয়াম, ফ্রান্সে যেয়ে নৃত্য পরিবেশ করেন। নাচ বিষয়ে তিনি লেখালেখি ও নৃত্যনাট্যের কোরিওগ্রাফি করেছিলেন। এবং প্রাচ্যদেশীয় চারুকলা সংগঠন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছিলেন। তিনি ১৯৫৪ সালের ১৭ মে কলকাতায় মারা যান। তাঁর স্মরণে ১৯৫৫ সালে ১৭ মে বুলবুল ললিতকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যের প্রাথমিক যুগের একজন প্রথম সারির কথা সাহিত্যিক শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৯)। চল্লিশের দশক থেকে আমৃত্যু তিনি ছিলেন কথাসাহিত্যের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব। সাহিত্যিক হিসেবে সামাজিক দায়িত্ববোধ তাঁর প্রখর ছিল। অন্যায় অনাচারের বিরুদ্ধে ঘৃণা বিদ্রূপ প্রকাশ করতে যেয়ে অনেক সময়ই তাঁর সাহিত্যের শিল্পরূপ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। 'জাহান্নাম হইতে বিদায়' উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে শওকত ওসমানের বিবেক। স্বদেশত্যাগী বাঙালির প্রতিক্রিয়া রয়েছে এই উপন্যাসে। নেকড়ে অরণ্যে' স্বাধীনতা যুদ্ধের নির্যাতিত নারীদের আলেখ্য, এতে রয়েছে মেহনতি মানুষের প্রতি শওকত ওসমানের শ্রদ্ধা। জন্ম যদি তব বঙ্গে' গল্প গ্রন্থে গল্পে গল্পে তিনি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা করেছেন। ষাটের দশকে ক্রীতদাসের হাসি উপন্যাসে আইয়ুবী আমলের স্বৈরাচারী শাসকের মোকাবেলা করেছেন রূপকথার রাজ্যে বিচরণ করে হারুনর রশীদের বাগদাদের কাহিনীর আলোকে। এই শওকত ওসমানকে নিয়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এই প্রবন্ধে শিল্পী সম্পর্কে চিন্তা চেতনা, অনেক প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যক্তি শওকত, তাঁর গল্প-উপন্যাস, উপন্যাস রচনায় প্রস্তুতি, সামাজিক অবস্থা, সমাজ সাহিত্য সম্পর্কে চিন্তা চেতনা, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে শওকত ওসমানের অভিমত প্রাবন্ধিক তুলে ধরেছেন। পাঠকের দৃষ্টিতে প্রাবন্ধিক শওকত ওসমানের কয়েকটি সাহিত্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের উল্লেখ করেছেন তেমনি শিক্ষার্থীর দৃষ্টিতে শিক্ষকেরও মূল্যায়ন করেছেন। ব্যক্তি শওকত ওসমানের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শওকত ওসমান দীর্ঘকাল ধরে অনেক গল্প লিখেছেন তার জুনু আপা অন্যান্য গল্প পিঁজরাপোল (১৯৫১); সাবেক কাহিনী (১৯৫৩) সালে, প্রস্তর ফলক ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যান্য গল্পগ্রন্থ– উপলক্ষ, উভশৃঙ্গ নেত্রপথ ইত্যাদি।

প্রাবন্ধিক তাঁর পঠিত শওকত ওসমানের আব্বাস, জুনু আপা গেঁহু, ইমারত গল্প ও জননী উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া দিয়ে 'শওকত ওসমানের প্রভাব ও প্রস্তুতি' প্রবন্ধটি শুরু করেছেন। প্রথম জীবনের সেই গল্প উপন্যাসে

খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি শওকত ওসমানের সহমর্মিতা প্রাবন্ধিককে স্পর্শ করেছিল। এই প্রকৃত জীবনশিল্পী শোষিত নির্যাতিত মানুষের পক্ষে ছিলেন।

বালক আব্বাসকে মায়ের স্নেহ বঞ্চিত হয়ে জীবিকা অন্বেষণে শহরে যেতে হয়েছে। জুনু আপার কষ্ট, মালগাড়ির ওয়াগনে নিরন্ন শিকড়হীন বিহারী পরিবারের ঘরকন্না– শেকড় ছেড়া মানুষের দু:খ গেহু গল্পে প্রকট, মুক্তি সংগ্রামে বিপক্ষ বিহারী সম্প্রদায়ের প্রতি লেখকের মানবিকতা, থুথু গল্পে শোষণের প্রতি ঘৃণা, জননী উপন্যাসে বাংলার কৃষক সম্প্রদায়ের সমস্যা ও সংকট সম্পর্কে লেখকের অনুভূতিতে লেখক ও পাঠক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সমান্তরাল।

প্রাবন্ধিক এই প্রবন্ধে অনেক বিষয় উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে ১৮১৭ সালে লেখা মোজাম্মেল হকের জোহরা উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। জোহরার ভাষা ও কাহিনী দুর্বল, শিথিল, মুসলমান পাত্র-পাত্রী আছে কিন্তু মুসলমান সমাজের চিত্র পাওয়া যায় না। ইতিহাস ও সমাজ বদলের একজন দায়বদ্ধ লেখক ছিলেন শওকত ওসমান। সারা জীবন তিনি মানবতন্ত্রের নীতি অনুসরণ করেছেন।

শওকত ওসমানের গল্প উপন্যাস নয়, ব্যক্তি শওকত ওসমানকে তিনি তুলে ধরেছেন এই প্রবন্ধে। সমাজের কোন অবস্থায় উপন্যাস সৃষ্টি হয়, ব্যক্তির বিকাশের সাথে উপন্যাস রচনার সম্পর্ক, এদেশে ইউরোপের রেনেসাঁসের প্রভাব, উনিশ শতকের বাংলায় সংস্কারমূলক আন্দোলন, সামন্ত সমাজের অবসান, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, বুর্জোয়া সমাজের বিকাশ, সমাজের পুঁজির প্রভাব, সমাজে সমাজতন্ত্রের অপরিহার্যতা ইত্যাদি সম্পর্কে শওকত ওসমানের প্রাজ্ঞ, স্বচ্ছ, শাণিত ও বুদ্ধিদীপ্ত অভিজ্ঞতার জন্য তিনি একজন বড় মাপের সাহিত্যিক। সমাজ পরিবর্তনের সাথে তাঁর চিন্তা চেতনায়ও পরিবর্তন এসেছে। অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণ এবং ন্যায়ের পক্ষে সোচ্চার কণ্ঠস্বর ছিল শওকত ওসমানের।

রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারকে শওকত ওসমান ধিক্কার দিয়েছেন, গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল। শ্রেণি সংগ্রামে তাঁর আস্থা ছিল অবিচল। সাহিত্যপাঠে পাঠকের রুচি ও মতকে শওকত ওসমান গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষার্থীদের উপর নিজের মতামতকে তিনি চাপিয়ে দিতেন না। ব্যক্তিত্বের গুণে তিনি ছাত্রদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন, যদিও ছাত্রদের সাথে তাঁর দূরত্ব ছিল। নিজের লেখা সম্পর্কে অন্যের মতামত চাইতেন এবং পাঠকের মতামতকে গুরুত্ব দিতেন, অন্যের লেখার প্রশংসা

করার মত তাঁর উদার মানসিকতা ছিল। ছাত্রদের কৃতিত্বে তিনি গর্ববোধ করতেন। নিজের লেখা সম্পর্কে পাঠকের মতামত জানতে তিনি আগ্রহী ছিলেন। নিজের পূর্বতন রচনার চেয়ে বর্তমান সৃষ্টিকর্মের উপর মতামতকে গুরুত্ব দিতেন। স্পষ্টবাদী শওকত ওসমান সাহিত্য সমালোচনায় কারো মনরক্ষার তোয়াক্কা করেন নি।

শিক্ষাজীবনে ও সাহিত্য জীবনে প্রাবন্ধিক ইলিয়াস শওকত ওসমানের সান্নিধ্যে এসেছিলেন বলে তাঁর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে জানার সুযোগ পেয়েছিলেন। সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত জীবন, জীবনাচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি পাঠকের জানা থাকলে সাহিত্যিকের বিচার বিশ্লেষণ পাঠকের পক্ষে সহায়ক ও সহজ হয়। এই তত্ত্ব আখতারুজ্জামান ইলিয়াস জানতেন বলে শওকত ওসমানের ব্যক্তিগত জীবনের তথ্য তিনি দিয়েছেন, যাতে বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণির এই সমকাল সচেতন কথাসাহিত্যিকের সমসাময়িক কালের মানুষ, রাজনীতি, আন্দোলন সংগ্রাম, সংঘাত, নানা ঘটনা-দুর্ঘটনা, যুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন সাধারণ মানুষ ধারণ করে অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হতে পারে। এই সব বিষয়ে শওকত ওসমানের প্রতিক্রিয়া তীব্র, এই তীব্র প্রতিক্রিয়াকে তিনি ছোট ও তীক্ষ্ম বাক্যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, বিদেশি শব্দ প্রয়োগে প্রকাশ করে তাঁর ক্ষোভ ও বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। প্রাবন্ধিক এ প্রসঙ্গে বলেছেন– 'তাঁর ব্যঙ্গ প্রায়ই ছাপিয়ে ওঠে তাঁর বক্তব্যকে, গল্পের চরিত্রের স্বভাব ও আকার উপচে ওঠে তাঁর প্রতিক্রিয়া।' তাঁর প্রথম পর্বের লেখা থেকে শেষ পর্বের সাহিত্যে পালা বদল ঘটেছে। কিন্তু সব লেখায় তাঁর মেধা, দৃষ্টি, অর্ন্তদৃষ্টি, শিল্পনৈপুণ্য ও শিল্পবোধের পরিচয় রয়েছে। সমসাময়িক কালের দেখা ও শোনা যাবতীয় ঘটনা ও বিষয় নিয়ে শওকত ওসমান যা লিখেছেন তা মহৎ। এই প্রাচীন দেশের সংগ্রামী জনগোষ্ঠীর হাজার বছরের স্বপ্ন, সংকট, উদ্যম, আশা-আকাঙ্ক্ষা, দু:খ বেদনার বিশাল ও গভীর কাহিনী নিয়ে তাঁর যে শিল্পসৃষ্টি তা আমাদের পরবর্তী কথা সাহিত্যের উত্তরসূরীদের ভিত্তি। এই জন্য শওকত ওসমান আমাদের কথা সাহিত্যের অনুসরণযোগ্য ব্যক্তিত্ব। শওকত ওসমানের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ চরিত্র উপস্থাপন করে প্রাবন্ধিক ইলিয়াস এই কথাশিল্পীর মানবধর্মী সাহিত্যের পাঠ পাঠকের কাছে সহজ করেছেন।

স্মৃতির শহর কবি শামসুর রাহমানে ১০৮ পৃষ্ঠার আত্মজীবনীমূলক বই। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস 'স্মৃতির শহরে কবির জাগরণ' প্রবন্ধে সেই স্মৃতিচারণমূলক বইটির আলোচনা সমালোচনা করেছেন। তাঁর অন্য আত্মজীবনীমুলক বইটির নাম 'কালের ধূলায় লেখা'। প্রবন্ধটি ১৯৮০ সালে সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়। স্মৃতির শহর কবি শামসুর রাহমানের শৈশব

ও বাল্যকালের স্মৃতিচারণ। এর ভেতর দিয়ে উঠে এসেছে পুরোনো ঢাকার আংশিক ইতিহাস। এতে নস্টালজিক কবির ভালবাসার প্রকাশ ঘটেছে বেদনার মধ্যে। পরিণত বয়সে পুরনো ঢাকার সাথে তাঁর শারীরিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে কিন্তু নাড়ির বন্ধন অটুট ছিল। যা তাঁর কবিতার ভূমিতে শিকড় গেড়েছে। শৈশব কালের স্পন্দন পরিণত বয়সেও তাঁর মনে অনুরনণ তুলেছে। দেশত্যাগী বন্ধুদের জন্য তিনি স্মৃতিকাতর হন। রাজহাসের স্মৃতিও এই সংবেদনশীল কবিকে কাঁদায়। তাঁর কবিতায় রঙিন শৈশবকাল কঠিন বর্তমান কালকে বিবর্ণ করে তোলে। চিত্রশিল্পী, হাঁস প্রভৃতি নিয়ে কবির ভাবালুতা এবং আবেগ প্রাবন্ধিক সমালোচনা করেছেন, তিনি মনে করেন এই ব্যক্তিগত আবেগ কবিতায় সর্বজনীনতা আনার পক্ষে অন্তরায়। স্মৃতি প্রকাশে ধারাবাহিকতা না থাকায় এবং পুনরাবৃত্তিতে কোন বিশেষ সময়ের ঢাকার সামাজিক ইতিহাস জানা যায় না। গদ্যের শিথিল বিন্যাসে বিভিন্ন চরিত্র, ঘটনা, দৃশ্য ও অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন শামসুর রাহমান। প্রাবন্ধিক এই প্রবন্ধে শামসুর রাহমানের গদ্য ও কবিতার ভাষার সমালোচনা করেছেন। স্মৃতির শহর গদ্যের স্বচ্ছন্দ গতি উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলংকারের ভারে ঋজু হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। উদাহরণ দিয়ে প্রাবন্ধিক শব্দ প্রয়োগের যথার্থতা নিয়ে লিখেছেন যাতে বাক্যের ওজস্বিতা নষ্ট হয়েছে, ভাব পরিস্ফূট হয়নি। ঢাকা শহরের রাজনৈতিক ও সামাজিক তৎপরতার কথা বলতে কবির ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের বর্ণনা পাঠককে গভীরভাবে স্পর্শ করে। দুর্ভিক্ষে মধ্যবিত্ত শ্রেণির খাদ্যাভাসের পরিবর্তন, মানুষের দুর্বিসহ ক্ষুধা ও জীবিকার ব্যর্থ অন্বেষণে শহরে চলে আসার মর্মস্পর্শী বর্ণনা আছে। ঢাকার ঐতিহাসিক স্থাপনার বর্ণনার সাথে সেখানকার হতশ্রী চেহারার কথাও আছে স্মৃতির শহরে। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের আগে এই দেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চার পাঁচ দশকের অনেক উপন্যাসেই লেখা হয়েছে, দাঙ্গার প্রসঙ্গ তাঁর স্মৃতি কথাতেও এসেছে ক্ষোভের সাথে। শামসুর রাহমান আজীবন ধর্মান্ধ মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন, বিবৃতি বর্ণনায় তা লিখেছেন, অভিজ্ঞতা সংযোজন করেননি, যা পাঠককে নাড়া দিয়ে ভয়াবহতা উপলব্ধি করাতে পারে। স্বাধীনতা আন্দোলন তাঁর কবিতায় যতটা সার্থক স্মৃতির শহরের গদ্যে তা স্বতস্ফূর্ত হতে পারেনি যতটা স্বতস্ফূর্ত হয়েছে সিপাহী বিদ্রোহের তীব্রতা। শেষ অধ্যায়ে রয়েছে তাঁর কাব্য চর্চার প্রস্তুতির কথা। এই বইটিতে রয়েছে একটি বালকের কবি হয়ে ওঠার গল্প। স্বৈরাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে মানুষের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধকে তিনি কাব্যরূপ দিয়েছেন যার উপকরণও তিনি ঢাকা শহর থেকেই নিয়েছেন। রাজধানী ঢাকা সকল

আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু– এখানে সংঘটিত ঘটনাবলীর সাহসী উচ্চারণ রয়েছে তাঁর কবিতায়। জন্ম শহর ঢাকাতেই তিনি আজন্ম বাস করেছেন, জীবনের বিভিন্ন স্তরে প্রবেশ এবং তা প্রকাশ করতে এই ঢাকা শহরকেই মাধ্যম করেছেন। স্মৃতির শহর ঢাকার ইতিহাসে হয়ে ওঠার সুযোগ থাকলেও তা হয়নি।

৬০-এর দশকের একজন প্রতিষ্ঠিত কবি ও গল্প লেখক শহীদুর রহমান, বর্তমান পাঠকের কাছে প্রায় অপরিচিত, নব্বই এর দশকে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁকে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করে শিল্পীর দায়িত্ব পালন করেছেন। যে কোন শিল্পের চারিত্র্য তার রচনাকালের মেজাজ ও ইতিহাসকে ধারণ করে। রচিত সময়ের মানদন্ডে গল্পের চরিত্র বিচার হয়, আবার গল্পের মূল্য বিচার করে লেখকের কালের পরিচয় পাওয়া যায়। আগের লেখা কয়েকটি প্রবন্ধের মত 'ক্ষুব্ধ শহীদ, ক্লান্ত শহীদ' রচনায় প্রাবন্ধিক সাহিত্যিক ও ব্যক্তি শহীদুর রহমানকে সমান্তরাল করে প্রকাশ করেছেন। সাহিত্যিকের মেজাজ ও তাঁর সাহিত্যের চরিত্র এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক পাশপাশি আলোচনা করেছেন। ষাটের দশক আইয়ুবের সামরিক শাসনের উপদ্রবের যুগ। রাজনীতি, রাজনীতিবিদ, আন্দোলন প্রতিবাদে তখন উত্তাল পূর্ব পাকিস্তান, তাতে সামাজিক গতিশীলতা। আন্দোলন করে রাজনীতিকরা তার প্রতিকারে নেমেছিলেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি সামরিক শাসকের যাতাকলে পিষ্ট তরুণ সমাজ নিজেদের ভেতরের উত্তেজনা, ভেতরের গ্লানি ও অপমান বিস্ফোরিত করার পথ না পেয়ে তা বিভিন্ন সাহিত্যপত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেন, এই সময়ে প্রকাশিত পত্রিকার অন্যতম 'স্বাক্ষর' কবিতাপত্র। তরুণ কবিরা কবিতার আঙ্গিকে নিজের ভেতরের ছাইচাপা আগুনকে ঐ কবিতাপত্রে প্রকাশ করেন। সুসংবদ্ধ বাণী বিন্যাসে কবিতার শরীরে লাবণ্য আনার চেয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর হাতিয়ার হিসেবেই এর ব্যবহার তখন মুখ্য ছিল। 'স্বাক্ষর' এর প্রথম সংখ্যার কবি ছিলেন আবদুল মান্নান সৈয়দ, আসাদ চৌধুরী, রফিক আজাদ, শহীদুর রহমান প্রমুখ। এঁরা সমসাময়িক কবি। পরে মান্নান সৈয়দ শুধু কবিতাতেই তাঁর মেধা বিকাশ সীমাবদ্ধ রাখেননি। সাহিত্যের সব আঙ্গিকেই পদচারণা করেছেন। আসাদ চৌধুরী তাঁর সামাজিক চেতনাকে স্পষ্ট ও সরল করে কবিতার মধ্যে আবেগের প্রত্যয়ী দৃঢ়তায় প্রকাশ করেছেন। রফিক আজাদ বিদ্রোহী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ব্যক্তি, সমাজ মানুষ রাষ্ট্র ধর্ম ও বিশ্বাসের ভেতরকার অসংগতিকে তুলে ধরেন কবিতার আঙ্গিকে।

এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক ষাটের দশকের কবি গল্পকার শহীদুর রহমানের জীবন, সাহিত্যকর্ম ও তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে লিখেছেন। ষাট দশকের শুরুতে রাষ্ট্র ও

সমাজের মধ্যে যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয় তার মধ্যেই শহীদুর রহমান নিজের ভেতরটাতেই অনুসন্ধানের কাজে নিমগ্ন থাকেন-যুগের পরিবর্তনের সাথে নিজেকে যুক্ত করেননি। ষাটের দশকে আইয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ছাত্র আন্দোলনের শুরু। প্রতিশোধ স্পৃহার আগুন ছাত্র জনতাকে যে ভাবে উদ্দীপ্ত করে তোলে শহীদুর রহমানের মধ্যে সেই ক্ষুব্ধ রূপটি আত্মপ্রকাশ করে কবিতার মাধ্যমে। স্বাক্ষর কবিতাপত্রের কয়েক সংখ্যায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতার শিল্পরূপ সেখানে ছিল না, কিন্তু তাতে তাঁর উদ্বেগ লক্ষণীয়। ১৯৬৫-র তৃতীয় সংখ্যা স্বাক্ষরে প্রকাশিত তাঁর কবিতার নাম 'নৈ:সঙ্গ' তিনি সেখানে ব্যক্তির ভয়াবহ নি;সঙ্গতাকে দেখেছেন, মৃত্যুর পরে তাঁর প্রকাশিত একমাত্র কাব্যগ্রন্থের নাম 'শিল্পের ফলকে যন্ত্রণা'। এ কাব্যের কবিতায় তাঁর সততা, নিষ্ঠা আবেগ বিষয় বৈচিত্র্য লক্ষ্যণীয়। প্রথম পর্বের কবিতায় কবির অস্থিরতা উদ্বেগ ক্ষোভ বিরক্তি গ্লানি ক্রোধ সংকল্প ছিল পরের লেখা গুলোতে তা পাওয়া যায় না। ৬০-এর দশকের রাজনৈতিক সামাজিক আন্দোলন সংগ্রামে শহীদুর রহমান বিক্ষুব্ধ ছিলেন, কিন্তু অস্থির উত্তেজিত মানসিকতায় তাঁর কবিতার প্রথম পর্বের সম্ভাবনা, শেষ পর্বের কবিতায় প্রেম-দেশাত্মবোধ রাজনীতি বিষয় বস্তু করলেও তার সফল পরিণতি ছিল না।

তিনি কবি, তিনি গল্পকার। কবিতা ও গল্পে তিনি অভিন্ন স্বভাবের শিল্পী। কবিতায় তাঁর যে অনুভূতি প্রকাশের সম্ভাবনা ছিল গল্পে তা পরিণতি পায়। গল্পে তিনি মানুষের সম্পর্কের চিড় ধরার এবং সংসার ভাঙ্গার কারণ দেখিয়েছেন। শহীদুর রহমানের গল্প ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য ধরে চললেও নতুন প্রকরণও তিনি গ্রহণ করেন। গল্প রচনায় তাঁর ছিল সচেতন প্রস্তুতি, শিল্পী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার অনুশীলন। এ প্রস্তুতি, অনুশীলন তাঁর কৈশোর থেকেই ছিল। সেই সময়কার প্রতিষ্ঠিত লেখক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখে গল্প লেখায় পদ্ধতি জানার আগ্রহে তিন সংকোচ করেননি। কলেজ জীবন থেকেই তিনি সমাজতন্ত্রের দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। আইয়ুবের সামরিক শাসন রাজনীতির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলে মানুষের সাংস্কৃতিক বিকাশ, বিদ্যা চর্চা ও মননশীলতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এই প্রতিবন্ধকতায় বাইরে থেকে অবরুদ্ধ হয়ে শিল্পীদের স্বভাবতই অন্তরের অন্ত:স্থলে নামতে হয়। ভিতরের জিজ্ঞাসা বাইরে প্রকাশে বাধা পেয়ে ভেতরে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়, কিন্তু শহীদের ক্ষেত্রে তা ক্রোধ হয়ে বের হতে পারেনি। অথচ শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায়-গল্প বিষয়ে তাঁর সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবনা চিন্তা, সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতি স্পৃহা সবই রাজনীতির রুদ্ধ পরিস্থিতিতে চাপা পড়ে। কোন কোন শিল্পীর মধ্য এই রুদ্ধতা থেকে বিস্ফোরণের সৃষ্টি হয়। কিন্তু

শহীদুর রহমানের মধ্যে তা ক্ষোভের সৃষ্টি করতে পারলেও ক্রোধ সৃষ্টি করতে পারেনি। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এর জন্য দায়ী করেছেন তাঁর অগোছালো স্বভাবকে। সাহিত্যিক হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করার সক্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও এই প্রতিভাবান শিল্পীর ভেতর স্ফূলিঙ্গ জ্বলে ওঠেনি। প্রাবন্ধিক অগাছালো স্বভাব প্রসঙ্গে তাঁর শিক্ষাজীবন ও কর্ম জীবনের সিদ্ধান্তহীনতার কথা উল্লেখ করেছেন।

তাঁর শিল্পভাবনা, শিল্প স্বভাব ও শিল্পী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ঢাকায় এসে একটা বিশেষ পর্যায়ে রূপ লাভ করে, তেমনি পারিবারিক ও সামাজিক জীবনও ঢাকাতেই পরিণতি লাভ করে এক নতুন মাত্রা পায়। পরিণত বয়সে জন্মশহর, বাল্য কৈশোরের বিচরণ ক্ষেত্র ঝিনাইদহে এসে শহীদুর রহমান দোদুল্যমানতায় পড়ে যায়। তাঁর দুই জীবনধারার মধ্যে শুরু হয় দ্বন্দ্ব। ফেলে যাওয়া জন্মশহরে তিনি আর নিজেকে খুঁজে পান না। পরিজন বন্ধু বঞ্চিত শহীদ বাল্য-কৈশোরের বিচরণ ক্ষেত্রে স্থির হতে পারেন না। কর্মস্থলের ঝামেলা, মফস্বলীয় সংকীর্ণতা তাঁকে আঘাত করে।

নিজের শৈশবের স্মৃতিচারণ আর মানুষের ভেতরকার ক্ষতবিক্ষত চেহারার ছাপ রয়েছে তাঁর রচনায়। শিশু চরিত্র চিত্রণে এগুলো প্রভাব ফেলে তাঁর নিজের অজান্তেই। তাঁর স্বভাব, শিল্পচর্চার জন্য আশৈশব প্রস্তুতি, শিল্পকর্ম প্রকাশে অনীহা, পারিবারিক বন্ধনের টান, নিঃসঙ্গ পরিবেশ ও মানুষের আঘাত, পুত্রবন্ধুর মৃত্যু–এত সব টানা পোড়েনে ক্ষত বিক্ষত হয়ে শহীদুর রহমান ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। আজীবন শিল্প চর্চা আর পরিবেশ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে শহীদ ক্লান্ত হয়ে পড়েন।

প্রাবন্ধিকের অভিমত ক্ষোভকে ক্রোধে পরিণত করে করে তুলতে পারলে ৬০ দশকের কবি শহীদুর রহমান নিজের সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করতে পারতেন, কিন্তু ক্লান্ত হয়ে নিরাশ কবি কবিতার মধ্যে আশ্রয় নিলেও পথ হারিয়ে ফেলেন কিন্তু পিছু হটেন না। ক্লান্ত শিল্পী যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে শ্রমজীবী, কষ্ট পাওয়া মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য নতুন শক্তি নিয়োগ করেন। প্রকৃতি, প্রাণী ও মানুষ সবার সাথে যোগাযোগের ইচ্ছায় যন্ত্রণাকাতরদের উদ্দেশ্যে তাঁর বইটি উৎসর্গ করে শিল্পীর দায় পালন করেন এই ক্লান্ত কবি।

সংস্কৃতির ভাঙ্গা সেতু' বইটিতে আসহাবউদ্দীন ও কায়েস আহমেদের জীবন সাহিত্য সম্পর্কে দু'টি করে প্রবন্ধ আছে। প্রাবন্ধিক আখতারুজ্জামানের কৃতিত্ব এই যে স্বল্পপরিচিত এই লেখকদ্বয়কে তিনি বর্তমান প্রবন্ধের পাঠকের সাথে পরিচিত করিয়েছেন। আসহাবউদ্দিন আহমেদ সম্পর্কিত প্রবন্ধ দুটি

রচনাকালের ব্যবধান দুই বছর। প্রথমটির নাম 'আসহাবউদ্দীন আহ্‌মদের ক্রোধ ও কৌতুক' রচনাকাল ১৯৯০, দ্বিতীয়টি 'কৌতুকে ক্রোধের শক্তি' রচনাকাল ১৯৯২। শিল্প সাহিত্য রাজনীতি অর্থনীতি সংস্কৃতি সব বিষয়েই আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিচার ভাবনায় একটি বিশেষ তত্ত্ব গুরুত্ব পায়- তা হলো ব্যক্তি। ব্যক্তির উত্থান-পতন, ক্রমবিকাশ আধুনিকতার প্রধান বিষয়। তাই তাঁর প্রবন্ধে সাহিত্য আলোচনায় ব্যক্তিই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুলবুল চৌধুরী, শওকত ওসমান, শামসুর রাহমান, শহীদুর রহমান সম্পর্কিত আলোচনার মত আসহাবউদ্দীন আহমদ ও কায়েস আহমদকে নিয়ে রচনাতেও তাঁদের সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যক্তি'র গুরত্বই প্রাধান্য পেয়েছে। আসহাব উদ্দীনের রচনার উদ্দেশ্য লিখতে যেয়ে তাই ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য দিয়ে রচনাটি শুরু করেছেন- 'আসহাব উদ্দীন আহমদের যাবতীয় রচনার উদ্দেশ্য একটিই- তা হল আমাদের সমাজ ব্যবস্থার উপর তাঁর সীমাহীন অনাস্থা ও ক্রোধের প্রকাশ ঘটানো।' সমাজের নানা অন্যায়, বিভাজন ব্যবস্থাকে তিনি ঘৃণা করেছেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল সমাজব্যবস্থাকে আক্রমণ করা, এজন্য তিনি ব্যবহার্য জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি, উগ্র জাতীয়তাবাদ, বুর্জোয়াদের লেজুড়বৃত্তি, মেকি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার রাজনীতি, ধর্মের নামে হত্যা, নারীধর্ষণ- এই সমাজ বাস্তবতাগুলো সাহিত্যে তুলে ধরেন। একটি প্রসঙ্গ পূর্ণতা না পেতেই আর একটি প্রসঙ্গে গেছেন, সমাজের অন্যায়ে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে সমাজব্যবস্থাকে আঘাত করার জন্যই প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে গেছেন। তিনি দেশের একটি নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলের (কমিউনিস্ট পার্টি) কর্মী ছিলেন বলে তাঁকে প্রায়ই আত্মগোপন করে থাকতে হতো। তিন তিনটি রাষ্ট্রের নাগরিক (বৃটিশ ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ) হতে হয়েছে তাঁকে। প্রত্যেক স্তরেই শোষণ নির্যাতনের প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর দল, তাই হুলিয়া মাথায় নিয়ে আত্মগোপন করে গ্রাম গ্রামান্তরে গেছেন। সমাজ বাস্তবতার প্রতিফলন আধুনিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। কোন সুনির্দিষ্ট আঙ্গিকে আসহাব উদ্দীন তাঁর বক্তব্য নিয়ে কাহিনী বিন্যাস করেননি, নিজেই নিজের কথা বলেছেন। তিনি ঘুণে ধরা সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন চেয়েছেন, এই কাঠামো ভেঙ্গে ফেলতে তিনি সংকল্পবদ্ধ ছিলেন, তিনি বিশ্বাস করতেন তাঁর সংকল্প বাস্তবায়নের পথ হল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, তাই একই সঙ্গে রাজনীতি ও সাহিত্যচর্চায় নিয়োজিত হয়েছেন, সাংগঠনিক কাজও সাহিত্য রচনা পাশাপাশি চলেছে। দলের ভাঙচুরেও নিজের বিশ্বাসে তিনি অটল থেকেছেন। পাঠকের মনোরঞ্জন করা তার উদ্দেশ্য ছিল না। নিশ্চিত ও নিরাপদ জীবনের জন্য সংগ্রাম থেকে তিনি সরে আসেননি। রাজনীতি ও সাহিত্যচর্চায় সমভাবে

ব্যাপৃত থেকেছেন। সমাজব্যবস্থার ভেতরের ফাঁকি ও শয়তানি, নৈরাজ্য, অসামঞ্জস্য, শোষণ, নির্যাতন, প্রতারণা, বঞ্চনা তাকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। সমাজের এইসব অনাচারে তিনি এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছেন যে ধৈর্য্য নিয়ে অস্থির মানসিকতা কোন কাহিনীকে গল্পের ফ্রেমে বাঁধতে পারেননি। প্রমথ চৌধুরীর মত বৈঠকী মেজাজে নিজের দৈনন্দিন জীবনের ঝামেলা, সংকট সমস্যার কথা পাঠককে শ্রোতা হিসেবে গণ্য করে গল্প বলে গেছেন আসহাবউদ্দীন। তাঁর স্পষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্য রাজনৈতিক কর্মীর মত করে বলেছেন যাতে রয়েছে সাহিত্য সমাজতন্ত্র ও দর্শন পাঠের অভিজ্ঞতার ছাপ। উচ্চ শিক্ষিত এই লেখক মিশেছেন সমাজের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের সাথে, যারা জটলা করে বসেন চায়ের দোকানে, নিম্নমানের হোটেলে, ক্ষেত্রের আইলে, স্কুলের খোলা মাঠে, মেলামেশা করেছেন বন্যা খরায়, পীড়িত মহাজনের ঋণ শোধ করতে না পারা জমি বিক্রি করতে আসা চাষীদের সাথে। তাদের সাথে কথা বলেছেন সমাজ বাস্তবতা নিয়ে, গল্পশৈলীর দিকে গুরুত্ব না দিয়ে। কৌতুক, ব্যঙ্গ এবং হাস্যরস দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্যকে প্রকাশ করেছেন। বিরক্তি এবং ক্রোধও তিনি হাস্যরসের ভেতর দিয়েই প্রকাশ করেছেন। নেতার দোষত্রুটি, দুর্বলতাকে আক্রমণ করেছেন কৌতুক দিয়ে। রাষ্ট্র, সরকার, প্রতিষ্ঠানের অসংগতিকেও ঠাট্টা দিয়ে উচ্ছ্বাস করেছেন, নিজেকেও তিনি এর বাইরে রাখেননি। তিনি নির্লিপ্ত নিরাসক্ত ছিলেন না। নিজের আবেগ প্রবণতা দিয়ে রাজনৈতিক অবস্থা, প্রতিদিনের খুঁটি নাটি ঘটনা, আত্মীয় স্বজনের সাথে তাঁর সম্পর্কের বিষয় তিনি খোলামেলা ভাবে লিখেছেন। স্থির ও সুস্পষ্ট রাজনৈতিক আদর্শ থাকায় প্রত্যেকটি প্রসঙ্গই তিনি তত্ত্ব দিয়ে ও পর্যবেক্ষণ করে প্রকাশ করেছেন কিন্তু তাতে মনোযোগের অভাব ছিল বলে লেখকের বক্তব্য পাঠকের মনের গভীরে আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। তাঁর দীর্ঘ আত্মগোপন করা জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে কাহিনী রচনার যে সুযোগ ছিল কিন্তু অস্থিরচিত্ত লেখকের কাছে কোন প্রসঙ্গই তেমন গুরুত্ব পানি বলে তা স্কেচ হয়েছে, ছবি হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। শক্ত রাজনৈতিক বিশ্বাস ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করলেও তাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনব্যবস্থাকে প্রসঙ্গ পরিবর্তনের কারণে বাস্তবরূপ দিতে পারেননি। ফলে তাঁর সাহিত্যচর্চার বিষয় সমাজের মানুষের ক্রোধকে প্রজ্জ্বলিত করতে সক্ষম হয়নি।

আসহাবউদ্দীনের দার্শনিক ভাবনা ও রাজনৈতিক তৎপরতার উদ্দেশ্য ছিল মানুষের জীবনের বঞ্চিত, অবাঞ্ছিত ও অনভিপ্রেত অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করে তাদের মনের চেতনায় আঘাত করে তাদের জাগিয়ে তোলা, কিন্তু কৌতুক ও ঠাট্টায় তাঁর ক্রোধ ও সংগ্রামী চেতনা প্রজ্জ্বলিত হতে পারেনি।

অথচ তাঁর সময়ের রাজনীতির উদ্দেশ্য ছিল সংগ্রাম বিপ্লবের পক্ষে মানুষের অসন্তোষ ও ক্ষোভকে ক্রোধে পরিণত করা, তিনি যে লেখাতে সব কিছু নিয়ে কৌতুক করেছেন তা তাঁর ক্রোধেরই বহিঃপ্রকাশ কিন্তু সেই ব্যাঙ্গ কৌতুক এতটাই স্থূল ছিল যে তাতে ক্রোধের চেহারা পরিণতি পায়নি। ক্রোধ শক্তিতে রূপান্তরিত হলেই সামাজিক রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্ভব। ৮০ পৃষ্ঠার বই 'দাম শাসন, দেশ শাসন' বই-এ আসহাবউদ্দীন তাঁর অন্তর্জ্বালার ক্রোধ প্রকাশ করেছেন দেশ ও সমাজে চেপে বসা ঘটনাগুলো নিয়ে। অর্থনীতির সাথে রাজনীতির সম্পর্ক, রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনায় অসঙ্গতি, সামন্ত মনোভাবের দাপট, শ্রেণি বৈষম্য, বিদ্যাচর্চার অভাব, সাম্রাজ্যবাদের প্রতিহিংসা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পাতি-নেতাদের সিংহাসনে আরোহণ– এই বিষয়গুলো গল্পকারে তিনি লিখেছেন।

আসহাবউদ্দীন গল্প লিখেছেন বক্তব্যকে তুলে ধরার জন্য, গল্পকাঠামোর রীতিনীতি মানার জন্য নয়। বইয়ের নাম গল্পে লেখক বেঁচে থাকার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রামকারী নিরক্ষ.. নিম্নবিত্তের একজন মুচির জীবনের গল্প লিখেছেন, শেকসপিয়রের জুলিয়াস সিজারের মুচির সংলাপের সাথে নিজের পরিচিত বাঙালি মুচির জীবন সংগ্রামকে অভিন্ন মাত্রায় এনে তাঁর বক্তব্যকে প্রকাশ করেছেন– যার সাথে পাঠক একাত্ম অনুভব করেন। তাঁর রচনাগুলোর নামের মধ্যেও রয়েছে কৌতুক ব্যঙ্গ রচনাগুলোর নাম, ফুটপাত ইজনট হেডপাত, হাত ঘড়ি খুলে ফেলুন, তদবির, চা হারমি তওবা তওবা, জমিহীনের জমির ক্ষুধা, তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন, এঁটো ইত্যাদি। চোখের সামনে যা ঘটে তাই নিয়ে তিনি গল্প লিখেছেন। 'ফুটপাত ইজ নট হেডপাত' লেখাটিতে রাষ্ট্রব্যবস্থার ঘোরতর অসঙ্গতি দেখিয়েছেন। যে দেশে ভিটেমাটি সুদ্ধ উচ্ছেদ করাকে অন্যায় বলে ভাবা হয় না, সেই দেশে পথচারীর হাটাচলার ফুটপাতে গৃহহীনের শোয়াটা ঘোরতর অন্যায়। এই অসঙ্গতিকে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। পুঁজিবাদের বিকাশে সমাজে উদ্ভব হয়, শ্রেণিবৈষম্যের। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত– এই শ্রেণি বিভক্ত সমাজে বুর্জোয়া শ্রেণির মানুষ আধিপত্য বিস্তার করেছেন লেখক তা দেখিয়েছেন, 'হাত ঘড়ি খুলে ফেলুন' বলে তাদের ধমক দিয়ে তিনি পালাবদলের পথ প্রত্যাশা করেছেন। 'তওবা তওবা' রচনায় রয়েছে সামন্ত মানসিকতার সাথে পুঁজিবাদের সংঘাতের কথা। 'জমিহীনের জমির ক্ষুধা'য় শ্রেণিবিভক্ত সমাজের বাস্তবচিত্র। এখানে অহরই ভূমি থেকে মানুষকে উচ্ছেদ করা হয়, কিন্তু কোনদিন ভূমিহীন ভূমি ফেরত পায় না। আসহাবউদ্দীন এ জন্য বিপ্লবের

প্রয়োজন মনে করেছেন, আর সে বিপ্লবের নেতৃত্ব থাকবে শোষিত শ্রেণির মানুষের নেতৃত্ব উপযুক্ত মনে করেছেন।।

আসহাবউদ্দীন দেশের সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের জন্য সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে দায়ী করেছেন। তিনি চীনবাদী সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না। পুঁজিবাদের ক্ষয়িষ্ণু সমাজের প্রভাবে গণতন্ত্র আসতে পারে না– এই বিশ্বাসে তিনি সংগ্রাম করেছেন। সমাজতন্ত্রবিরোধী চক্রই তাঁর মতে মৌলবাদী। তুমি অধম... লেখাটিতে তিনি সাম্প্রদায়িকতাকে ধিক্কার জানিয়েছেন। প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য সাম্প্রদায়িকতাকে আশ্রয় করে। ধর্মের উন্মাদনায় মানুষ হত্যা করে, বাবরি মসজিদের স্থানে কাল্পনিক মন্দিরের কল্পনা করে যারা মধ্যযুগীয় বর্বরতায় উন্মাদ হয়– এসব মানুষ ও তাদের সহযোগীদের তিনি অপশক্তি নামে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর বিশ্বাস এরাই '৭১-এ এদেশে ধ্বংসযজ্ঞ, হত্যা, রক্তপাত, নারীধর্ষণ করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগী হয়েছিল। ভারতের মৌলবাদী, বর্ণবাদী চক্রান্ত এবং বাঙালি মৌলবাদী ও ধর্মান্ধ চক্রান্ত সাম্রাজ্যবাদের অপসৃষ্টি। এই বিশেষ বিপক্ষ সম্প্রদায় দেশের শত্রু, তারা ভালো ব্যবহারের অযোগ্য। তাঁর এ লেখায় স্পষ্টভাবে এই সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে ক্ষোভ বিস্ফোরিত হয়েছে, তাদের ক্ষমা করার অর্থ সাম্রাজ্যবাদের হাতকে শক্ত করা। তাঁর লেখায় মৌলবাদী ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর প্রতি ঘৃণার প্রকাশ রয়েছে। 'এঁটো' নামের লেখাটিতে সমাজ ব্যবস্থার অসংগতির প্রতি লেখকের ক্ষোভ প্রকটভাবে এসেছে। এক শ্রেণির আধিপত্যবাদীদের অপচেষ্টায় সমাজে উচু নিচু সৃষ্টি। এই নিচু স্তরের জীবনযাপন কুকুরের জীবনযাপনের মত নিম্নমানের। উভয়েই এক কাতারে এঁটো হাড্ডি নিয়ে টানাটানি করে– মানবতার এই যে অবমাননা, লেখককে তা আঘাত করেছে। এই সমাজব্যবস্থায় তিনি ঠাট্টা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে ক্রোধ প্রকাশ করলেও ধাক্কাটা কিন্তু প্রবল এবং শক্ত। একটি চিঠিকে ধরে ১৪টি শিরোনামে ১৪টি লেখাতে আসহাবউদ্দীন আহমদ ব্যঙ্গ কৌতুকে যে ক্ষোভ ও ক্রোধ করেছেন তা শিল্পসৌকর্যে উন্নীত না হলেও তাঁর সংকল্পের শক্তি কম ছিল না।

শহীদুর রহমান, আসহাব উদ্দীন কায়েস আহমদ– এদের রচনা ও চিন্তাচেতনার ভেতরে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তা চেতনা ও ভাবনা একাত্ম– নিজের ভাবনার সাথে এদের ভাবানার সামঞ্জস্যতার জন্য তিনি তাদের রচনা ও চারিত্রিক স্বভাবকে রূপ দিয়েছেন। 'জতুগৃহে দিনযাপন' প্রবন্ধটিতে প্রাবন্ধিকের সেই দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়ন। কায়েস আহমেদ সম্পর্কে লেখা দুটি প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক তাঁর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন।

তাঁর প্রথম উপন্যাস নির্বাসিত জীবন। ১৯৪৭-এ দেশভাগের আগে দেশে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল। দেশ ভাগের পর দেশ ত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়, তার প্রভাব সমাজে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, কবি সাহিত্যিকেরা তা সাহিত্যরূপ দিয়েছেন। দাঙ্গা এই উপন্যাসের সবচেয়ে তাৎপর্যময় ঘটনা। দাঙ্গার ধাক্কায় মানুষ দেশ ত্যাগ করে এ বিষয় 'দিনযাপন' উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রে এনে কায়েস আহমদ সমাজ বাস্তবতার রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। দেশভাগ এ অঞ্চলে রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচে ট্রাজিক ঘটনা। উপমহাদেশের হিন্দু মুসলমান ও অন্য ধর্মাবলম্বীদের সহাবস্থান দেশভাগের পরে তা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। দেশভাগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় লেখকেরা অর্জন করেন হত্যা, দুর্ভোগ, ধর্ষণ আর মানবিক বিপর্যয়ের রক্তিম ইতিহাস। এই উপন্যাসে আছে নিম্নবিত্তের সংসারের চিত্র, প্রধান চরিত্রের বড় ভাইয়ের শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ, মালিক পক্ষের গুণ্ডার হাতে তার মৃত্যু হয়। এখানে দুর্বলচিত্ত নায়ক মা-র হত্যা ও বোনের সম্ভ্রম রক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়, সে কাজে ব্যর্থ হয়ে অজিতকে খুন করে। প্রধান চরিত্রের বিয়ে হয় এক সহকর্মীর কারসাজিতে অন্তঃসত্ত্বা এক মেয়ের সাথে। সেই সহকর্মীর সহানুভূতিহীন ও কপটতাকে কায়েস আহমেদ যৌক্তিকতায় বিশ্লেষণ করেছেন এবং পর্যবেক্ষণের দুর্বলতা নিয়ে একটি নিটোল কাহিনী রচনার দিকে তাঁর প্রবণতা লক্ষ্য করা গেলেও দ্বিতীয় উপন্যাস 'দিনযাপনে' তা রক্ষিত হয়নি। এই উপন্যাসে কায়েস আহমেদ উপন্যাসের গতানুগতিক রীতি থেকে সরে এসে মানুষের জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জিজ্ঞাসায় নতুন প্রকরণে উপন্যাস লিখেছেন। এখানে আমাদের দেশের স্বাধীনতা এবং দাঙ্গার বিবরণ রয়েছে। দিনযাপন এ অনেকগুলো চরিত্র, তাদের সমস্যা প্রায় এক। ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে সবাই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। এই কারণে তারা এক ধরনের হীনমন্যতার শিকার। এখানে কোন একক মানুষ কাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করেনি। মধ্যবিত্ত ব্যক্তির কোন সামগ্রিক চরিত্র এখানে আসেনি। সুকুমার, শম্ভু, শাজাহান, ওস্তাদ মাস্তান নান্টু– তাদের চরিত্রায়ণে বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের অবক্ষয়জনিত রূপ উঠে এসেছে– এই যুবকেরা মেয়েদের খিস্তি খেউর করে, মদের দোকানে আড্ডা দেয়, সম্প্রদায়গত সংখ্যালঘুত্বের সুযোগ নিয়ে হাম্বিতাম্বি করে, অন্ধকার রাস্তায় নিরীহ মানুষকে ছুড়ি দেখিয়ে সর্বস্ব লুট করে, আরো আছে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী মানুষ। সব মিলিয়ে ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্তের স্বভাব এই উপন্যাসে উঠে এসেছে। গোটা উপন্যাসে লেখক বড় অস্থির, মাঝে মাঝে আপত্তিকর দৃশ্য আছে। এসব নিয়ে চরিত্রের স্কেচ

এঁকেছেন কায়েস আহমেদ, কিন্তু চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশ দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে।

তাঁর জগদ্দল গল্পে স্বাধীনতার তুমুল নৈরাজ্যের ছবি উঠে এসেছে। গল্পের পটভূমি কালীপূজার রাতের শ্মশান ঘাট। এই ধর্মনিরপেক্ষতার দেশেও মন্দির ও প্রতিমা ভাঙা হয়। লেখক এবং প্রাবন্ধিক উভয়েই এর বিরোধী। এই প্রসঙ্গ এনে কায়েস আহমেদ উগ্র বায়বীয় জাতীয়তাবাদের প্রভাবকে সনাক্ত করতে সফল হয়েছেন। যে যুব সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ নিজেদের জীবন বাজি রেখে দেশ স্বাধীন করেছিল, স্বাধীনতার পর তাদের মধ্যে যে হতাশা সৃষ্টি হয় তাই দেখানো হয়েছে এই গল্পে। তারা মাতলামি মাস্তানি করে গাড়ি হাইজ্যাক করে, মেয়েমানুষ হাইজ্যাক করে, ব্যাংক লুট করে, পিস্তলের মুখে চাঁদা আদায় করে। এই বয়ে যাওয়া যুবকদের সাথে কতিপয় বুদ্ধিজীবীকে নিয়ে তিনি শ্লেষ করেছেন। কালীপূজার রাতে পার্থর নাচের মধ্য দিয়ে মুমূর্ষু সমাজের ভেতরকার বীভৎস রূপ দেখিয়েছেন এবং এতে অবাঞ্ছিত রূপের বিরুদ্ধে তাঁর মনের বিদ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে।

'মারিবার হলো তার সাধ' প্রবন্ধে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এই প্রজন্মের কাছে- স্বল্প পরিচিত কায়েস আহমদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন– তাঁর অধিকাংশ পাঠক নতুন লেখক, যারা প্রতিষ্ঠিত লেখকদের দ্বারা উপেক্ষিত, যাদের পত্রিকা বের করার সামর্থ নেই। এই নতুন লেখকেরা কায়েস আহমদের মতো সমকালীন সমাজ ব্যবস্থায় উদ্বিগ্ন। সেই উদ্বিগ্নের অস্বস্তি, যন্ত্রণা এদের সাহিত্যের উপকরণ। তোষামোদি, অন্যকে আক্রমণ করা অন্যের খুঁত, দুর্বলতা নিয়ে সাহিত্যচর্চা কায়েস আহমদ সেই শ্রেণির লেখক ছিলেন না। নতুন লেখকদের প্রেরণা দেয়া, আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্প নিয়ে তিনি লিখেছেন, চারপাশের সব কিছুকে অনুসন্ধান করেছেন। তিনি যত মেধাবী ছিলেন, সাহিত্যে তার তত প্রকাশ ঘটেনি। তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা চার। কিন্তু কোন একটি রীতিতে স্থির থাকেননি। মানুষের গভীর ভেতরটাকে খুঁড়ে খুঁড়ে দেখার উদ্দেশ্যেই তাঁর রীতির পরিবর্তন হয়েছে বার বার। তাই তাঁর চারটি বই আলাদা ভাবের ও মেজাজের। নিশ্চিত জীবন তাঁর ছিল না। হঠাৎ করেই বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়েন, কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করেছেন কয়েকবার। আপস করার মানুষ তিনি ছিলেন না। সাংবাদিকতার পর শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন, কিন্তু দারিদ্র্যমুক্ত হতে পারেননি। প্রাবন্ধিক তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে কায়েস আহমদের সাহিত্য ও জীবনকে আলোচনা করেছেন।

দেশভাগের পর বাস্তুচ্যুতির বেদনাবোধ কায়েস আহমদের পরিবারকেও সহ্য করতে হয়েছে। উদ্বাস্তু জীবনের সংগ্রামে পরাজিত হয়ে কায়েসের পরিবার

ফিরে যান নিজ আবাসভূমি পশ্চিম বাংলার হুগলি জেলার বড়জাতপুর গ্রামে, কিন্তু তিনি রয়ে গেলেন ঢাকার মামার আশ্রয়ে, সেখানেও টিকলেন না বেশিদিন। টিউশনি করে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করেছেন। বাবার মৃত্যুতেও পাসপোর্ট জটিলতায় যেতে পারেননি মায়ের কাছে। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে মায়ের স্নেহচ্ছায়ায় কাটিয়েছিলেন কয়েকদিন। দূরত্বে থেকেছেন আত্মীয় পরিজন থেকে কারণ নিজের ছেলেবেলাকে নস্টারজিয়ার ভেতরে থেকে উপলদ্ধি করা সমীচীন মনে করেছেন। আত্মীয়তার বন্ধনে জড়িয়ে বেদনার অবসান ঘটাতে চাননি কেননা পরিত্যক্ত গ্রাম ও জীবনের রক্তাক্ত হওয়ার শিহরণ একাকীত্বের অনুভূতির মধ্যে সন্ধান করতে চেয়েছেন। নিজের একাল ও সেকালে খোঁড়াখুঁড়ি করাই ছিল তার অনুসন্ধানের পদ্ধতি। জীবন জিজ্ঞাসার কারণেই নিজের ইচ্ছেতেই এক অপ্রকৃতিস্থ নারীকে জীবন সঙ্গিনী করেছিলেন। দয়া ও সহানুভূতি নেয়াকে তিনি ঘৃণা করতেন, কারো বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ ছিল না। এই সত্যান্বেষী ব্যক্তিটি মানুষের জীবনের রহস্য খোঁজার নেশাতেই হয়তো আত্মহত্যা করেছিলেন।

আবু ইসহাকের সূর্য দীঘল বাড়ি (১৯৫৫) সমাজ সংলগ্ন উপন্যাস। পঞ্চাশের মন্বন্তর, দেশত্যাগ, স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা, স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ এবং দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জীবন সংগ্রাম এ উপন্যাসের বিষয়বস্তু। ১৯৪৩ সাল অর্থাৎ পঞ্চাশের (১৩৫০) মন্বন্তর থেকে ১৯৪৭ এর দেশভাগ পর্যন্ত সময় পরিসরে এর কাহিনী বিস্তৃত। একটি পরিবারের জীবনান্বেষণের স্বরূপ উপস্থাপনে দুর্ভিক্ষ পীড়িত বাংলার চিত্র তুলে ধরেছেন আবু ইসহাক। মন্বন্তরের আগ্রাসীর ভয়াল পটভূমিতে গৃহত্যাগী মানুষেরা শহরমুখী হয়েছিল খাদ্যান্বেষণে। সর্বস্ব হারিয়ে তাদের আবার গ্রামে ফিরতে হয়। পাঁচ দশকের জীবন ঘনিষ্ঠ এই উপন্যাস নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি হয়। 'প্রসঙ্গ ঃ সূর্যদীঘল বাড়ী' প্রবন্ধে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস নিম্নমানের বাংলা চলচ্চিত্রের অঙ্গনে সুস্থ চলচ্চিত্রের সংযোজনে আশান্বিত হয়ে লিখেছেন– 'আমাদের স্বাভাবিক মানববৃত্তির ওপর এরকম আস্থাবান কোন ভদ্রলোক আমাদের দেশে এর আগে কখনো ছবি তৈরি করেননি। ...এই ছবি বাংলাদেশের গরিব ও শোষিত গ্রামবাসীর জীবন যাপনের একটি অন্তরঙ্গ পরিচয়।'

শিল্পক্ষেত্রে এই শোষিত মানুষের জীবনযাপন চিত্রায়ণে এক শ্রেণির নির্মাতার স্বার্থকেই প্রাবন্ধিক বড় করে দেখিয়েছেন, কিন্তু এই চলচ্চিত্র চিত্রায়ণে পরিচালকদের মাত্রাবোধ, চরিত্রের যথাযথ ভূমিকা, দগ্ধগৃহ পেছনে ফেলে বাস্তহারা মানুষের গৃহত্যাগের দৃশ্য, নতুন আশ্রয়ের খোঁজে তাদের যাত্রা, বাঁচার জন্য মানুষের অব্যাহত জীবন সংগ্রাম এ সব খুব স্পষ্ট করে যারা

দেখিয়েছেন, সেই সব পরিচালকের এসব চিত্রায়ণের মুন্সিয়ানাকে প্রাবন্ধিক প্রশংসা করেছেন।

পশ্চিবঙ্গের প্রথিতযশা লেখকদের থেকে অভিজিৎ সেন ব্যতিক্রম, পাঠকের মনোরঞ্জন করার জন্য তিনি সাহিত্য রচনা করেননি। কোরক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস অভিজিৎ সেনের সাহিত্যকর্মের উপর আলোচনা করেছেন। ব্যক্তি, সমাজ ও ইতিহাস আশ্রিত ও গভীর অনুসন্ধানমূলক বই অধিকাংশ পাঠকের কাছে বোধগম্য হয় না বলে আমাদের দেশে তা সুলভ প্রাপ্য নয়, সেই হিসেবে অভিজিৎ সেনের বই এদেশে দুষ্প্রাপ্য। তাঁর 'রাহু চণ্ডালের হাড়' বইটি পড়ে প্রাবন্ধিকের যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল এ প্রবন্ধটি তারই শিল্পরূপ।

সাধারণ পাঠক নন্দিত করে বইটি অভিজিৎ সেন লেখেননি, পড়তে পড়তে কাহিনীর সাথে প্রাবন্ধিক অনেক সময়ই একাত্ম হতে পারেননি। এখানে প্রধান চরিত্র বলে কাউকে সনাক্ত করা যায় না। এই বইয়ের নায়ক কোন ব্যাক্তিবিশেষ নয়। নায়ক একটা গোষ্ঠী, বাজিকর গোষ্ঠী। তাদের বসবাসের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড নেই, সারা দুনিয়াব্যাপী তাদের আবাস। ঘর তাদের ছিল, ভূমিকম্পে গোরখপুর থেকে উচ্ছেদ হয়ে রাজমহল, মনিহারিহাট, হরিশচন্দ্রপুর, সামামি হয়ে মালদা, রাজশাহী, পাঁচবিবি পর্যন্ত ঘুরে এই মার খাওয়া গন্তব্যহীন মানুষেরা যায় পশ্চিমের দিকে। তারা ধর্ম ও জাতের নাম জানে না। কোন নির্দিষ্ট ধর্মমতে আবদ্ধ নয় বলে ধর্মের নামে আত্মোৎসর্গ করে কাজে বিমুখ হয়ে থাকার সুযোগ তাদের নেই। স্থানান্তরের জন্য এই গৃহহীন, ভূমিবঞ্চিত, ধর্মমুক্ত ঠিকানাবিহীন বাজিকর গোষ্ঠীর কোন নির্দিষ্ট ভাষা নেই।

রহু চণ্ডালের হাড়-এ যে গৃহহীন, ভূমিবঞ্চিত ও ধর্মমুক্ত মানুষের জীবন চিত্র আঁকা হয়েছে তারা হাজার হাজার বছর ধরে স্থায়ী ঠিকানার খোঁজে গ্রাম গ্রামান্তরে, এলাকা এলাকায়, নদীর তীরে তীরে ছুটে বেড়ায়, পাহাড়ের উপত্যকায় উপত্যকায় তাঁবু ফেলে, জীবিকার প্রয়োজনে জমিচাষ করে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জীব জানোয়ার পোষ মানায়, ভাব-আদান প্রদানের প্রয়োজনেই আত্মস্থ করে বসতি স্থানের ভাষা। আবার এই ক্ষয়স্থায়ী আবাস ভেঙ্গে অন্যত্র চলে যায় এই ঠিকানাবিহীন যাযাবর বাজিকর গোষ্ঠীর মানুষ। এত অনিশ্চিত জীবন সত্ত্বেও তারা বেঁচে থাকার লড়াই-এ পিছ পা হয় না। ভাবনা, উদ্বেগ ও দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এদের কোন সরদার এদের সংগঠিত রাখার উদ্যোগ নিতেন। রহু এদের সহায়, কিন্তু রহু কোন দেবতা নয়, একেবারেই তাদের মত মানুষ। সর্বশক্তিমান কোন দেবদেবী এদের নেই। ধর্মের নৈতিকতা ও রাষ্ট্র পরিচালনার শৃঙ্খলায় তারা কারো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

না। অবাধ স্বাধীনতা ও কঠোর দায়িত্ববোধে নিজেদের ভাল মন্দ তাদের নিজেদেরই ঠিক করতে হয়। সমাজের মূল ধারার মানুষের মত সমাজ স্থিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাদের প্রবল হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে আত্মসমর্পণ তারা করে না বলেই স্থায়ী ঠিকানা তারা লাভ করতে পারেনি। সূদুর অতীতকালে মরু এলাকার এই মানুষগুলো এমন স্থায়ী ঠিকানার প্রত্যাশা করেছিল যেখানে তারা গৃহস্থ হয়ে জমিচাষ করার অধিকার পাবেন। সনাতন ও ইসলাম ধর্মে এরা আশ্রয় খোঁজে কিন্তু সম্মানজনক ঠাঁই পায় না। নিজেদের স্বাধীনতা বিসর্জন দিলেও উপযুক্ত মর্যাদা পায় না। অভিমান, গর্ব, উচ্ছেদের গ্লানি সত্ত্বেও স্থায়ী হওয়ার সংকল্পে এই বাজিকর গোষ্ঠীর ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে পার্থক্য নেই। এই উপন্যাসে প্রেম কাম ক্রোধ হিংসা বাৎসল্য, ক্ষোভ লোভ আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছা এক একজন মানুষের ভেতর দিয়েই তাদের অনুভূতিতে তা সমন্বিত রূপে প্রকাশ পেয়েছে। তারা মনে করে কোন মূলধারায় বিলীন হয়ে গেলে ব্যক্তি ও সমাজের একাত্মতা অক্ষুণ্ন থাকে না। কেননা, মূলধারার মানুষ বিচ্ছিন্ন মানুষ। রহুচণ্ডালের হাড় উপন্যাসের কাহিনী বিশ শতকের ষাট দশক পর্যন্ত বিস্তৃত, যখন দেশ বৃটিশ শাসন মুক্ত স্বাধীন দেশে প্রশাসনকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল, কিন্তু তাতে সমাজে শোষণ ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়নি।

অভিজিৎ সেনের মত প্রাবন্ধিকও মনে করেন বুর্জোয়া সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে রূপ পায়, যাকে বলা যায় ব্যক্তিসর্বস্বতা। ব্যক্তি সর্বস্বতা দিয়ে চিহ্নিত সমাজের ভেতরটা থাকে ফাঁকা ও ফাঁপা। অভিজিৎ সেন তাই ব্যক্তিসর্বস্ব মানুষের সমাজ নিয়ে গল্প লেখেননি। তিনি যে শক্তির ইঙ্গিত দিয়েছেন তা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নয়, তা হলো মানুষের শক্তি। তিনি দেখিয়েছেন মূলধারার মধ্যে বিলীন হলে মানুষ শক্তি হারায়, তার স্বাধীনতা লোপ পায়। তারা ঘর পেলেও মর্যাদা পায় না। এই শ্রেণি বিভক্ত সমাজে ক্ষমতাবানদের তারা পিষ্ট হয়, মানবিক বিকাশের সব পথ তাদের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। সমাজের কাছে তারা অবাঞ্চিত তাই সমাজের কাজে কর্মে তাদের অধিকার ও ইচ্ছা অনিচ্ছার মূল্য থাকে না।

'লেখকের দায়' প্রবন্ধে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস উপন্যাসের ধর্ম ও ঔপন্যাসিকের দায় দায়িত্ব বিষয়ে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ঔপনিবেশিক যুগে উপন্যাসের সৃষ্টি কিন্তু ঔপনিবেশিক মানসিকতা সেখানে নেই। ঔপনিবেশিক যুগের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যবস্থাকে আমাদের ঔপন্যাসিকেরা গ্রহণ করেননি। শ্রেণি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, নির্বিশেষে সমাজের সব শ্রেণির মানুষ উপন্যাসের চরিত্র হয়ে থাকেন। মানুষের সৃজনশীল কল্পনার

অবাধ প্রকাশ উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তির বিকাশে উপন্যাসের উদ্ভব আবার ব্যক্তির বিকাশে উপন্যাসেরও বড় ভূমিকা রয়েছে। উপন্যাসে থাকে ব্যক্তি চরিত্রের নানান বৈচিত্র্য। আমাদের এই উপমহাদেশে প্রথম থেকেই বাধা পেয়ে পেয়ে ব্যক্তির বিকাশ ঘটেছে বলে তার মধ্যে শক্তিমত্তা দেখা যায় না। পাশ্চাত্যের ব্যক্তি সর্বস্বতার জয়গান এই দেশের ঔপন্যাসিকদের প্রভাবিত করে, তাই ব্যক্তিচরিত্র এদেশের উপন্যাসে মুখ্য ভূমিকা নেয়। ব্যক্তিকে গুরুত্ব দেওয়ার কারণেই আমাদের দেশের বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাসগুলো সমসাময়িক সমাজের ব্যক্তিত্বহীন ব্যক্তিদের নিয়েই দেশের কুসংস্কার, যুব সমাজের অবক্ষয় ও ধর্মান্ধতাকে তুলে ধরে দেশের মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। যখন অন্যান্য ভাষার উপন্যাসে প্রচলিত সংস্কার, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসকে আঘাত করা হয়েছে।

প্রাবন্ধিকের মতে, ঔপনিবেশিক এই দেশে যে দুর্বল মানুষের সৃষ্টি তাদের নিয়েই এই দেশের ঔপন্যাসিকেরা সাহিত্য রচনা করেছেন দেশের বৃহত্তর শ্রমজীবী মানুষ তাদের কাছে উপেক্ষিত। শ্রমজীবী মানুষের স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ ও তাঁদের স্বপ্ন দেখার শক্তিকে তাঁরা অবহেলা করেছেন। যাঁরা শ্রমজীবী, নিম্নবিত্ত মানুষকে তাদের উপন্যাসের উপজীব্য করেন তার মধ্যেও মধ্যবিত্ত জীবন ও সমাজ নিয়ে আসেন, ফলে জীবন্ত মানুষগুলো নির্জীব হয়ে প্রকাশ পায়। মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবীর বিচ্ছিন্নতার ফলে দেশের সংস্কৃতির মধ্যে বন্ধ্যাত্ব এসেছে। জীবন ও সংস্কৃতির সাথে বিচ্ছেদ ঘটলে উপন্যাসের সংখ্যাগত পরিমাণ বাড়লেও গুণগত মান হ্রাস পায়। একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তিতে উপন্যাস সৃষ্টি হলেও তার মধ্যেই অনুসন্ধিৎসু মানুষ সত্য অনুসন্ধান করেন। প্রাবন্ধিক বলেছেন দুর্বল মধ্যবিত্ত ব্যক্তির জীবনকাহিনী নিয়ে সে উপন্যাস লেখা হয় তাতে ব্যক্তির যথাযথ সামাজিক অবস্থান প্রকাশ পায় না। লেখক এই পর্যায়ে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহকে একজন ব্যতিক্রমধর্মী শিল্পী মনে করেন কেননা তিনি সমাজের সংস্কার ও ধর্মান্ধতাকে প্রবলভাবে আঘাত করেছেন তাঁর সাহিত্যে। এই মনোভাব প্রকাশ করতে তাঁকে কাঁদো নদী কাঁদো/ চাঁদের অমাবস্যাতে স্বতন্ত্র ভাষা সৃষ্টি করতে হয়। প্রাবন্ধিক পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য সাহিত্যরসের ঘোর বিরোধী ছিলেন। বিশেষ গোষ্ঠীর মনোরঞ্জনের জন্য মধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে যে উপন্যাস সৃষ্টি হয় সেই কাহিনীতে যে মধ্যবিত্ত ব্যক্তির পরিচয় মেলে সে কিন্তু রেঁনেসাঁসের শক্ত সামর্থ উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ নয়।

আমাদের সংস্কৃতির মূলে রয়েছে বাঙালির অভিন্ন জাতিসত্তা, কিন্তু অভিন্ন জাতিসত্তা ও সংস্কৃতিকে অনুসন্ধান না করে এক শ্রেণির মানুষ রাজনৈতিক

স্বার্থে সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে পারস্পরিক সংঘাতে ইন্ধন জুগিয়ে চলেছে তা জাতির জন্য মঙ্গলজনক নয়। দেশ ও জাতির সংস্কৃতির পরিবর্তে যদি মানুষের দুঃখ বেদনাকেই সাহিত্যের উপজীব্য করা হয়, তাতে পাঠকের সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হলেও ভবিষ্যতের পাঠকের কাছে তা কোন প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারে না। জীবন ও সংস্কৃতির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের অভিজ্ঞতায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন। জীবন সংস্কৃতি বিচ্ছিন্ন নয় বলেই জীবনের প্রসঙ্গে সংস্কৃতি জড়িয়ে যাবেই।

অ্যাটেনবরো পরিচালিত 'গান্ধী' চলচ্চিত্রের আলোচনা সমালোচনা নিয়ে রচিত 'সায়েবদের গান্ধি' প্রবন্ধটি। বিশ শতকে প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে আইনজীবী হিসেবে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালে প্রবাসী ভারতবাসীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আন্দোলন করেছেন। ১৯১৪-এ তিনি ভারতবর্ষে ফিরে আসেন এবং তখনকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কারমূলক আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। আধ্যাত্মিক তৎপরতাকেও তিনি গুরুত্বের সাথে তাঁর জীবনের অনুসঙ্গ করেছিলেন। এই মহান রাজনৈতিক, ব্যক্তিত্ব ১৯৪৮ সালে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। মহাত্মা গান্ধীর এই অর্ধশতাব্দীকাল সময় 'গান্ধী' চলচ্চিত্রের পটভূমি। অ্যাটেনবরোর গান্ধী চলচ্চিত্রের প্রধান বিবেচনার বিষয় ছিল তাঁর অহিংসা। প্রাবন্ধিক এই মানবিক প্রবৃত্তি অহিংসাকে রাজনৈতিক মতবাদ বা দর্শন বলে মানেন না। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের উপর শ্বেতাঙ্গ শাসকদের নিপীড়নের প্রতিবাদে গান্ধীজী অহিংস প্রতিবাদ গড়ে তোলেন কিন্তু তাতে কতটা সফলতা এসেছিল চলচ্চিত্রে তা দেখানো হয়নি, এমনকি সেখানে গান্ধীজীর অন্যান্য তৎপরতাকেও অ্যাটেনবরো এড়িয়ে গেছেন। সে অন্যান্য তৎপরতা হলো– দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র জাতির বিদ্রোহ দমনে ইংরেজদের গান্ধীজীর সহায়তা করা, জুলুদের সাথে ইংরেজদের সংঘর্ষের সময় তাঁর অ্যাম্বুলেন্স কোর গঠন, প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গঠন, প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগ। আফ্রিকায় থাকাকালীন গান্ধীজীর এইসব কার্যকলাপ চলচ্চিত্রে আসেনি বলে প্রাবন্ধিক সমালোচনা করেন। তিনি চলচ্চিত্রটির সমালোচনায় আরও লিখেছেন আফ্রিকায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনে গান্ধিজীকে যতটা দৃঢ়চিত্ত ও সংকল্পবদ্ধ দেখানো হয়েছে তা বিশ্বাস করা খুব কঠিন। চলচ্চিত্রে দেখানো হয়েছে রাজনীতিতে সরাসরি প্রবেশের আগে তিনি ভারত দর্শনে বের হন, নিজের দেশ দর্শনে তাঁর উৎফুল্লতাকে আগত ইংরেজ সাহেবদের উৎফুল্লতার মত প্রাবন্ধিকের কাছে মনে হয়েছে। তাঁর মতে গান্ধীজীর রাজনীতির স্বত:স্ফূর্ততা, ছবির প্রথমদিকে দেখানো

হয়নি। তিনি এই চলচ্চিত্রে স্বত:স্ফূর্ততা সামঞ্জস্য ও সততার অভাব আছে বলে মনে করেন, কারণ গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনে স্বাধীনতালাভে দীর্ঘসূত্রিতা এবং শ্রমিক কৃষক ও নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণির সংযোগ স্থাপনে সফল হলেও কংগ্রেস তখনও জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষার সার্থক প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনি, তাই জনসমাজের এক অংশ সন্ত্রাসবাদকে আশ্রয় করে মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় শুরু করে– এই ঘটনাটিকে সমগ্র ভারতবাসীর হিংসা প্রবৃত্তির অমানবিক প্রকাশ বলে দেখানো হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই সশস্ত্র সংগ্রামকে অর্থাৎ গোপনাথ সাহা, ক্ষুদিরাম বসু, সূর্য সেন, যতীন দাস প্রমুখ সংগ্রামীদের দুঃসাহসিক কার্যকলাপকে হেয় করে গুণ্ডামি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আবার জালিয়ানওয়ালাবাগের বীভৎস হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটিকে মাথা গরম এক ইংরেজ সেনা প্রধানের হঠকারিতা হিসেবে চিহ্নিত করে অমানবিক নির্যাতনের বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ঘটনাটি যে সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতার অংশবিশেষ তা থেকে দর্শকের দৃষ্টিকে সরিয়ে কসাই জেনারেল ডায়ারের উপর ব্যক্তিগতভাবে দোষ চাপানো হয়। সেখানে দেখানো হয়েছে এই ব্যাপারে গান্ধীজী স্বয়ং নানাভাবে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। প্রাবন্ধিক মনে করেন জালিয়ানওয়ালাবাগ পাঞ্জাবে সামরিক শাসনের নিপীড়নের চূড়ান্ত পরিণতি একজন ইংরেজের কাণ্ড নয়, সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতার অংশবিশেষ– গান্ধীজী সেই সময়ে তা বিশ্বাস করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন ঐ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি বর্জন করলেও ১৯১১ সালে সরকারি উপাধি বর্জনের জন্য কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের পূর্ব পর্যন্ত গান্ধীজী কাইজার-ই হিন্দ উপাধি বর্জন করেননি। প্রাবন্ধিক বলেন বাস্তব ঘটনার গোঁজামিল দেওয়ার জন্য অ্যাটেন বরোকে সবসময় সতর্ক থাকতে হয়েছে। তাই ভারতীয় রাজনীতির যেসব ঘটনা গান্ধির অহিংসার সঙ্গে খাপ খায় না যেগুলো এড়ানো হয়েছে। গান্ধীজীর সাম্রাজ্যবাদ তোষণ পদ্ধতির যাঁরা সমর্থন করেননি চলচিত্রকার সেইসব ব্যক্তিত্বদের চরিত্রায়ণ করেননি। স্বাধীনতা আন্দোলনে সন্ত্রাসবাদের ভূমিকাকে মূল্যায়ন করা হয়নি। বৃটিশ বিরোধী গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন যেমন ১৯৪৬ সালে বোম্বের নৌ বিদ্রোহ, ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন চলচ্চিত্রে স্থান পায়নি। গান্ধীজীর আপসমুখী নীতিকে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু বিরোধীতা করেছিলেন ১৯২৯ সালে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির পক্ষে সুভাষ বসুর অনমনীয় দৃঢ়তা ছিল। ভারতীয় রাজনীতি থেকে গান্ধীজী তাঁদের সরাতে চেয়েছিলেন অ্যাটেনবরোও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সপক্ষে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুকে চিত্রায়ণ না করে ইতিহাস

ক্ষুন্ন করেছেন। প্রাবন্ধিকের মতে গান্ধীজীর অহিংস নীতি সৎ ও স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না। তাই লিখেছেন– এর যদি কোনোরকম দার্শনিক ভিত্তি থাকতো, তবে সুভাষ চন্দ্র বসুকে উপস্থাপন করে তাঁর জঙ্গি মনোভাবের বিরুদ্ধে অ্যাটেনবরো অহিংসাকে প্রতষ্ঠিত করার উদ্যোগ নিতেন।' এই ছবিতে এই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব নীরব দর্শকমাত্র। বল্লভভাই প্যাটেলকেও নিষ্ক্রিয় করে সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রাবন্ধিকের কাছে চলচ্চিত্রে নেহরুর উপস্থাপনও তাঁর চরিত্র ও কার্যক্রম অনুযায়ী যথাযথ হয়নি। নেহরু চরিত্রের সমালোচনা করে তিনি এ বিষয়ে লিখেছেন। নেহরুর তুলনায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে তিনি ব্যক্তিত্ববান মনে করেছেন। গান্ধীর বিরোধিতা করার মধ্যে লেখক জিন্নাহর ব্যক্তিত্ব দেখেছেন। প্রাবন্ধিকের মতে এই চলচ্চিত্রে জিন্নাহকে ভিলেন করে চিত্রায়িত করা হয়েছে। তাকে তৈরি করা হয়েছে রগচটা ও কুচক্রী এক চরিত্রে, এতে অ্যাটেনবরোর শিল্পীসত্তা ক্ষুন্ন হয়েছে। অ্যাটেনবরো আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে পারেননি। প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন পাকিস্তানের পক্ষে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ-র এবং এর বিরুদ্ধে গান্ধীবাদীদের যুক্তি, পাকিস্তান মেনে না নিলে গৃহযুদ্ধ জিন্নাহর এই হুমকিতে গান্ধীর পাকিস্তান মেনে নেয়া– চলচ্চিত্রের এই প্রসঙ্গটির মধ্যে সত্যতা নেই। তার অনেক আগে থেকে এদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ– এই কারণগুলোকে দেশভাগের পক্ষে গুরুত্ব দেননি অ্যাটেনবরো। গান্ধীজীর চরকাতন্ত্রের ঘোরতর সমালোচনা করে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস গান্ধী চলচ্চিত্রে চরকার মধ্যে অ্যাটেনবরো যে আধ্যাত্মিক সত্যের অনুসন্ধান করেছেন তাকেও সমর্থন করেননি। প্রাবন্ধিক গান্ধীজীর অহিংসা, তাঁর চরকা, তাঁর দারিদ্র্যতাকে কটাক্ষ করে তার মধ্যে নানারকম অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য দেখেছেন, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাঁর নীতিকে নিজেদের শাসনের পক্ষে ব্যবহার করেছে বলে উল্লেখ করেছেন। অ্যাটেনবরো এসব সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেননি, ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যাপক ও বিশাল পটভূমিকে সূক্ষ্মভাবে উপলব্ধি না করার জন্য আন্দোলনের মূল সত্য, শক্তি ও সামগ্রিক রূপকে তিনি তুলে ধরতে পারেননি, এ সব মত প্রকাশ করে তিনি ছবিটিতে বস্তুনিষ্ঠতার অভাব আছে বলে মনে করেছিলেন।

বিষয়বস্তু সম্পর্কে বাস্তব এবং যথাযথ জ্ঞান না থাকলে শিল্পী বস্তুনিষ্ঠ শিল্প সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন না। ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ, তাদের জীবনযাপন, তাদের সংঘাত ও সংগ্রাম, তাদের বঞ্চনা ও বেদনা সম্পর্কে মার্কিন চলচ্চিত্রকার অ্যাটেনবরোর যথাযথ অভিজ্ঞতা না থাকায় গান্ধী জীবনকে তিনি শিল্পসম্মতভাবে প্রকাশ করতে পারেননি বলে উল্লেখ করে

প্রাবন্ধিক বলেছেন 'কলাকৌশলগত নৈপুণ্য সত্ত্বেও শিল্পকর্ম হিসেবে গান্ধীকে উঁচু আসন দেওয়া যায় না।'

বাংলা কথাসাহিত্যের অবিস্মরণীয় লেখক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সমাজ ও রাজনীতি সচেতন লেখক, জীবনের রূঢ় বাস্তবতাকে তিনি তাঁর গল্প উপন্যাসে শিল্পরূপ দিয়েছেন। দলীয় রাজনীতির সাথে সরাসরি যুক্ত না হলেও দুর্নীতির গতি প্রকৃতি বিশেযত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সমূহের প্রতি ছিল তাঁর অপার আগ্রহ। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং তার পূর্ববর্তী আন্দোলন সমূহ সম্পর্কে পর্যালোচনা, অভিমত তাঁর রচনায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই প্রবন্ধে বৃটিশ শাসনামলে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ প্রাধান্য পেয়েছে। ভারতে আন্তর্জাতিক মানের চলচ্চিত্রকার থাকা সত্ত্বেও অ্যাটেনবরোকে গান্ধী সম্পর্কিত চলচ্চিত্র নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রাবন্ধিক যে জোড়ালো মন্তব্য করেছেন তা হলো– দেশি শোষকশক্তি, যারা প্রাচীনকাল থেকেই এদেশে বর্ণভেদ প্রথা চালু রেখে সাম্প্রদায়িক চেতনাকে উসকে দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবিত্ত মানুষকে সংগঠিত হতে দেয় না, কৌশলে শোষিত মানুষের সংগ্রামকে প্রতিহত করে। ইংরেজেরা চলে যাওয়ার পর এই শোষকশক্তি আরও শক্তিশালী হয়। অন্যদিকে সাধারণ মানুষ প্রতিষ্ঠিত সরকার ও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে চলেছে। সরকার তাদের আন্দোলনের প্রতি কখনও কখনও নমনীয়তার ভাব দেখিয়ে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন দিয়েছেন। জীবিত গান্ধীকে এই শোষকশক্তি যেমন ইংরেজদের সাহায্যে ব্যবহার করেছেন তেমনি মৃত গান্ধীকে নিজেদের কাজে লাগানোর জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাহায্য নিয়েছেন। মানুষের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বন্ধ করাই এই শোষকদের উদ্দেশ্য ছিল– প্রাবন্ধিক তাদের নতুন সায়েব বলে আখ্যায়িত করেছেন।

১৯৯১ সালে সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী লেখক জার্মানির Gunter Wilhelm Grass. তিনি ১৯২৭ সালের ১৬ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উপন্যাসিক, কবি, চিত্রকর, নকশাকার, ভাস্কর। এই বহুগুণান্বিত সাহিত্যিকের রচনা টিন ড্রাম ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের উদ্দীপক হিসেবে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস টিন ড্রামের চেতনাগত উপলব্ধির ভূমিকা উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটিতে ইউরোপীয় বাস্তবতার মৌল বিষয়কে তুলে ধরা হয়েছে। এই নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিকের কাজকর্মের মধ্যে বারবার বাম রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটেছে। গ্রাস জার্মানির সামাজিক গণতান্ত্রিক পার্টির সক্রিয় সমর্থক ছিলেন। ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত টিন ড্রাম রচনাটি

পরবর্তীতে ১৯৭৯ সালে পরিচালক Volker Schlondorft এটিকে চলচ্চিত্রে রূপদান করেন। এটি Palme d'or এবং শ্রেষ্ঠ বিদেশি ভাষার একাডেমি পুরস্কার পায়।

১৯১৯ সালে সুইডিশ একাডেমি তাঁকে সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ প্রদান করে এবং তাঁকে রঙ্গপ্রিয় গল্পে ইতিহাসের হারানো বিষয়ের জীবন্ত বর্ণনাকারী হিসেবে অভিহিত করেছেন। ১৯৬১ সালের মঞ্চস্থ করা Kats and maus (Cat and mouse) একটি ছোট উপন্যাস বা উপন্যাসিকা এবং ১৯৬৩ সালে অভিনীত উপন্যাস Hundegahre (Dog years) অনুসরণ করে চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করা হয়। এই তিনটি কাজেই নাৎসিবাদের উত্থানকে তিনি উপস্থাপন করেছেন। কাব্যিক গদ্যে গুন্টার গ্রাস যুদ্ধের অভিজ্ঞতা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং জটিল ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন।

টিন ড্রামের অসকারের ড্রাম পেটানোর প্রচণ্ড শব্দে যেমন মেশিনগান স্টেনগানের ব্রাশফায়ারের শব্দ ছড়িয়ে যায় তেমন আমাদের দেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের কারফ্যু, ব্লাক আউট, মিলিটারির বুটের সদম্ভ শব্দ, ব্রাশ ফায়ারের নরহত্যার যজ্ঞকে পেছনে ফেলে মৃত্যুর আতঙ্কে মাথা নত না করে অনিশ্চিত জীবনযাত্রার মধ্যেও বাঁচার তীব্র ইচ্ছার সংকল্পে ব্রতী হয়। সেনাবাহিনীর নৃশংস নির্যাতনে এদেশের মানুষের প্রতিরোধের অদম্য স্পৃহায় বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা নতুন নতুন শিখায় জ্বলে উঠেছিল। প্রাবন্ধিকের কাছে মনে হয়েছে ১৯৭১ সালের শেষ কয়েকটি মাসের ভয়– আতঙ্ককে শ্লেষ, কৌতুক, বিদ্রূপ ও ধিক্কার দিয়ে ছিড়ে ছিড়ে দেখতে অসকারের ড্রামের শব্দ এদেশের মানুষকে প্ররোচিত করেছে।

টিন ড্রামের মত গুন্টার গ্রাসের অন্যান্য বই ও স্কেচ-এ অদ্ভুত, ভয়বাহ ও বীভৎস সব ছবির প্রকাশ ঘটেছে। প্রাবন্ধিকের কাছে ১৯৮৫ সালে দেখা টিন ড্রাম চলচ্চিত্রটি '৭১-এর জীবনচেতনার আবেদন তেমনসৃষ্টি করতে পারেনি। কিন্তু ১৯৫৯ সালের টিন ড্রাম এ গুন্টার গ্রাসের যে জীবনবোধ, পুঁজিবাদ বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে দীর্ঘ ২৭ বছর পরেও তার সেই মনোভাব আরও শাণিত ও তীক্ষ্ম হয়েছে– প্রাবন্ধিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ১৯৮৬ সালে লেখা 'গুন্টার গ্রাস ও আমাদের গ্যাস্টিক, আলসার' প্রবন্ধে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে গুন্টার গ্রাসের ব্যাপক কর্মকাণ্ডকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর কার্যক্রম বা তৎপরতা শুধু মাত্র জার্মানিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে তা ছড়িয়ে পড়ে। তিনি শুধুমাত্র নিভৃত শিল্পচর্চাতেই মগ্ন থাকেননি, সশরীরে বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন, পরাশক্তির আনবিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে

রুখে দাঁড়িয়েছেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে মিছিল করেছেন, সভা সমাবেশে যোগদান করেছেন। পুঁজিবাদের সর্বগ্রাসী তৎপরতা বন্ধ করার জন্য উদার গণতন্ত্রী নেতা উইল ব্রান্টের নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিয়েছেন। পুঁজিবাদের শোষণ ক্লিষ্ট তৃতীয় বিশ্বের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য কলকাতা ও ঢাকায় এসেছিলেন। রুগ্ন, নোংরা, কলকাতার চেহারা দেখে তিনি ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, তার বিবরণ দিয়েছেন এক উপন্যাসে। স্বাধীনতার ১৫ বছর পর গুন্টার গ্রাম ঢাকায় আসেন। যে ঢাকা এখনো শোষণের শিকার। প্রাবন্ধিক লিখেছেন মুক্তিযুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশের মানুষের প্রতিশোধ স্পৃহা স্বাধীন বাংলাদেশে স্তিমিত। হতাশ মানুষ যেন রুখে দাঁড়ানোর শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। বিদেশি পরাশক্তি আমাদের রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্বের ঘাড়ে চেপে বসে আছে। এখানকার রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবীরা পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের পক্ষপাতি। রাষ্ট্রে পরিচালনায় রাজনীতির উত্তরাধিকারের পরিবর্তে পারিবারিক উত্তরাধিকারকে প্রাবন্ধিক সমালোচনা করেছেন– তিনি মনে করেন এতে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ স্পৃহা কমে যায়। স্বার্থান্বেষী শাসকেরা প্রতিবাদী শক্তিকে দমন করেন। সেনাবাহিনী দিয়ে শাসিতদের শায়েস্তা করা তাদের লক্ষ্য হয়ে যায়। এরা পুঁজিবাদী শক্তির প্রেরিত অস্ত্র দেশের নিরন্ন দুর্বল দেশবাসীর উপর প্রয়োগ করে– এদের বিরুদ্ধে গুন্টার গ্রাস তাঁর সাহিত্য ও বক্তব্যে ক্রোধ প্রকাশ করেছেন, তিনি পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য। গুন্টার গ্রাসের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তা-চেতনা ইলিয়াসের চিন্তা-চেতনা উপলব্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল বলেই গুন্টারগ্রাসের চেতনাকে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে প্রাবন্ধিক এত গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন।

...কার্ল মার্কস এর মত গুন্টার গ্রাস পুঁজিবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের রাজ্যগ্রাসী তৎপরতা এবং ইংরেজ পদলেহী ভারতীয় দালালদের কাল মার্কস ধিক্কার দিয়েছেন। মার্কস বিশ্বাস করতেন বিনা রক্তপাতে পুঁজিবাদী শক্তিকে পরাভূত করা যায় না। আমাদের দেশের সাহিত্য চর্যাপদ শুরু হয়েছে অন্নহীন মানুষের হাড়ির খবর দিয়ে। পরাশক্তিগুলো কোটি কোটি টাকা খরচ করে আনবিক অস্ত্র তৈরি করে কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্য দূরীকরণের কোন পদক্ষেপ নেয় না। এদেশের মানুষ দুঃখ বেদনায় ক্লিষ্ট, পুঁজিবাদকে শুধু শ্লেষ আর বিদ্রূপ দিয়ে দূর করা যাবে না। তাদের হাতের অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে তাদের দিকেই তাক করতে হবে নইলে গ্যাস্ট্রিক আলসার মারাত্মকরূপ নেবে। প্রাবন্ধিক দেশে সেই সময়কার অবস্থার প্রেক্ষাপটে গুন্টার গ্রাসের আরেকটি শক্ত ও কর্কশ টিন ড্রাম প্রত্যাশা করেছিলেন।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এদেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন, তার প্রয়োজনীয়তা ও প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে এক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে লিখেছেন। এ বিষয়ে প্রসঙ্গক্রমে তিনি রাজনীতির প্রেক্ষাপট উল্লেখ করে বৃটিশ ভারত, পাকিস্তান ও স্বাধীন বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ধারাবাহিক ইতিহাস, সামাজিক প্রচেষ্টা, সরকারি তৎপরতার উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রথাগত প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করার আগে একজন শিশু অভিজ্ঞতালব্ধ অনেক জ্ঞান অর্জন করে অর্থাৎ কোন শিশুই শূন্যজ্ঞান নিয়ে স্কুলে যায় না। ছয় বছরের একজন শিশু তার পারিপার্শ্বিকতা থেকে জ্ঞান অর্জন করে, যারা স্কুলে যায় তারাও শেখে, যারা না যায় তারাও মা, বাবা, ভাই বোন ও পারিপার্শ্বিকতা থেকে ফুলফল, লতাপাতা, চন্দ্র, তারা সূর্য রং এর নাম জানে ও চেনে এবং সংখ্যাও গুণতে পারে। ব্যাপারটি বাস্তব এবং স্বাভাবিক।

তাদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার দিনে দিনে বাড়ে, দিন যায় নতুন নতুন শব্দ শেখে। এই শিশুই পর্যায় ক্রমে বিভিন্ন পেশা সম্পর্কে জানে এবং দক্ষ হয়। স্কুলে না গেলেও শৈশব, বাল্য, কৈশোর, বয়ঃসন্ধিকাল, যৌবন-জীবনের এক এক পর্যায় অতিক্রম করে আর তারা নিজ পেশায় দক্ষ হয়। শুধু একাডেমিক শিক্ষায় শিক্ষিত নয়, সমাজ অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষিতরাও সমাজের কর্ণধার হয়ে থাকেন। তবু সন্তানকে স্কুলে পাঠাবার প্রবণতা ও আকাঙ্ক্ষা সব অভিভাবকেরই থাকে এবং এ প্রভাব সমাজগত।

স্কুলে না যাওয়া এবং স্কুলে যাওয়া শিশুর মধ্যে মৌল পার্থক্য অনেক। স্কুলে না যাওয়া মানুষটি তার সম্প্রসারিত পরিবার বা গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, আর স্কুলে যাওয়া ছেলেটি কোন পরিবারের একক মানুষ নয়, সে বৃহত্তর সমাজের অংশ এবং একটি দেশের নাগরিক। স্কুলে যাওয়া ব্যক্তিটিই নাগরিক দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। সমাজের সাথে সন্তানকে সম্পৃক্ত করাই অভিভাবকের উদ্দেশ্য, এবং এজন্যই এত বেশি হারে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। গ্রিস, ইউরোপে জিমনাশিয়ামগুলো প্রাথমিক বিদ্যা চর্চার কেন্দ্র ছিল। আমাদের সমাজে স্থানীয় ভাবে টোল, চণ্ডীমণ্ডপ থেকে মুদি দোকান, মসজিদ জুম্মাঘরে প্রাথমিক শিক্ষার চর্চা হতো। স্বল্প শিক্ষিত ব্যক্তিরা সামাজিক সহায়তায় এই গুরু দায়িত্ব পালন করতেন। গ্রামনির্ভর জীবনযাপন করার জন্য যতটুকু শিক্ষার প্রয়োজন তাতেই তারা তৃপ্ত হতেন। প্রাথমিক শিক্ষা সামাজিকভাবে সম্পন্ন হতো বলে পাঠ্যসূচিতে শাসক তোষণের কোন রীতি ছিল না। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা বঞ্চিত এই প্রাথমিক শিক্ষায় বর্ণবাদ, উচু, নিচু, ধনী নির্ধনী বিষয়ে বিরূপ মনোভাব তৈরির সুযোগ ছিল না।

পালরাজত্বে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে আংশিকভাবে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- শালবন বিহার, সোমপুর বিহার ও অন্যান্য বিহার, মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে সব প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে তার কোন কোনটি আন্তর্জাতিক মর্যাদায় উন্নীত হলেও স্থানীয় প্রাথমিক শিক্ষায় তাদের কোন সম্পর্ক বা প্রভাব ছিল না। পরবর্তী সময়ে সংস্কৃত চর্চার ব্যাপক প্রভাব ধর্মপ্রাণে উত্তাল তুললেও প্রাথমিক শিক্ষায় গতি সঞ্চার করে স্থবির সমাজের পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। জার্মানিতে প্রোটেস্ট্যাট মতবাদ প্রচারের সময় মার্টিন লুথার ভক্তির মোহ থেকে মুক্তি দিয়ে মানুষকে সামন্ত সমাজের অন্ধ আচ্ছন্নতা থেকে উত্তরণের যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, যা পুঁজিবাদ বিকাশে সাহায্য করে কিন্তু আমাদের দেশে চৈতন্যদেবের মত ধর্মপ্রবক্তা ভক্তির প্রাবল্যে জনমনে প্রাণ সঞ্চার করলেও সাধারণ মানুষের প্রাথমিক শিক্ষায় প্রভাব ফেলতে পারেনি, এ বিষয়ে প্রাবন্ধিকের আক্ষেপ সুললিত গদ্যে এই প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে।

এই উপমহাদেশ মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন থেকে শুরু করে তুর্কি, পাঠান মোগল শাসনের অধীনস্থ থেকেছে, তাদের শাসনামলে সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, রাজনৈতিক সংঘর্ষ, হত্যাকাণ্ড, রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু উচ্চ শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা কোনটাতেই তারা কোন ভূমিকা পালন করতে পারেনি। কিন্তু সমাজের পরিচালনায় মক্তব পাঠশালা ও টোলের প্রতিষ্ঠা দিন দিন বেড়েই চলেছিল।

ভাষাবিদ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮১০-১৯৭৭) তাঁর ছ'বছর বয়সে দেখা কলকাতা শহরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্ণনা থেকে জানা যায়- কলকাতার শহেরর প্রায় সব রাস্তাতেই খোলার চালের বাড়ি ছিল, অনেক জায়গায় আবার পোড়ামাটির খোলার বদলে চালে গোলপাতার ছাউনি হতো। সুকিয়াস স্ট্রিটে, আমহার্স্ট স্ট্রিটের মোড়ের কাছে এই রকম এক গোলপাতার ছোট একটি কুঁড়ের সামনে খোলা উঠানের পাঠশালায় সুনীতি কুমার শিক্ষালাভ করেন। ১৮৯৯ সাল থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত তিনি ও তার ৪ ভাই পড়েছেন মোতীলাল শীলের দাক্ষিণ্যে স্থাপিত বিনা বেতনের স্কুলে। এই স্কুলটি ১৮৪২ সালে কলকাতার সুবর্ণ বণিক মোতীলাল শীল স্থাপন করেন। শত শত গরীব ছেলে এখান থেকে প্রতিবছর বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পেয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় ধনাঢ্য ব্যক্তিরা সমাজের প্রাথমিক/ মাধ্যমিক শিক্ষার দায়ভার গ্রহণ করেছিলেন।

আঠার শতকের মাঝামাঝিতে সমাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সংখ্যা ছিল কয়েক হাজার। সমাজে শিশুদের সমৃদ্ধ করার প্রবণতাতেই গ্রাম সমাজ এইসব প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার জন্য উদ্যোগী

হয়েছিলেন কিন্তু রাষ্ট্রীয় উদাসীনতা ও তৎপরতার অভাবে সমাজে গতিশীলতা ছিল না বলে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষাব্যবস্থায় কোন প্রগতিশীল চিন্তাধারার স্বাক্ষর রাখতে পারেনি।

ইংরেজ শাসন প্রবর্তনের পর এই উপমহাদেশে সামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হয়। তাদের দেশের শাসন ব্যবস্থার মত করে এখানে তারা প্রশাসন, পুলিশ, বিচার, রাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তনের ফলে শাসন ও বিচার ক্ষমতাহীন এক জমিদার শ্রেণি গড়ে ওঠে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারি ও লবণ, জাহাজ প্রভৃতির ব্যবসা করে দেশে এক ধনিক শ্রেণির সৃষ্টি হয়। রাজা, মহারাজা, নবাব, রায়বাহাদুর, খানবাহাদুর উপাধি প্রাপ্তরা নিজেদের বিলাস ব্যসনের জন্য নিষ্ঠুরভাবে খাজনা আদায় করে কৃষক সমাজকে বিপন্ন করে তোলে। মহাজনী সুদে এরা সর্বশ্রান্ত হয়ে যায়, বিলিতি সামগ্রীর অবাধ আমদানির ফলে কুটিরশিল্পে ধ্বস নামে– শ্রমজীবী মানুষের আর্থিক বিপর্যয়, উঠতি ধনিক শ্রেণির শোষণ– এই পরিস্থিতিতে মুখ থুবড়ে পড়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠান, [illegible] প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। অ্যাডামের রিপোর্টে জানা যায় উনিশ শতকের শুরুতে প্রতিটি গ্রামে একটি করে, কোন কোন গ্রামে একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল, ম্যাক্সমুলারের তথ্য অনুসারে বাংলা প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল আশি হাজার।

কিন্তু আঠার উনিশ শতকে সামাজিক পরিস্থিতির জন্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমে যায়। ইংরেজ সরকার গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষার এই অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলেও একটি শিক্ষাব্যবস্থা গঠনের জন্য তারা তৎপর হন। এদেশে এই প্রথমবারের মত রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে মেকলের শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা প্রনয়ণের ভিত্তিতে জেলা শহরগুলোতে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে, উচ্চ শিক্ষার জন্য কলেজও প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮৫৭ সালে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করা হয়, যার নিয়ন্ত্রণে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার পাঠ্যসূচি, পরীক্ষাগ্রহণ, শিক্ষক নিয়োগের ভার রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত হয়। মেকলের প্রবর্তিত শিল্পনীতির উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজদের স্বার্থ সংরক্ষণ। কিন্তু এই শিক্ষাব্যবস্থার ফলেই মধ্যবিত্তের একটি অংশ সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন চর্চায় উৎসাহী হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ফলেই এঁদের হাতে বাংলা গদ্য ভাষা ও সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, বাংলা কবিতা মুক্তি পায় পায়ারের বন্ধন থেকে। সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, সংবাদপত্রকে কেন্দ্র করে চলে ধর্মের বাদানুবাদ, পরিপুষ্ট লাভ করে

গদ্যভাষা, কুসংস্কার থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য প্রগতিশীল রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখেরা ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তন করেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য রুচিতে সমাজে একটি অভিজাত গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়, যারা সাধারণ মানুষদের অবজ্ঞা করে। মেকেলের শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হয়– এই অভিজাত শ্রেণিকে সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে। জাতির উন্নয়ন করাকে এরা দায় দায়িত্ব মনে করেননি। ঈশ্বরচন্দ্রের মত সংবেদনশীল ব্যক্তিত্বও আর্থিক সংকটের কারণে সর্বজনীন শিক্ষা বাস্তবায়ন করতে পারেননি।

আঠারো শতকের শেষদিকে ওয়ারেন হেস্টিংস ইংরেজি শিক্ষা বিমুখ মুসলমানদের জন্য ১৭৮১ সালে কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মোগল আমলে স্থাপিত স্থানীয় মাদ্রাসাগুলোর সাথে এর যেমন গুণগত পার্থক্য ছিল তেমনি বৃটিশ সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও এর নেপথ্যে ছিল। মক্তব ও টোলের শিক্ষা নতুন এলিট সমাজের স্বীকৃতি পায়নি, আরবি ফারসি ও সংস্কৃত পণ্ডিতরা তাদের কাছে অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত বলে বিবেচিত হতেন। পাঠশালার শিক্ষকগণ তাদের কাছে কৌতুক ও করুণার পাত্র ছিল। সেই সময়কার শিক্ষাব্যবস্থার এহেন করুণ অবস্থা অন্যান্য সাহিত্যিকের মত তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় তাঁর সন্দীপন পাঠশালা উপন্যাসে লিখেছেন। লর্ড কার্জন বেশি খাজনা প্রাপ্তির সুবিধায় কৃষকদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেও দেশি ভদ্রলোক শ্রেণি তাদের মধ্যে সচেতনতা জাগ্রত হওয়ার ভয়ে শিক্ষাদানে বাধা সৃষ্টি করে। ১৯৪৭-এ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার ঘটে। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে পূর্ববঙ্গেই মাদ্রাসার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমে ওসব মাদ্রাসার শিক্ষক শিক্ষার্থীরা ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিকাশে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে থাকে।

বিশ শতকের প্রথম থেকে দেশে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে, ফলে বঞ্চিত ক্ষুব্ধ মানুষ অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে। প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার লক্ষ্যে রাজনীতিকদের মধ্যে উপলব্ধি জাগে, তাতে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে আয়ের উপর কর ধার্যের প্রস্তাব করলে বাংলা থেকে প্রবল বিরোধিতা করা হয়। কর প্রদানে হিন্দু জমিদারদের অস্বীকৃতিকে মুসলমান নেতারা বিরোধিতা করেন, তাতে ১৯০৮ সালে বগুড়ায় অনুষ্ঠিত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে মুসলমানেরা কর দিতে তাদের সিদ্ধান্তের কথা জানায়। [illegible] হিন্দু ও মুসলমানদের শিক্ষার বিরোধী উচ্চবর্গের হিন্দুরা এই নিয়ে [illegible] অমার্জিত গণবিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত হন।

রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে সাথে মানুষের সচেতনতা বাড়ে, অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন নিভৃত গ্রামেও প্রভাব ফেলে, ফলে বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ সঞ্চারিত হয় মানুষের মধ্যে শিক্ষালাভের স্পৃহা বাড়তে থাকে, অভিজাত শ্রেণিও এর প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেন তখন প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারি আনুকুল্যের দাবি ওঠে।

পাশ্চাত্য প্রভাবে উনিশ শতকে এদেশে সাহিত্য সংস্কৃতি রেঁনেসাসের প্রভাবে আলোকিত হয়, কিন্তু ১৯২৯ সালে হার্গোট কমিশনের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়েনি, সাক্ষরতার হারও অপরিবর্তিত ছিল। ১৯৩০ সালে বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইন গৃহীত হয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে জেলাগুলোতে জেলা স্কুল বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত হয়, এই স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানটির উপরে মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার বাইরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব অর্পিত হয়। জেলা স্কুল ইনসপেকটারের দায়িত্বে নিয়োজিত একজন নিয়মিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শন করতেন। অভিন্ন পাঠ্যসূচিতে সারা দেশে এই প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পালিত হয়। কিন্তু আর্থিক অবস্থার প্রতিকূলতার জন্য প্রথম শ্রেণির পর অধিকাংশ শিক্ষানীতিই ঝরে পড়ে। ১৯৪১ সালে সার্জেন্ট কমিশন ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করেন। সার্জেন্ট কমিশনের রিপোর্টেও প্রাথমিক শিক্ষার হতাশার চিত্রই প্রকাশ পেয়েছে।

দেশ ভাগের পর পাকিস্তানের প্রথম শিক্ষা কমিশন হয় ১৯৫৯ সালে– সেই কমিশনের প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে দেশভাগের পর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার হ্রাস পায়। ১৯৫৭ সালে জেলা স্কুল বোর্ডগুলো বিলোপ করা হয়, প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব প্রায় সবটাই সরকার গ্রহণ করে কিন্তু স্কুলগুলো বেসরকারিই রয়ে যায়– তাতে শিক্ষকদের অবস্থার উন্নয়ন এবং পাঠদানের মান উন্নয়ন ব্যহত হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে যায়। প্রাবন্ধিক বলেন সরকারবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনেও প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টি যথোচিত গুরুত্ব পায়নি। অসহযোগ আন্দোলনের সময় ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা বর্জনের প্রেক্ষিতে কংগ্রেস নেতারা বিকল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কয়েকটি ন্যাশনাল কলেজ, ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন করলেও প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেননি, আবার জমিদাররা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপন করেছেন কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেননি। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা কর্মসূচির মধ্য প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক, সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার

দাবি ছিল, কিন্তু তা হয়নি। ১৯৬২ সালে ছাত্রদের শিক্ষা আন্দোলনে প্রাথমিক শিক্ষা গুরুত্ব পায়নি, ১১ দফা আন্দোলনেও প্রাথমিক শিক্ষার উন্মেষ ছিল না–। তখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৭৩ সালে দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করা হয় কিন্তু একটা বড় অংশ সরকারিকরণের বাইরে থেকে যায়। ১৯৮১ সালে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র পরিদপ্তর, ১৯৮৭ সালে তা অধিদপ্তর হিসেবে পরিগণিত হয়ে প্রাথমিক শিক্ষার সমাগ্রিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। বিনামূল্যে বই ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করা হলেও আতঙ্কজনক ভাবে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বেসরকারি স্কুলে ড্রপ আউটের হার আরও মারাত্মক। শিক্ষা উপকরণের যথাযথ ব্যবহার বিদ্যালয়ে হয় না বললেই চলে। গ্রামের স্কুল গুলোর জীর্ণদশা মারাত্মক, অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও উক্ত উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা গ্রামের স্কুলে পরিদর্শনে যায় না। সরকারি আনুকূল্য থাকা সত্ত্বেও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো অবহেলিতই থেকে যায়।

সরকারিকরণ সত্ত্বে ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার সামগ্রিক মানের অবনতি হয়েছে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষার্থী ওইসব বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে–তাঁরা নিম্নবিত্ত, বিত্তহীন ও অশিক্ষিত পরিবারের সন্তান। স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত শিক্ষিত অভিভাবকদের লক্ষ্য কিন্ডারগার্টেন, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ইংরেজি মাধ্যম স্কুল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার নিম্নমানের জন্য ড্রপ আউটের পরেও যারা থাকে তারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় টিকে উচ্চশিক্ষার দ্বারে পৌঁছতে পারে না। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের সন্তানেরা প্রাইমারি স্কুলে পড়াশোনা করে না বলে স্কুলগুলো সামাজিক আনুকূল্য বা সহযোগিতা পায় না, অশিক্ষিত অভিভাবকেরাও শিক্ষকদের অবহেলায় কোন চাপ সৃষ্টি করতে পারে না। তাই সরকার প্রশিক্ষণ দিয়ে দিয়ে তাদের অভিজ্ঞ করার চেষ্টা করেন কিন্তু শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের সাড়া ও দেশপ্রেমের অভাবে এবং পেশার গুরুত্ব বুঝতে না পেরে বাস্তব ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করেন না। সমাজের তত্ত্বাবধানে থাকাকালে বিদ্যালয়ের অব্যবস্থাপনার প্রতিকার সম্ভব ছিল, সরকারিকরণে তার প্রতিকার সম্ভব হচ্ছে না।

এই দরিদ্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে বিদেশি প্রচেষ্টার অন্ত নেই। বিশ্ব ব্যাংক, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক, সুইডিশ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, ইউনিসেফ সহ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান শর্ত জুড়ে দিয়ে শিক্ষা উন্নয়নে অর্থ দিয়ে থাকে। [illegible] বিদেশি বিশেষজ্ঞ, এই সব বিশেষজ্ঞ কর্তৃত্ব করার নামে ক্ষমতা [illegible] তুলে নেন। প্রকল্প অর্থ প্রদানকারীরা আমাদের দেশের [illegible]

আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে সঙ্গতিহীন পদ্ধতি চালু করে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালায়, ব্যর্থ হয়ে নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করেন– এই পরীক্ষা নিরীক্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই দেশের লক্ষ লক্ষ শিশু। দেশীয় শিক্ষাবিদদের বিদেশে নিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞরা এক এক সময় এক এক পদ্ধতি প্রয়োগ করেন– যাতে শিক্ষার স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়, সঠিক শিক্ষা হয় না। বিশেষজ্ঞদের যোগ্যতা নিয়ে অনেকেই সন্দিহান। আমাদের দেশের যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের দাতা সংস্থারা এর সাথে সংযুক্ত করতে আগ্রহী হন না। কেননা তারা প্রভুত্ব মানেন না। কিন্তু আমাদের এই উন্নয়নশীল দেশে ড্রপ আউট এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা পরস্পর জড়িত। বিদেশি বিশেষজ্ঞ ও তাদের অনুগত দেশি বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে দাতা সংস্থার কর্তৃত্বে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষায় তাদের তৎপরতায় দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় যে নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে প্রাবন্ধিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তার তথ্যমূলক বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন।

১৯৯০ সালে লেখা এ প্রবন্ধটিতে লেখক সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা, শিক্ষাব্যবস্থাপনায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যে সংকট নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু হাজারো সংকটেও তিনি নিরাশ নন। তিনি বিশ্বাস করেন দেশের যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষার সাথে জড়িত তারাই সাম্রাজ্যবাদ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে আঘাত হানবে। সমকালীন সময়ে প্রতিকূলতা থেকে প্রাথমিক শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করার যে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা চলছিল তাতেই তিনি আশাবাদী ছিলেন সাম্রাজ্যবাদের তোষণ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা মুক্ত হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের কাজ কঠিন ও দুরূহ, কিন্তু অসম্ভব নয়। এ বিষয়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কতগুলো সুপারিশ করেছেন। তা হলো–

১. রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে সমস্যাটি মোকাবেলা করতে হবে।

২.এর সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, শিক্ষাবিদগণ সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যের নামে যে নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব করে, তা প্রতিহত করতে সচেষ্ট হবেন।

৩. প্রাথমিক শিক্ষকের পদটি লোভনীয় ও আকর্ষণীয় করা এবং তাদের উপযুক্ত মর্যাদা দেয়া।

৪. টাউট নেতৃত্ব মুক্ত করা; আর এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে সংস্কৃতিকর্মী, বুদ্ধিজীবী, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং রাজনৈতিক কর্মীদের।

৫. নিজ পেশা সম্পর্কে শিক্ষকগণ শ্রদ্ধাবান হবেন। তাঁরা তাঁদের কাজ কর্ম আচার-আচরণে গ্রামের মানুষ আস্থা অর্জন করবেন।

একুশে ফেব্রুয়ারি সম্পর্কে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর উপলব্ধিকে 'একুশে ফেব্রুয়ারির উত্তাপও গতি' প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন। ১৯৯২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি দৈনিক বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত এ রচনায় জাতির অস্তিত্ব-ঐতিহ্যের চেতনায় স্মারক একুশের তাৎপর্য সম্পর্কে লিখেছেন। বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ, জীবনসম্পৃক্ত এ বিষয়ের আলোচনা জাতির প্রতি কৃতজ্ঞতার স্বরূপ। ২১' ফেব্রুয়ারির ৪০ বছর পূর্তিতে তিনি এ রচনাটি লিখেছেন। বাংলাদেশের উদ্ভব ও অস্তিত্বের মাইল ফলক ২১ ফেব্রুয়ারি। ১৯৪৭–১৯৭১ পর্যন্ত এদেশের আন্দোলন-সংগ্রাম '২১ কেন্দ্রিক। ২১' নির্যাতন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতীক। বাঙালির শোষিত ও নির্যাতিত হওয়ার এবং তা প্রতিরোধের ইতিহাস হাজার বছরের। কৈবর্ত বিদ্রোহ থেকে শুরু করে সাঁওতাল বিদ্রোহ, চাকমা বিদ্রোহ, হাজং বিদ্রোহ সহ বিভিন্ন বিদ্রোহ হয়েছে। এসব আন্দোলন হয়েছে বিচ্ছিন্নভাবে। আর ২১ ফেব্রুয়ারির আন্দোলন গোটা জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে একটি অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের দিকে। একুশের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠী একটি জাতিসত্তায় নিজেদের অস্তিত্ব অনুভব করে, জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়, জাতি হিসেবে নিজেদের পরিচয় অনুসন্ধানে নিয়োজিত বাঙালি প্রতিরোধ ও প্রতিবাদী চেতনায় জেগে ওঠে। মানুষ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করার অধিকার অর্জন করে ২১ শের রক্তাক্ত ধারায়। ২১ শে-র আন্দোলন মাতৃভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির লক্ষ্যে দেশবাসীর আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের দাবি ১৯৫২ সালের পর মানুষের কণ্ঠে ভাষা পায়। নতুন অঙ্গীকারে জাতির দাবি আদায়ের প্রস্তুতি শুরু হয় ২১-এর আন্দোলন থেকে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে একুশের তাৎপর্য ও গুরুত্ব বিষয়ে এক বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা রয়েছে এই প্রবন্ধে।

চাকমা জাতি এ দেশের আদি অধিবাসী। চাকমাদের জীবন বৈচিত্র্যে উপন্যাস উপযোগী অনেক উপকরণ বিদ্যমান। তাদের দৈনন্দিন জীবনের কষ্ট সহিষ্ণুতা, বঞ্চনা, অপমান, প্রতিরোধ উপন্যাসের বিষয় বৈচিত্র্যে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্য। চাকমা সাহিত্যে কবিতা গল্প রূপকথা আছে। সঙ্গীত-নৃত্যে তাদের পারদর্শিতা মনোমুগ্ধকর। মানুষের জীবনের স্বপ্ন ও প্রত্যাশা তাদের মাতৃভাষাতেই বাস্তব রূপ পেতে পারে; লোকালয় থেকে দূরে দূর্গম এলাকায় বসবাসকারী কমপক্ষে ৪০ টি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে সংখ্যাগতভাবে বাংলা ভাষার পরে চাকমা ভাষার স্থান। [illegible]

সালের আদম শুমারি অনুযায়ী চাকমা জনগোষ্ঠী চার লাখ ৪৪ হাজার। পার্বত্য চট্টগ্রামে ১১টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার রয়েছে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি। এই ১১ টি ভিন্ন ভাষাভাষী জাতির মধ্যে চাকমারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়াও ভারতের মিজোরাম, অরুণাচল, ত্রিপুরা, আসাম মায়ানমারেও চাকমা জাতি বসবাস করে, সারা পৃথিবীতে প্রায় ছয়লাখ মানুষ চাকমা ভাষায় কথা বলে। তাদের রয়েছে নিজস্ব বর্ণমালা, চাকমা সংস্কৃতি এখনো মিশ্র সংস্কৃতির মিশ্রণ মুক্ত। চাকমাদের মূল ধর্ম বৌদ্ধ হলেও চালচলন, নামগ্রহণ ও আদব কায়দায় মুসলিম প্রভাব এবং দেবদেবী অর্চনায় হিন্দু সংস্পর্শ দেখা যায়।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অর্ন্তভূক্ত চাকমা ভাষায় বর্তমানে ৩৩ টি বর্ণমালা ব্যবহৃত হচ্ছে। যদিও এই সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন ১৯০৩ সালে তাঁর গবেষণাপাত্র Linguistic Servey of India-তে বর্ণমালার সংখ্যা বলেছেন ৩৩টি, সতীশচন্দ্র ঘোষ তাঁর চাকমা জাতি (১৯০৯) গ্রন্থে ৩৭টি, নোয়ারাম চাকমা তাঁর চাকমা বর্ণমালার পত্তম শিক্ষা নামের শিশু পাঠ্য বইয়ে ৩৯ টি চাকমা বর্ণমালার কথা উল্লেখ করেছেন।

(তথ্য : পুলক বরণ চাকমা, সহকারী পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট)।

চাকমারা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত। পিতৃকূল নিয়ে এদের গোষ্ঠী। এদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বভাব খুবই প্রবল। এদের সমাজে গোষ্ঠী ও গোষ্ঠীর বাইরে অর্থাৎ অন্তবিবাহ ও বর্হিবিবাহ উভয়ই চলে। এরা বর্তমানে আধুনিক সমাজের কাছাকাছি।

পূর্ব পুরুষের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার দুর্ভাগ্য ও নিজ দেশে পরবাসী হওয়ার অপমান তাদের কবিতায় ভাষা পেয়েছে। একই বিষয় তাদের উপন্যাসের বিষয় হয়ে দৈনন্দিন জীবন যাপনের সাথে তাদের বঞ্চনা, অপমান ও প্রতিরোধ যুক্ত হয়ে মহাকাব্যিক জীবন চেতনায় সমৃদ্ধ উপন্যাস রচনার উপকরণ হতে পারে। এক সময় তান্ত্রিক বৌদ্ধ মতে বিশ্বাসী চাকমারা চাকমা বর্ণমালার সাহায্যে তাঁদের ধর্মগ্রন্থ আমরতারা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। চাকমালিপিতে রচিত তান্ত্রিক শাস্ত্র বা চিকিৎসাশাস্ত্র এখনো চাকমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। ১৭৭৭ সালে চাকমা সাধক কবি শিবচরণ চাকমা বর্ণমালায় রচনা করেন গোজেন লামা গীতিকাব্য, ১৮৬০ সালে খ্রিস্টান মিশনারিজ উদ্যোগে চাকমা বর্ণমালায় বাইবেলের অনুবাদ করা হয়–এ থেকে জানা যায় চাকমা বর্ণমালা ব্যবহার বহু প্রাচীন। স্বাধীনতা উত্তরকালে ১৯৭৩ সালে সুগত চাকমা 'চাকমা বাঙলা কধাতারা' নামে চাকমা-বাংলা অভিধান রচনা করেন।

সুতরাং চাকমা বর্ণমালা প্রতিষ্ঠিত এবং সাহিত্য রচনার উপযোগী। তাই আখতারুজ্জামান ইলিয়াস স্বভাবতই প্রত্যাশা করেছেন– 'চাকমা শিল্পীর লেখা চাকমা ভাষার উপন্যাস চাই।' যাতে তাদের সংস্কৃতির যথাযথ রূপায়ন ঘটবে।

প্রাবন্ধিক চাকমাদের কাব্য উপাখ্যান 'রামাধন ধনপুদি'র উল্লেখ করেছেন, যার গল্প মুখে মুখে প্রচলিত আছে। চাকমা কথকেরা পুরুষানুক্রমে জনপদে জনপদে এই উপাখ্যান আবৃত্তি করে শোনান, এ ছাড়াও আরো অনেক কাহিনী তাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, আবৃত্তিকালে তার সাথে যুক্ত হয় চাকমা গাথার নতুন নতুন প্রসঙ্গ, আবার কখনো বাদ পড়ে পুরোনো গাথার অংশ বিশেষ। তবে সংযোজন যত হয় বিয়োজক তবে ঘটে না, কেননা পুরনো চাকমা গাথার প্রতি তাদের রয়েছে গভীর ভালবাসা ও ভক্তি। চাকমা কবিতায় রয়েছে পূর্ব পুরুষের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার দুঃখ ও নিজদেশে পরবাসী হওয়ার অপমান তাই তাদের কবিতায় ফুটে উঠেছে তাদের ক্ষোভ ও উত্তেজনা।

পাহাড়ে পাহাড়ে তাদের বসবাস, তাদের জীবন-জীবিকার আশ্রয় পাহাড়। খাদ্যবস্ত্রের সংস্থান তাদের এখান থেকেই হয়। তাই পাহাড় থেকে উচ্ছেদ তাদের মৃত্যুর শামিল। তাদের উচ্ছেদ করার চক্রান্ত চলেছে উপনিবেশিক শাসনাকালে থেকে। আঠার শতকের শেষে উপনিবেশবাদীদের সাথে সংঘর্ষ লিপ্ত হয়েছিল চাকমারা। যে সময়ে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ফকির বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, ফরায়েজি, ওয়াহাবি আন্দোলনে পূর্ব ভারত উত্তাল হয়ে উঠেছিল। সে সময়ই কার্পাস মহলের জুমিয়ারা অন্যায় খাজনা দিতে কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, কিন্তু তাদের বিদ্রোহ প্রচার পায় না। প্রত্যন্ত অঞ্চলের এই বিদ্রোহ ইতিহাসের আড়ালেই থেকে গেছে। এর বিরুদ্ধে একটা বড় চক্রান্ত কাজ করে, তা হলো জাতির কাছে এবং স্বজাতির কাছে তাদের শৌর্যবীর্য প্রকাশ না করা। এই জাতি সাম্রাজ্যবাদের তোষণে এতই নিয়োজিত যে জাতির সঠিক মর্যাদা দিয়ে তা ইতিহাসে সংরক্ষণ করে না। দেশের এক শ্রেণির স্বার্থান্বেষী উপমহাদেশের রাজনীতিতে এই ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর অবদানকে স্বীকার করতে চায় না।

পাহাড়ি জাতির স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করার বিপক্ষে এই প্রাবন্ধিক। কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্পের জন্য পাহাড়ি অঞ্চল জলনিমগ্ন হয়, তাতে তলিয়ে যায় তাদের বাড়িঘর ও ফসলিজমি। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তারা প্রত্যন্ত এলাকায় আশ্রয় নেয়, বাঁচার জন্য লড়াই করতে হয় তাদের– এই দুর্যোগের মধ্যে তারা আত্মপ্রকাশ করার জন্য জেগে ওঠে, তাদের স্বপ্ন প্রতিরোধকারীর বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে–। তাদের প্রকৃতি অন্য পেশিশক্তির দ্বারা লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত, পাহাড়ে উৎপাদিত সম্পদ তারা ভোগ করতে পারে না, গাছপালা ও পাহাড় কেটে এরা

প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে, শাসন-শোষণের নামে সেনাবাহিনীর গোলা বারুদের গন্ধে এখানকার বাসিন্দাদের স্বাভাবিক জীবনে ছন্দপতন ঘটেছে। তাদের কবিতায় প্রতিরোধের রক্তাক্ত চিহ্ন; প্রেম-রোমান্স বিবর্জিত চাকমা কবিতা তাই গৃহচ্যুত, মৃত্যু ও হত্যার বেদনায় নীল। বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী চাকমারা এক কালে ব্রহ্মদেশে ছিল বলে কর্ণেল ফেইরিসহ অনেকেই মনে করেন। চাকমাদের ধর্ম, ভাষা, আচার-ব্যবহার ও সামাজিক রীতি নীতি বিভিন্ন ধর্মের সাথে এমনভাবে মিশে গেছে যে তাদের আদিম বৈশিষ্ট্য অনেক ক্ষেত্রে খুঁজে বের করা সম্ভব হয় না।

চাকমাদের এই লুণ্ঠিত, বিধ্বস্ত জীবনের সামগ্রিক চেহারা তাদের বেদনা ও ক্রোধ কবিতার মধ্য দিয়ে পূর্ণ বিকাশ পায় না। চাকমাদের আধুনিক জীবন, তাদের সমাজের ভাঙ্গাগড়া, প্রতিরোধ, অসন্তোষ ও প্রতিরোধ প্রকাশের জন্য প্রয়োজন উপন্যাসের আঙ্গিক। বঞ্চিত, অপমানিত ও নিগৃহীত চাকমাদের সংকট ও সংগ্রামের প্রতিফলনের জন্য উপন্যাসই উপযুক্ত মাধ্যম।

আধুনিক ব্যক্তির অনুভূতির প্রকাশ, তার জীবনযাপনের সত্তা, বেদনা, উদ্বেগ, আকাঙ্ক্ষা উপন্যাসে প্রকাশ পেয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যোগাযোগ ঘটে– তখন ব্যক্তির মধ্যে জাগ্রত হয় আত্মোপলব্ধি, ব্যক্তির বিকাশ– তাই এখন চাকমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির উদ্বোধন ঘটেছে, তাদের মধ্যে যে জীবন জিজ্ঞাসা আর বিশ্লেষণের স্পৃহা জেগেছে তার প্রকাশ উপন্যাসেই সম্ভব আর তাতে তাদের ইতিহাস, সংগ্রাম, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে জানার সুযোগ হবে। চাকমাদের সমৃদ্ধ কাব্য, উপাখ্যান, রূপকথা, গীতিকাব্যর বিষয় নতুন মাত্রায় চাকমা উপন্যাসে বিকশিত হবে। কেননা ব্যক্তির বিকাশ উপন্যাসেই দেখানোই সম্ভব। ব্যক্তির স্বপ্ন ও সংকটকে সামাজিক প্রেক্ষাপটে উপন্যাসেই প্রতিফলিত হয়। উন্নতমানের অন্যান্য সাহিত্যের পাশে জীবন জিজ্ঞাসা, ঐতিহ্য ও ব্যক্তি ব্যক্তিতে সংযোজনের জন্য চাকমাদের সংস্কৃতি ও জীবনভিত্তিক সাহিত্য উপন্যাস সৃষ্টি প্রয়োজন। তাদের বর্ণাঢ্য কৃষ্টি ও জীবন প্রকাশের জন্য উপন্যাসই উপযুক্ত মাধ্যম।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস শক্তিমান লেখক। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধে ধারা বিবৃতির অতিকথন কোথাও কোথাও লক্ষণীয়। তাঁর লেখায় দ্বৈতসত্তা রয়েছে। তিনি কখনও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিকের পক্ষে আবার কখনো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সমর্থক। এই দুইয়ের প্রশ্নে মাঝে মাঝেই তিনি বিভ্রান্ত হয়েছেন। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে উনিশ শতকের রথী মহারথীদের ভালমন্দের বিচার করেছেন বুর্জোয়া ভাব অ-ভাবের ভিত্তিতে। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থতা ও সাফল্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন প্রাবন্ধিক– 'বাংলা কথাসাহিত্যে ব্যক্তিকে

বিকাশের প্রথম সুযোগ দেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিক বিবর্তন প্রায় নেই বললেই চলে। তারা উপন্যাসের শুরুতে যা, শেষেও তাই, এমনকী মাঝখানেও তাদের চেহারা পাল্টায় না। ...সামন্ত ব্যবস্থার আসন্ন ক্ষয় ও নতুন বণিক সমাজের উত্থান হল যোগাযোগ এর পটভূমি। নতুন সমাজের প্রতি রবীন্দ্রনাথ সশ্রদ্ধ নন, কিন্তু মধুসূদনকে বেড়ে উঠতে দিতে তিনি বাধা দেননি। বঙ্কিমচন্দ্র হলে দিতেন।' আখতারুজ্জামান ইলিয়াস লিখেছেন ব্যক্তির বিকাশে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ সমর্থন থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে ব্যক্তির বিকাশ বারবার বাধা পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ মানুষকে বিপ্লবের দিকে উদ্বুদ্ধ করতে না পারলেও শক্ত সামর্থ ব্যক্তি গঠনে তাঁর গানের ক্ষমতা অসাধারণ।

প্রবান্ধিক বঙ্কিম উপন্যাসের বিশ্লেষণে বলেছেন সমাজ বাস্তবতাবোধের অভাবে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিচরিত্রের বিকাশের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেন নি। একমাত্র কপালকুণ্ডলা ছাড়া তাঁর অন্যান্য উপন্যাসে চরিত্রের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। ইউরোপীয় উপন্যাসে ব্যক্তির পরিচয় পরতে পরতে উন্মোচিত হয়েছে। প্রাবন্ধিক বঙ্কিম স্বচ্ছ ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবনায় সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পেরেছেন আর সমাজে ঘোরতর অনাচার সৃষ্টির ভয়ে সমাজের স্পন্দন ও গতিকে মেনে নিতে পারেননি।

দেশে বুর্জোয়া বিপ্লব সাধিত হয় না বলে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস দুঃখ প্রকাশ করেন, আবার সাথে সাথে এটাও উপলব্ধি করেন সমগ্র পশ্চিমের মত আমাদের দেশের মানুষও ব্যক্তিসর্বস্বতায় ভুগছে। ব্যক্তি সর্বস্বতাকে প্রাবন্ধিক চরম অসুখ বলে অভিহিত করেছেন। এ থেকে উত্তরণের উপায় আগামীর প্রগতি ও উন্নয়ন। বাংলা সাহিত্যে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে এক নতুন চেতনার সংযোগ করেছেন।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তোষামোদ বা কারো মনোরঞ্জনের জন্য সাহিত্য রচনা করেননি। তিনি রবীন্দ্রনাথের মত কঠিনকে ভালোবেসেছিলেন। সাহিত্যে তিনি গতানুগতিকতার বিরোধী ছিলেন। এক বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষ, যারা কায়েমি স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন তারাই তাঁর সাহিত্যের চরিত্র ও পাঠক। সন্ধি করে ক্ষান্ত হওয়ার মানুষ তিনি নন। সমগোত্রীয় লেখকদের লেখায় আপসের আভাস পেলে তিনি তা নির্মমভাবে উদঘাটন করে দিয়েছেন। স্পষ্টবাক ভাবালুতামুক্ত ইলিয়াস কাউকে প্রশ্রয় দেননি– যেখানেই আচরণেই অসংগতি দেখেছেন তিনি তার খোলামেলা সমালোচনা করেছেন। আদর্শচ্যুত রাজনীতিবিদ, কবি-সাহিত্যিক কেউ-ই তাঁর সমালোচনা ঊর্ধ্বে ছিলেন না।

সমাজরূপান্তরের মত সাহিত্যের রূপান্তর তাঁর কাম্য ছিল। মধ্যবিত্ত ব্যক্তির তরল ও পানসে দুঃখবেদনা, মধ্যবিত্তের ছকে-ফেলা কাহিনী থেকে মুক্ত গল্প-উপন্যাস লিখেছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। প্রবন্ধ রচনাতেও তিনি শক্ত সামর্থ ব্যক্তি ও বিষয়বস্তু অবলম্বন করেছেন।

প্রাবন্ধিক ইলিয়াসের প্রধান আক্ষেপ ও অভিযোগ হলো– অনেক লেখক, রাজনীতিক নিজেদের বিপ্লবী বলে মনে করলেও গতানুগতিক ও বিরূপ মতের বিরুদ্ধাচরণ করেন না, কারণ তাদের আত্মসচেতনতার অভাব। আত্মসচেতনতার অভাবেই সত্য মিথ্যা, অলীক বাস্তবের মধ্যে তাঁরা তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। স্তুতি ও হতাশাকে তারা মুখ্য মনে করেন– এতে সাহিত্যের রস ক্ষুন্ন হয়।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রবন্ধে এমন কয়েকজন বাঙালি সাহিত্যিকের উল্লেখ করেছেন তাঁদের অন্যতম সুকুমার রায়– যিনি জীবনের সব বিষয় নিয়ে মজা করেন, হাসাতে হাসাতে মানুষকে সচেতন করে তোলেন। কৌতুক রস সৃষ্টিকারী ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী এবং রবীন্দ্রনাথেরও অনুরক্ত তিনি। রবীন্দ্রনাথ, ত্রৈলোক্যনাথ, সুকুমার রায়, শিবরাম চক্রবর্তী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ওয়ালীউল্লাহ-র সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য আলাদা। তাঁরা অনেক বিষয়ে নির্বিকার থাকলেও কোন দলমতের পক্ষপাতিত্ব করেননি বলেই প্রাবন্ধিক তাঁদের সাহিত্য আলোচনা করেছেন।

রাজনীতি-অর্থনীতি-সংস্কৃতি সব আলোচনাতেই প্রাবন্ধিকের কাছে গুরুত্ব পেয়েছে ব্যক্তি। কেননা তিনি বিশ্বাস করেন আধুনিকতার প্রধান ঘটনাই হচ্ছে ব্যক্তির উত্থান, পতন, ক্রমবিকাশ ইত্যাদি। বিজ্ঞানের সাথে রয়েছে পুঁজিবাদের অবিচ্ছিন্ন যোগ, ব্যক্তির মধ্যে তাই ধরা পড়ে পুঁজিবাদের ও শোষণের চেহারা, বিজ্ঞানের কল্যাণ ও ধ্বংসের রূপ। যা তার উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। বাস্তব ও কল্পনার আলেখ্য নানা ভাবে ব্যক্তি চরিত্রে প্রকাশ পায়। আমাদের দেশের উপনিবেশিক শাসনে ব্যক্তি দুর্বল। তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে পুঁজিবাদী বিশেষত ইউরোপীয় ও মার্কিন বুর্জোয়াদের মত সাহস ও শক্তি নেই। তাই এদেশীয়দের রচিত উপন্যাসে থাকে পুরোনোর অনুবৃত্তি, অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাস ও কুসংস্কার। প্রাবন্ধিক প্রসঙ্গক্রমে তাঁর প্রবন্ধগুলোতে তা উল্লেখ করেছেন– এই জন্যই নামকরণ করেছেন সংস্কৃতির ভাঙ্গা সেতু।

বাঙালি মধ্যবিত্তকে তিনি ইউরোপীয় বুর্জোয়ার এক সংস্করণ হিসেবে দেখেছেন, তাই ব্যক্তিকে অর্থলিপ্সু বলে চালিয়ে দেওয়ার প্রবণতা মাঝে মাঝে ইলিয়াসের প্রবন্ধে লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মনের ক্ষোভ ও দ্রোহ কখনো সোজা

কথায়, কখনো বাঁকা কথায় প্রকাশ পেয়েছে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রবন্ধ বক্তব্য প্রধান, কথার টানে বিষয়ের প্রসঙ্গে অনেক কথা উঠে এসেছে। তাঁর বিশ্লেষণ সবার সমর্থন পায়নি, তা সম্ভবও নয়। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, তার ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটা ঋদ্ধধারণা ও চেতনা তিনি বাঙালি লেখক পাঠককে দিয়ে গেছেন।

করুণা রানী সাহা অধ্যাপনা করেছেন প্রায় ত্রিশ বছর। ১৯৭৯ সালে পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক নিয়োগ লাভ করে তিনি ১৯৮০ সালে সরকারি আযিযুল হক কলেজে বাংলা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। পরবর্তীতে সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ, সরকারি মহিলা কলেজ, পাবনা, সরকারি আকবর আলী কলেজ, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ -এ শিক্ষকতা করেন। ২০০৬ সাল থেকে প্রায় তিন বছর সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ পাবনায় অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে ২০০৯ সালে অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে যান।

'বিবিধ আলোচনা', 'কালোত্তীর্ণ রবীন্দ্রনাথ' নামে তার দুটি বই প্রকাশিত হয়েছে, আর একটি বই প্রকাশের পথে। মহান মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদধ ভিত্তিক সাহিত্য পর্যালোচনা, সমাজ, লোক সংস্কৃতি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও সাহিত্য কর্ম তাঁর লেখার বিষয়বস্তু। লেখালেখি নিয়ে তিনি বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সাথে যুক্ত আছেন। সমাজের প্রগতিশীল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে তিনি যুক্ত।

অধ্যাপক করুণা রানী সাহার জন্ম সিরাজগঞ্জ শহরে। তিনি পড়াশোনা করেছেন সিরাজগঞ্জের সালেহা ইসাহাক সরকারি গার্লস হাই স্কুল, মুমিনুন্নিসা মহিলা কলেজ (ময়মনসিংহ), আনন্দ মোহন কলেজ ও টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (মহিলা) ময়মনসিংহে।

করুণা রানী সাহার বাবা গোপাল চন্দ্র সাহা, মা গৌরী সাহা। তার স্বামী প্রশাসন ক্যাডারের একজন অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি তিন সন্তানের জননী।